বারবধূ

প্রবোধ সরকার

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩২৩

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৮২, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
অরুণ দত্ত

[illegible]

অমোঘ সত্য কথাটা কারো মুখ থেকে শুনলে সে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে।

মোক্ষদার বয়সের কথা উঠতে চেপে গেল গৌরী। সে অন্য কথার অবতারণা করে বললে, আমার ওপরের বাথরুমের কলে এক ফোঁটা জল নেই মহাদেবদা। মাঝে মাঝে কেন এমন হয় বলুন তো?

—ছাতের ট্যাঙ্কে জল না এলে তোমার কলে জল আসবে কোথা থেকে বল।

—ট্যাঙ্কটা খারাপ হয়ে যায়নি তো? জিজ্ঞেস করলে গৌরী।

—এই সেদিন বাড়ীর মালিককে ব'লে সারিয়ে দিলুম—আর কি করবো বল। তা তুমি নীচে না নেমে তোমার ঝিকে পাঠালেই পারতে।

সহানুভূতিব স্থরে গৌরী বললে, বেচারা সারাদিন খাটাখাটুনি ক'বে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তাকে আর জাগালুম না।

—আহা, জানে তো উপরের কলে জল আসছে না—রাত্রিবেলা তো দু এক বালতি জল তুলে রাখলেই পারতো। রাগ করোনা, তুমি বাপু চাকর-বাকরকে বেশী আসকারা দাও। যাকগে, আজ তাহলে একটু সকাল সকালই চা খাওয়াবে?

-হ্যাঁ, বদনকে এবার তুলে দিই গে। ষ্টোভটা আবার ক'দিন একটু বেগোড়-বাঁই করছে, শুতে হবে—কি উনুন ধরাতে হবে কে জানে। আচ্ছা দাদা, চা করে আপনাকে আমি ওপরে ডাকছি। ব'লে গৌরী ওপরে উঠে এলো।

চা খেতে খেতে গৌরী জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ দাদা, কাল যে মেয়েটি আমাদের তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে এলো—ও কি শরৎস্থন্দরীর ঐ ফুটো বাড়ীতে থাকতো?

—হ্যাঁ, আমাদের নন্দ গো—ঐ রাজুর সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকতো। ষোড়শী ব'লে একটা মেয়ে কার্ত্তিক পুজোর রাত্রে ও বাড়ীতে খুন হয়নি—সে তো এই সেদিনের কথা। পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়ে নন্দ আগেই উঠে এসেছিল। রাজু অনেক দিন ধরেই ভালো ইজ্জতওলা বাড়ী খুঁজছিল, নন্দই তো ওকে এখানে নিয়ে এলো।

—শরৎসুন্দরীর বাড়ীর আর আর ভাড়াটে ?

—চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মহাদেব বললে, যাদের ইজ্জতের ভয় আছে, ছুটো-ছাটা করে না তারা আগেই সরেছে। আর যাদের ছুটো না করলে দিন গুজরান হবে না তারাই পুলিশের ধকল সয়ে কোন গতিকে টিকে আছে। শরৎসুন্দরীর গুমোর তো ভেঙেছে, যেটুকু আছে সেটুকুও আর বেশী দিন থাকবে না। দু' একমাসের মধ্যেই ওর বাড়ীর দরজায় তালা পড়বে।

—কে খুন করেছিল দাদা ? তাকে ধরতে পারেনি ? সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে গৌরী।

সব জান্তার মুচকি হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে বললে মহাদেব, ধরতে আবার পারেনি। ধ'রে ব্যাটাদের পুলিপোলাও চালান ক'রে ছেড়ে দিলে। ডোম ব্যাটাদের আর বোয়াবি শুনতে পাও ? ব্যাটারা সব কেঁচো হয়ে গেছে। শরৎসুন্দরীর বাড়ীতে কালী ব'লে একটা মেয়েছেলে ছিল। কানাই ডোম ব'লে তার একটা গুণ্ডা বাবু ছিল। সে ব্যাটাকে পুলিশ ধরেছিল শহর বদলী। সে ব্যাটা লুকিয়ে শহরে ফিরে এসে দলবল নিয়ে ষোড়শীকে খুন করেছিল। দলের পাণ্ডা হলো ঐ কানাই।

—বাব্বা ! শুনলে পরে বুকের রক্ত আপনি জল হয়ে আসে। মাগো-মা, অমন খুনে লোককেও মানুষে বাবু করে।

—সাধে কি আর করে—পিরীতের জ্বালায় করে ! দাও—সিগরেট-টিকরেট একটা আধটা থাকে তো দাও। ব'লে নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা মহাদেব নামিয়ে রাখলে।

সিগারেট দিতে দিতে গৌরী বললে, ওকে পিরীত ব'লে না দাদা, ওর নাম হলো প্রবৃত্তি।

—যাই, লীলাটা আজ আবার কেমন আছে—খবরটা একবার নিই! ব'লে আসন ত্যাগ করলে মহাদেব।

—লীলাকে আর লীলার মাকে আমি আজ খেতে বলেছি। রাঁধুনী এলেই আগে ওর জন্যে তুটি ঝোল ভাত করে দিতে বলবো। অসুখ মানুষ—বেলা বেশী করবো না।

—ওতো আর বাঁচবেই না, যে ক'টা দিন তোমাদের দয়ায় না না ম'রে বেঁচে থাকে।

—ছিঃ ছিঃ দাদা, ওকি কথা বলছেন। ভগবানই ওকে বাঁচিয়ে তুলবেন।

মহাদেব সিগারেট টানতে টানতে লীলার খবর নিতে তিনতলায় চলে গেল।

লীলার বয়স এমন কিছু বেশী নয়, বড় জোর চব্বিশ কি পঁচিশ। চেহারার দিক দিয়ে খাপসুরৎ বলা যেতে পারে। কিন্তু হলে কি হয়, ভগবানের মার—বড় মার। অসুখে পড়ে স্বাস্থ্য তার একেবারে ভেঙে গেছে। এখন সে বুড়ীরও অধম! রূপ গেছে, যৌবন গেছে, অকাল বার্দ্ধক্যের ছায়া তার সারা অঙ্গে। অসুখ আর কিছুই নয় —অজীর্ণতা! অজীর্ণতা তার অস্থিচর্ম্ম সার করে ছেড়েছে। মাথার চুল গেছে উঠে, অমন ফালি ফালি চোখ আজ বিবর্ণ, কোটরস্থ চোখের দিকে চাইলে ভয় হয়, শুকনো হাত পা গুলো অশরীরি প্রেতিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বুকের মাংস শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গেছে। পাঁজরাগুলো একখানা একখানা করে গোণা যায়। পেটটি শুধু তার জয় ঢাকের মত দিনকে দিন স্ফীত হয়ে উঠছে।

বছরখানেক আগেও সে একজন প্রথম শ্রেণীর নামকরা মেয়ে মানুষ ছিল। তিন সেট্ ছিল তার গহনা,—হীরে মুক্ত জড়োয়ার গহনা। একখানা ফ্ল্যাট ভর্ত্তি আধুনিক আসবাব—খাট, সোকেস,

বুককেস, রেডিও, পাখা, অরগ্যান, সোফা, কাউচ ইত্যাদি। আলমায়রা, সোকেস ভর্ত্তি জামা কাপড়, শাল ইত্যাদি। আধুনিক যুগের পতিতার যা কিছু থাকা উচিত—সবই ছিল তার, কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে আজ আর তার কিছু নেই। অসুখের চিকিৎসা করাতে গেছে একখানির পর একখানি গয়না, তারপর গেছে আসবাব পত্তর, তারপর গেছে জামা, কাপড়। এখন থাকবার মধ্যে আছে শুধু বিছানাটি। ক্রেতা পেলে এটাও বিক্রি করায় আপত্তি ছিল না কিন্তু পুরাতন বিছানার ক্রেতা মেলা সুকঠিন।

'বাবুরা সুখের পায়রা!' কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কিছুদিন বাঁধা বাবুটি তার ছিল, ডাক্তার বদ্যি ডেকে যথাসাধ্য চেষ্টাও সে করেছিল লীলাকে সুস্থ করতে, কিন্তু বরাতের ভোগ যাবে কোথা! হেরে গেল বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ। ওষুধের শিশিতে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল গোটা দুই আলমারি। কিছুতে কিছু হলো না, লীলা দিনকে দিন তার স্বাস্থ্য হারিয়ে যেন এগিয়ে চললো মৃত্যুব মুখে।

বাবুটি তার আসা-যাওয়া কমিয়ে কমিয়ে একেবারেই বন্ধ করলে। প্রথম প্রথম কিছু কিছু সাহায্য করেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাও বন্ধ করলে। লীলার মা গেল নিজে সাহায্যের জন্য, যৎসামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করলে বাবু। দ্বিতীয়বার যেতে বাবুকে আব কিছু বলতে হলো না, দ্বারোয়ানই বিদায় দিলে। শুধু হাতে অপমানিত্ত হ'য়ে ফিরে এলো লীলার মা। লীলার নির্দ্দেশে আর বাবুব বাড়ী-মুখো হয়নি কোনদিন সে।

এদের আর ত্রিভুবনে কেউ কোথাও নেই। মা আর মেয়ে। উভয়ে উভয়ের অবলম্বন।

কানা খোঁড়া, ভিখারী থেকে সুরু করে চোর, বদমায়েস, খুনে পর্য্যন্ত পায় মানুষের দয়া, মানুষের সহানুভূতি ; পায় না শুধু তারা— যারা পতিতা। তাদের দীনতম অবস্থা মানুষের মনে করুণার উদ্রেক

করে না, ওদের জন্য সহানুভূতি জাগে না মানুষের মনে, পতিতাদের চরম অবস্থা মানুষের মনে এক বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করে। নিদারুণ ঔদাসীন্যে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যেন সাধারণ মানুষের ধর্ম!

ভিক্ষা চিরদিন যারা দিয়ে এসেছে তাদের পক্ষে ভিক্ষা নেবার জন্য হাত পাতা যে কতখানি মর্মান্তিক তা জানে এক ভুক্তভোগী।

মানুষ চিরদিনই অবস্থার দাস। যা কোনদিন কেউ করেনি, করবে বলে চিন্তাও করেনি, বিধাতা সময়ে সময়ে তাকে দিয়ে ঠিক সেই অচিন্তিত, অকল্পিত কাজই করিয়ে নেয়।

এদেরও তাই করতে হলো। যাদের কাছে কোনদিন এরা উঁচু মাথা নত করেনি, করার কল্পনাও করেনি, চিরদিনই যাদের সঙ্গে সমানে টেক্কা দিয়ে এসেছে—সেই সব বন্ধু বান্ধব, বাড়ীর লোকের তারা দারস্থ হলো। অচেনা, অজানার কাছে করুণাপ্রার্থী হ'তে মানুষের বাধে না কিন্তু অন্তরঙ্গের করুণাপ্রার্থী হ'তে মানুষের লজ্জায় মাথাকাটা যায়, সে সত্যিই বড় মর্মান্তিক, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! নিরূপায় লীলা মহাদেবের শরণাপন্ন হয়। বাড়ীওলার শরণাপন্ন হওয়া মানেই বাড়ীর লোকের শরণাপন্ন হওয়া।

ডাক্তার, বদ্যির পাট বর্তমানে তার শেষ হ'য়ে গেছে। জীবনের আশা আর সে করে না। কিন্তু মা কিছুতেই মেয়ের জীবনের আশা ছাড়বে না। ডাক্তার, কবিরাজ হার মানলে কি হবে, মা তার হার মানেনি! নাই বা রইলো টাকা পয়সা, বিনা পয়সায় ধূলাপড়া, জলপড়া খাওয়াতে তো দোষ নেই। চার, ছয় আনা পয়সা খরচ করলে যদি কোন ওঝা এসে ঝাড়ফুঁক করে অসুখ সারাতে পারে তো সারাক না! মাদুলি—? কম পক্ষে পোয়া খানেক ওজনের মাদুলি লীলার গলায় দিয়েছে তার মা। টোটকা, টুটকি করতেও কসুর করেনি, যে যা বলেছে বা বলছে তাতেই রাজি। কিন্তু অসুখ যেন তার সারবার নয়।

সেদিন দুপুরে লীলাকে নিয়ে মা তার খেতে এলো গৌরীব ফ্ল্যাটে। আদর আপ্যায়ণের ত্রুটি করলে না গৌরী। অবস্থা যাদের পড়ে গেছে তাদের খাতির একটু বেশী করেই করতে হয়, বিন্দুমাত্র ত্রুটিতে তাদের যে ঘা লাগে তা অতীব করুণ! অভিমানের চেয়ে মানুষের বড় শত্রু আর কে আছে।

নানা তরিতরকারী, মাছ প্রভৃতি দেখেই লীলার আনন্দ। দৃষ্টি-তেই তার অর্দ্ধেক ভোজন হয়ে গেল। পেটে খিদে থাকলে কি হয় —মুখে তো রুচি চাই। দিনের দিন খাওয়াও তার কমে আসছে —শরীরেরই মত। নামে মাত্র খেতে বসলো, খেতে সে কিছুই পারলে না। আপশোষ করলে গৌরী, আপশোষ করলে লীলার মা।

ভুক্তাবশিষ্ট ভাত, ডাল, মাছ, তবকাবী নিয়ে যাবে ব'লে বললে লীলার মা। গৌরী তার সঙ্গে আরো বেশী ভাত ডাল, তরিতরকারী জোর ক'রে দিয়ে দিলে যাতে রাত্রিটাও ওদের ওতেই চলে যায়। শুধু সে দিলে না—ভুক্তাবশিষ্টগু'লি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুযোগও করলে। বললে, মাসীমা। এঁটো-কাটাগুলো রাত্রে গন্ধ হ'য়ে যাবে, ওগুলো নষ্টই হোক। 'তোমাদেব দুজনের খাবাব মত ভাত তবকাবী আমি রাঁধুনী মেয়েকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—লক্ষ্মীর দানা কি নষ্ট করতে আছে মা! এগুলো আমি খাবো আর মেয়েটার জন্যে ঐ ভাল ভাত ডাল। বুঝতেই তো পাচ্ছো মা —কি দিন আমাদের এসেছে। ভগবানের মার—দুনিয়ার বার। এখন এসব এঁটো-কাঁটা পচা-পাচকো বাছতে গেলে কি আমাদের চলে গো রাণী। ওতো আর বাঁচবেই না, তোমাদের পাঁচজনের দয়ায় যে ক'টা দিন। তারপর আমার অদৃষ্টে আছে তোমাদের কারুর না কারুর ঘরে ঝি-বৃত্তি। উঃ—বলতে বলতে লীলার মা হুহু করে কেঁদে ফেললে।

—তুমি কিছু ভেবো না মাসীমা। ভগবান নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন। এমন দিন কি আর চিরকাল থাকবে।

—সেই আশাতেই তো এতদিন বুকবেঁধে ছিলুম গো রাণী, কিন্তু ওর দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে—বলতে বলতে লীলার মায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখের কোল বেয়ে নেমে এলো অশ্রু-বন্যা।

—ভাত কোলের কাছে নিয়ে চোখের জল ফেলতে নেই মাসীমা।

—আর তো আমি খাবো না মা। খাওয়া আমার হয়ে গেছে। চোখের জল মুছতে মুছতে বললে লীলার মা।

লীলা এতক্ষণ বাথরুমে গেছলো আঁচাতে। ফিরে এসে মায়ের চোখে জল দেখে বললে, আমি না মলে তোর কি প্যান প্যানানি ঘুচবে না মা! দিন নেই দুপুর নেই, কেন কাঁদতে বসিস বলতো। কপালে যা লেখা আছে তা কি তুই চোখের জলে ধুয়ে মুছে দিতে পাবিস। কি লো গৌরী—কথাটা আমার ঠিক কি না?

—সত্যি কথাই তো ভাই। আমার গুরুদেব বলেন, বিপদের দিনে কখনও ধৈর্য্য হারাতে নেই। হা হুতাশ করলে দুঃখ আরো মানুষকে চেপে ধরে। বললে গৌরী।

—সবই তো বুঝি মা কিন্তু পোড়া মন বোঝে কই

বিরক্তিভরা কণ্ঠে লীলা বললে, আচ্ছা—এ ছিঁচকাঁদুনে আধ-বুড়ীটাকে নিয়ে আমি কি করি বল দেখি গৌরী। একে আমি আমার রোগের জ্বালায় জ্বর জ্বর, তার ওপর এর ছেলেমানষী হা-হুতাশ আর কান্না কাঁহাতক বরদাস্ত করি। যদিও বা আমি দু'একমাস বাঁচতাম, তা ঘরের জ্বালায় আমায় শীগগীরই মরতে হবে।

—মিছে আমায় দোষ দিচ্ছিস লীলা। তুই যদি মেয়ের মা হতিস তো বুঝতিস—আমার বুকের কি জ্বালা। আমার জ্বালা একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কে বুঝবে বল।

—কথাতেই কথা বাড়ে মাসীমা। ওপরে যাও, বেলা থাকতে

থাকতে একটু জিরিয়ে নাও গে। লীলা বরং আমার ঘরে পাখার তলায় একটু বিশ্রাম করুক। আমি খেয়ে এসে তোর সঙ্গে গল্প করবো। বললে গৌরী।

—ও মা তাও তো বটে! তোর পেটে যে এখনও অন্ন যায়নে মা। আমার মাথায় কি আর মাথা আছে লো রাণী। নিজের দুঃখের কাহিনীই বলছি আলী-কাহন। ব'লে লীলার উদ্দেশে বললে, তুই বাছা তাহলে গৌরীর ঘরে পাখার তলায় একটু আড়মোড়া ভেঙেনে। আমার মাথা খাস,—ঘুমুসনি যেন। ঘুমুলেই জ্বর আসবে। বলে লীলার মা ভাত তরকারী থালা ভর্ত্তি করে নিয়ে তাদের নিজেব ফ্ল্যাটে চলে গেল।

ঝি আসন পেতে জলের ছিটে দিয়ে গৌরীব খাবার জায়গা করে দিলে। জলের গ্লাস, লেবু, নুন, ঘিয়ের ছোট্ট জার, খোলা ছাড়ানো ছোট্ট ছোট্ট ছাচি পিঁয়াজ গুটি কয়েক—, প্রত্যেকটি জিনিষ এক একখানি ছোট্ট রেকাবীতে সাজিয়ে দেওয়া ভাতের থালার চারি দিকে গোল ক'রে।

গৌরী এসে খেতে বস্‌লো। ঘি, আলুভাতে দি·য়ে খেতে খেতে গৌরী ঝিয়ের উদ্দেশে বললে, হ্যাঁ মেয়ে—আজ বুঝি কাঁচা লঙ্কা দিতে ভুলে গেছ, নাকি বাজার থেকে আনা হয়নি?

—কেন হবেনি মা। ঘরে অঢেল কাঁচা লঙ্কা। কাল তোমার পেট কামড়াচ্ছিল, বাবা তাই তোমায় কাঁচা লঙ্কা দিতে বারণ করেছে। স্মিত হাস্যে বললে ঝি।

—তোমার বাবা তোমায় বারণ করেছে ব'লে তুমি আমায় কাঁচা লঙ্কা দাওনি বেটী!

গালে দুটো আঙুলের চাপ দিয়ে বললে ঝি, বাবাব কথা অমান্যি করবো!

—আচ্ছা, আপাততঃ দুটো কাঁচা লঙ্কা আনো দেখি।

—বাবা যদি এসে বকেন?

—আচ্ছা, সে বুঝবো আমি। সবস হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে বললে গৌরী।

—আমার কিন্তু কোন দোষ নেই মা। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলবো—মা জোর ক'রে কেড়ে কাঁচা লঙ্কা খেয়েছে। ওগো অ বামুন মা, তুমি সাক্ষী বাছা। ব'লে একটা লঙ্কা জলে ধুয়ে গৌরীর পাতের ধারে একটি রেকাবীর ওপর রাখলে ঝি।

—মাত্র একটি!

—আজ ঐ একটাই খাও মা। কাল বরং দুটো খেয়ো।

লঙ্কায় কামড় দিয়ে গৌরী বললে, আচ্ছা, আমি কি ছোট্ট মেয়ে যে তোমরা এই ভাবে আমার খাওয়াব ধরাকাট করবে।

গৌবীর ছেলেমানুষের মত কথা বলার ধবণে ঝি আর রাঁধুনী মেয়ে দুজনেই হেসে ফেললে।

ডাল, ভাজা, শুক্তো, চচ্চড়ি, মাছ প্রভৃতি খাওয়া হবার পর ঝি চায়েব প্লেটে কবে ধরে দিলে দই। দইয়েব সম্বন্ধে গৌবীব দুর্বলতা বড বেশী। দ্বিপ্রহবে ভোজনের সময় দই তাব চা-ই চাই। দৈ না থাকলে সেদিন দুপুবে তার ভোজনটাই হলো অসমাপ্ত।

গৌবী যে অতিবিক্ত মাত্রায় খায় তা নয়, ভোজনের অনুপান যে অনুপাতে বেশী—খোবাক তাব সেই অনুপাতে কম—খুবই কম।

আঁচিয়ে আসা মাত্র ঝি পানেব কৌটা থেকে দু'খিলি পান গৌরীর সামনে এগিয়ে ধবলে।

পান গালে দিতে গিয়ে গৌরী বললে, কালকের মত আজ আবার পানে দোক্তা-হাত দাওনি তো মেয়ে? দেখো বাছা, তাহলে আবাব বমি হ'য়ে যাবে।

—না মা, তোমার পানে মা আজ দোক্তাব ছোয়া পর্য্যন্ত লাগেনি।

—যাও মেয়ে, তোমরা এবার খেতে বসো গে। ব'লে গৌরী

ঘরে এসে ঢুকছিল—নজরে পড়লো রতিপতি আর তার একজন সঙ্গীকে। ওরা তিনতলায় যাচ্ছিল।

—ওমা রতিপতিদা হঠাৎ কোত্থেকে? জিজ্ঞেস করলে গৌরী।

থমকে দাঁড়াল রতিপতি। বললে সঙ্গীর দিকে কটাক্ষপাত করে, শ্যাম বিরহিণী শ্রীরাধিকার দূতী হ'য়ে গেসলাম শ্যামের সন্ধানে মথুরায়। শ্যামকে নিয়ে তাই ফিরছি।

রতিপতির সাথীটিকে দেখে গৌরী তার গা হাতের কাপড় একটু ঢেকে নিলে। সাথীটির উদ্দেশে বললে রতিপতি, আর কেন ভায়া—আমার কাজ তো ফুরিয়েছে! এবার এই নাক বরাবর সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে না গিয়ে বাঁ হাতি দু'নম্বর ফ্ল্যাটে তোমার বিরহিণী রাই খুব সম্ভবত ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে পড়ে তোমার আসা পথ চেয়ে চোখের জলে বালিস ভিজোচ্ছে। যাও, তোমাদের মান ভাঙা ভাঙির পালাগান শেষ করগে—আমি যাচ্ছি। আরে—যাও না। ব'লে রতিপতি তাকে ধাক্কা দিলে ওপরে ওঠবার জন্য।

ললিত একবার গৌরীর মুখের দিকে একবার রতিপতির মুখের দিকে চেয়ে একান্ত জড়সড় হ'য়ে ওপরে উঠে গেল।

—কি ব্যাপার, রতিপতিদা?

—ব্যাপার যথাপূর্বং তথাপরং। এ ব্যাপারে আর নতুনত্ব কি আছে। চল, তোমার ঘরে গিয়ে একটু জল খাই। আবাহনের অপেক্ষা না রেখে রতিপতি পর্দা সরিয়ে গৌরীর আগে নিজেই ঘরে এসে ঢুকলো। পিছনে ঢুকলো গৌরী।

—আরে—এ কে! লীলা নয়—? কি সর্বনাশ, তোকে যে আর চিনতে পারা যায় নারে বাপু। একি হ'য়েছিস? লীলার কঙ্কালসার দেহের দিকে বিস্ময়-বিহ্বল নয়নে চেয়ে বললে রতিপতি।

উত্তরে লীলার মুখে ফুটে উঠলো প্রাণহীন হাসির রেখা।

গৌরী নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে রতিপতির সামনে টিপয়ের ওপর রাখলে। বললে, শুধু জল খেতে নেই রতিপতিদা,

পেট গুলোবে। ব'লে একখানি ছোট্ট রেকাবীতে ক'রে দিলে ছটি সন্দেশ।

সন্দেশটা মুখে পুরে রতিপতি অস্পষ্ট ভরাটি গলায় বললে, তুমি নিজের হাতে—ছিঃ ছিঃ—ছিঃ—তোমার ঝিকে বললেই হতো।

—কেন, আমি কি এতই বাপু। কোনদিন কি কাকেও জল গড়িয়ে দিইনি ?

—অন্যকে দাও, কিন্তু নিজেকে কোনদিন জল গড়িয়ে খেতে দেখিনি। বললে রতিপতি হাসতে হাসতে।

গৌরী হাসিমুখে বললে, ঝি এখন খেতে বসেছে কিনা তাই নিজেই দিলুম। তোমার ঐ সাথীটি কে—তাতো বললে না ?

—অনুমানেও বুঝলে না ! উনি হচ্ছেন রাজুবিবির বাবু—মানে বাবুর মত বাবু ! নাঃ তুমি কিচ্ছু বোঝ না। অমন করে হাঁ করে চেয়ে আছো কেন ? আরে বাপ্—উনি হচ্ছেন রাজুর ভালবাসার বাবু। ডাক নাম ললিত আব চলতি নাম মাষ্টার। রাজু ওর দেশে আমায় পাঠিয়েছিল ওর গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনতে—বুঝলে। বামাল হাজির ক'রে দিয়েছি বাবা, এবার ওরা বোঝাপড়া করুক। ব'লে রতিপতি একটা ছোট্ট টিনের সিগারেট কেস বের করলে। তার ভেতর আছে গোটা তিনেক সিগারেট আর গোটা পাঁচ সাত বিড়ি। সে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললে, তোমার দেশলাইটা একবার দাও তো গৌরী।

সিগারেট ধরিয়ে রতিপতি বললে নিজের জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে, যাই—জামা কাপড়গুলোয় একটু সাবান দিয়ে নিই, নইলে তোমাদের এই সোফা কাউচের ওপর বসতে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। এসব হচ্ছে খোলার বস্তীর পোষাক !

—কি যে বল, রতিপতিদা ! ব'লে গৌরী পাখাটার স্পীড্ একটু বাড়িয়ে দিলে।

—হ্যাঁ ভালো কথা! তোর সেই মেড়োবাবুটারসঙ্গে ক'দিন আগে আমার দেখা হয়েছিল। বাবুসাহেব বন্ধুবান্ধব সমেত গাড়ী ছ' তিনেক মেয়ে মানুষ নিয়ে বাগান পার্টি করতে যাচ্ছে। তবলচী হিসাবে সঙ্গে যাবার জন্যে আমায় ধরে টানাটানি। বললে রতিপতি লীলার মুখের দিকে চেয়ে।

—আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে?

—হ্যাঁ, তা একবার করেছিল। বললুম—তার শক্ত ব্যায়রাম, বোধ হয় বাঁচবে না!

—কি বললে শুনে?

—কি আর বলবে, বললে—যানে দেও। ব'লে রতিপতি সিগারেটে একটা সুখ টান দিলে।

একটা টানা নিঃশ্বাস ফেলে লীলা বললে, ব্যাটাছেলে জাতটা এমনি বেইমানই বটে!

—তোমরাও কিছু কম যাও না, মাণিক! বলে হাসতে হাসতে রতিপতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সটান কলতলায় নেমে এলো রতিপতি। গায়েব জামা,—গেঞ্জি জলে ভিজিয়ে সাবান দিতে গিয়ে মনে পড়লো সাবানেব কথা। কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে রতিপতি সাবান কিনে এনে জামা, গেঞ্জিতে সাবান ঘষতে বসলো।

রাজুর চাকর সুখন এসে বললে, রাতিপাতিবাবু! রাজুমায়ী আপকো বোলাতা হ্যা!

—দেখতা নেই, পিরানমে সাবুন লাগাতা হ্যা। জলদি একঠো গামছা লেয়াও। গামছা পিনকে কাপড়ামে সাবুন লাগায় গা। বুঝতা হ্যা?

রতিপতির হিন্দী শুনে সুখনের মুখে হাসি ফুটলো। বললে, হাঁ —বোঝতা হা!

—হাঁ, ছোট্কে যাও—দৌড়কে লেয়াও। উঃ শালার গেঞ্জিতে

তেলচিটে ধরে গেছে। ব'লে গায়ের জোরে সাবান ঘষতে সুরু করলে রতিপতি।

পিছন ফিরে সুখনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রতিপতি বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বললে, ঝুটমুট্ কাহে খাড়া হ্যা! জলদি লেয়াও একঠো। খাড়া হোকে মুচকি মুচকি হাসতা হ্যা!

—জী! হাঁ—। ব'লে স্মিতহাস্যে সুখন স্থান ত্যাগ করলে।

গেঞ্জি ছেড়ে এইবার রতিপতি জামা ধরলে। নিজের মনেই বলতে লাগলো, জামা কাপড়ে সাবান দেওয়া ভাবী ঝক্‌মারী কাজ। এই জন্যে ধোবাদের এত গুমোব।

—এই লিন বাবু!

মুখ না ফিরিয়ে রতিপতি বললে, এনেছো বাবা গোপীজনমনহর! এরি মধ্যে কেমন করে তিন টপকায় ফিরে এলে চাঁদ? গত জন্মে কি তুমি কিষ্কিন্ধার অধিবাসী ছিলে!

—হামি মদ আনতে যাচ্ছে। কাপড়াটা লিয়ে লিন। বললে সুখন।

—ভ্যালা মোর বাপ্‌রে গামছা চাইতে কাপড়। দাও বাবা এই কাঁধে ফেলে দাও।

কাপড়টা কাঁধে ফেলে দিয়ে গেল সুখন নিজের কাজে। রতিপতি কাপড় ছেড়ে নিজের কাপড়ে সাবান দিয়ে রেখে ওপরে চলে গেল। —পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে, কি হে মাষ্টার! ভেতরে যেতে পারি?

—কি যে ঢঙ্ কর রতিপতি! ভিতর থেকে বললে রাজু।

—বাঃ বাঃ বাঃ এক চোখে হাসি আর এক চোখে কান্না! "যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, কৃষ্ণের পাশে বলরাম!" বলে কীর্ত্তনের সুরে গাইলে রতিপতি, 'আহা কিবা মানিয়েছেরে!'

—ভালো হচ্ছে না কিন্তু রতিপতি! আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কৃত্রিম ঝঙ্কারে বললে রাজু।

—নাও ঠ্যালা, খারাপ আবার কোনখানটায় হলো হে, মাষ্টার? যাই বাবা, কাপড় জামাগুলো কেচে ফেলি। বাজার গরম। এদের মেজাজ ঠাণ্ডা না হ'লে আমার মত ইতরে জনার প্রবেশ নিষিদ্ধ। ব'লে চলে যাচ্ছিল রতিপতি। রাজু বাধা দিয়ে বললে, সুখনকে ব'লে দিয়েছি—তোমার কাপড় জামাগুলো সব সে-ই কেচে দেবে।

—আহা হা, গতরটি তোমার সুখে থাক! তোমার মানে তোমার সুখনের। আমি তাহলে গদিয়ান হ'য়ে বসে একটা সিগারেট ধরাই। দাও হে মাষ্টার—একটা নেশা! বলি--মথুরা ছেড়ে শ্রীরাধিকার কুঞ্জে এমন বোবা মেরে গেলে কেন দাদা? ছিলে রাজা—এবার হলে রাখাল! গোয়ালার ছেলে, জাত ব্যবসা ছাড়লে—

—বাজে বক্ বক্ করো না রতিপতি। নাও—সিগারেট খাও। শুষ্ককণ্ঠে বললে ললিত।

—বুঝেছি! তোমাদের মধ্যে মন কষাকষি, মান অভিমানের পালা গান এখনো শেষ হয়নি। কাপড়ে সাবান দেওয়ার ছল করে অবসর তো তোমাদের অনেকখানি দিলাম মাণিকজোড়!

রতিপতির কথায় কেউ উত্তর দিলে না। রাজু নীরবে চয়নিকার পাতা উল্টাতে লাগলো, ললিত একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে যেতে লাগলো। রতিপতি ওদের অবস্থা লক্ষ্য করে মনে মনে হাসলে। বললে, তিন মাসের বিরহ ব্যথা কি তিন ঘণ্টায় উপশম হয়! সময় লাগবে। তবে ওষুধ দরকার, হাজার হলেও ব্যায়রাম শক্ত তো! এ্যাই—এ্যাই ওষুধ এসে গেছে!

সুখন মদের বোতল মেঝের বুকে নামিয়ে রাখলে। কর্ক-স্ক্রু এনে দিলে। ট্রের ওপর তিনটে গ্লাস, দু প্যাকেট সিগারেট সাজিয়ে রাখলে ঢালা বিছানার ধারে ম্যাটিনের ওপর। আলমায়রার ভিতর থেকে বার করে দিলে তিনটে সোডার বোতল।

ঢালা বিছানার দুদিকের দুটি কোণ নিয়েছে রাজু আর ললিত। রতিপতি বসে বিছানার মাঝখানে। কর্ক-স্ক্রু দিয়ে মদের বোতল

খুলতে খুলতে বললে রতিপতি, রাজু খুলে বসেছে চয়নিকা, এবার মাষ্টার—তুমি খুলে বসো একখানা অভিধান বা এমনি একটা কিছু। আর আমি খুলে বসি মদের বোতল। এতে যখন তোমাদের স্পৃহা নেই তখন আমার দিকে নিশ্চয়ই তোমরা নজর দেবে না!

ওরা যেমন নীরব ছিল তেমনি নীরবই রইলো, রতিপতির কথায় কোন উত্তর দিলে না, সত্যিই যেন মদের ওপর তাদের কোন স্পৃহা নেই,—কোনদিন ছিলও না।

রতিপতির নির্দ্দেশে সুখন সোডার বোতল খুলে দিলে। রতিপতি তিনটে গ্লাসে মদ ঢেলে পরিমাণ অনুযায়ী সোডা দিলে। সুখনকে হুকুম করলে মিঠা পান আনতে। সুখন চলে গেল।

—এম[illegible] [illegible]নায়সাধি সাধনা করা বাবা আমার ধাতে সইবে না। যে যাব গ্লাস তুলে নাও। তবে Ladies first! ধবগো রাজুবিবি! বলে একটা গ্লাস এগিয়ে ধবলে বতিপতি।

বাজু গ্লাস ধরলে। ললিত নীববে সিগারেট টানতে লাগলো একান্ত নিস্পৃহভাবে। বতিপতি তাব গ্লাস নিঃশেষ কবে একটা সিগাবেট ধবালে। ললিতেব দিকে কট্‌মট্‌ কবে চেয়ে বাজু বললে, গ্লাস ধববে না নিজে নিজের মাথায় গ্লাস মেবে রক্তগঙ্গা হবো!

ললিত তাড়াতাড়ি গ্লাসটা ট্রেব ওপব থেকে তুলে নিলে

-খেলে না যে?

ললিত এক চুমুকে গ্লাসটা খালি কবে ফেললে। ভয়ে সে মদ খেলে ঠিক সববৎ খাওয়াব মত।

—আমায় একটু ব' দাও বতিপতি! বলে খালি গ্লাসটা সে ট্রের ওপর রেখে দিলে।

বেশ খানিকটা র' মদ এক নিঃশ্বাসে খেয়ে রাজু কতকটা নিজের মনে কতকটা রতিপতির উদ্দেশে বললে, উঃ পায়ে ধ'রে বাবুকে সেধে আনতে হবে! ধাঙোড়ের আধোয়া খ্যাংরা কাল নিজে মারবো নিজের মুখে! পীরিতের কাঁথায় আগুন দেবো!

—দ্যাখো রাজু ; ঝগড়া ঝাঁটি আমি পছন্দ করিনে। আমি হচ্ছি শান্তিপ্রিয় লোক। হাজার চেষ্টা করেও তোমার সন্ধান পাইনি—সে দোষ কি আমার !

—মিথ্যে কথা ! আমার সন্ধান করলে তুমি নিশ্চয়ই আমায় পেতে। সেদিন পর্য্যন্ত আমি ঐ শরৎসুন্দরীর বাড়ীতেই ছিলুম। দ্যাখো মাষ্টার, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করো না ! আমি সব বুঝেছি। আদত্ কথা কি জানো—তোমার পিরীতে আমি পড়েছি, তুমি তো পড়নি ! ধক্ থাক্ আমাকে !

মধ্যস্থ হয়ে রতিপতি ওদের ঝগড়া মেটাতে চেষ্টা করে। বলে, কেন শুধু শুধু বেচারীর ওপর খড়্গহস্ত হচ্ছো মানিক ! বারো বছর মাষ্টারী করলে মানুষ নাকি গাধা হয়ে যায়, মাষ্টারের আমাদের ক'বছর মাষ্টারী হলো কে জানে ! তবে বারো বছর হয়নি নিশ্চয় ! খুনোখুনির পর তুমি যে ঐ শরৎসুন্দরীর বাড়ীতেই থাকতে পারো তা আমাদের মাষ্টার মোটে ধারণাই করতে পারে নি। প্রদীপের তলাটাই থাকে আঁধারে ভরা কিনা ! যাক্ গে—যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন খ্যামা-ঘেন্না ক'রে একটা আপোষ মীমাংসা করে নাও ! আহা, বেচারী কখন এসেছে—এখন পর্য্যন্ত বুঝি কিছু খেতেও দাওনি। নাঃ তোমাদের প্রাণটা সত্যিই বড় কঠিন।

—না—আমার খিদে পায়নি। এখন আমি কিছু খাবো না। অভিমানভরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে ললিত।

—তুমি আর দর বাড়িও না মাষ্টার ! কত কষ্টে আবহাওয়াটাকে একটু মানানসই করে নিচ্ছি আর তুমি দিচ্ছো ব্যাগড়া। ব'লে রতিপতি রাজুর দিকে চেয়ে বললে, নিয়ে এসো তো ভাই—তোমার ঘরে কি খাবার-দাবার আছে।

রাজু নীরবে উঠে গেল। আলমায়রা খুলে বার করলে এক ছড়া মর্ত্তমান কলা, এক ভাঁড় রাবড়ী, গোটা কয়েক কড়া পাকের সন্দেশ,

STATE CENTRAL LIBRARY 5684 ২০
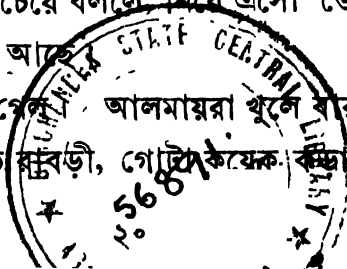
পাঁউরুটি আর জেলির শিশি। দুটো ডিসে নিজেই সাজিয়ে ধরে দিলে ওদেব সামনে।

বতিপতি বললে, আব তুমি?

—আমি এই অবেলায় ভাত খেয়েছি। আমিও খেয়ে উঠেছি আব তোমবাও এসে বাড়ীতে পা দিয়েছো. ভগবানেব শপথ করে বলছি বতিপতি, মিথ্যে কথা নয়। কৈ—খাচ্ছো না যে? ললিতেব উদ্দেশে বললে বাজ।

—আমাব এখন খাবাব ইচ্ছে নেই। শুষ্ক কণ্ঠে উত্তব দিলে ললিত।

—দ্যাখো বতিপতি! আমি কিন্তু বাগলে—

—দোহাই তোমাব বিবিসাহেবা, তুমি আব বেগো না। আমি খাওয়াচ্ছি মাষ্টাবকে। যাও দেখি, তুমি একট ছাত থেকে বেড়িয়ে এসো। বললে বতিপতি।

বেশ মোটা করে একটা ডোজ নিজেব গ্লাসে নিয়ে বাজু ঘব থেকে বেবিয়ে গেল। বতিপতি খেতে স্নরু করলে। ললিত নিজেব হাতে মদ ঢেলে নিলে, খাবাবে সে হাতও দিলে না। বতিপতি ললিতেব হাত থেকে মদেব গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে বললে, দেখতে ছেলেমানুষটি হলে কি হবে—তোমাব বযস হয়েছে মাষ্টাব!

—গ্লাস দাও, বতিপতি!

—যদি বলি না খেলে তুমি গ্লাস পাবে না?

ক্ষণেক গুম খেয়ে থেকে ললিত বললে, পাবো তুমি আমাকে আটকাতে?

হাসলে বতিপতি ললিতেব দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি, তুলে নিলে মদেব গ্লাস। এক চুমুক খেয়ে একটা সিগাবেট ধবালে বেশ দিলদবিয়া মেজাজে।

—কি, কথা বলছো না যে?

—বলবার তো অনেক কথাই আছে মাষ্টার, কিন্তু কি কথা বলবো আর বলবোই বা কাকে!

তিক্ত কণ্ঠে ললিত বললে, হয়তো সত্যিই একদিন তুমি ছিলে ফিলজফির প্রফেসর, তাই বলে সব সময় তোমার হেঁয়ালীভরা ফিলজফি বরদাস্ত করা যায় না! গ্লাস দাও বলছি!

নীরবে রতিপতি গ্লাসটা ওর হাতে তুলে দিলে।

—আমারি ভুল হ'য়েছে মাষ্টার। বয়স হলে কি হয়—তুমি সত্যিই এখনো ছেলেমানুষ!

—তার মানে?

—তুমি কি ভাবো মাষ্টার যে এটা তোমার ঘর বাড়ী! প্রেমে হয়তো তোমাদের ভেজাল নেই কিন্তু এখানের এ অভিশপ্ত প্রেম তো চিরস্থায়ী নয় বন্ধু! শান্তির জন্যেই তো এ পথে পা বাড়িয়েছ, তাই বলি—অশান্তিকে ডেকে এনে জীবনটাকে দুর্বহ করে তোলবার চেষ্টা করো না! তবে হ্যাঁ, এক শ্রেণীর লোক এখানে আসে—যারা শান্তি পায় অশান্তির আগুনে জ্বলে! তুমি তো সে জাতের লোক নও, মাষ্টার।

—তুমি কি বলতে চাও রতিপতি—বিনা দোষে যে আমাকে যা-তা বললে—আমি আবার তারি ঘরে—

—আলবৎ খাবে! এক ঘণ্টা পরে না খাও—দু' ঘণ্টা পরে খা'বে। দু'ঘণ্টা পরে না খাও—দশ ঘণ্টা পরে খাবে। মোট কথা তোমায় খেতেই হবে। আত্মপ্রবঞ্চনা করা পাপ বুঝতেই পাচ্ছো—যত বিলম্ব করবে তত অশান্তি বাড়বে।

ললিত কোন কথা না ব'লে তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটা'র পর একটা সিগারেট পোড়াতে লাগলো।

—রাজু এসে পড়লে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পুনরাভিনয় ঘটতে বিলম্ব হবে না মাষ্টার! দোহাই তোমার, আমার কথা রাখো।

ললিত আর দ্বিরুক্তি না ক'রে খেতে সুরু করলে। রতিপতি এক পেগ আন্দাজ মদ একটি গ্লাসে ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিলে।

—নাঃ এই লাইন ছেড়ে দেবো রতিপতি! এখানে এসে শান্তি আশা করা মানেই আলেয়ার পিছু পিছু ছোটা!

স্বচ্ছ কণ্ঠে হেসে উঠলো রতিপতি। বললে, সাধ্য কি তোমার! বরাতের ভোগ যতদিন আছে—ভুগতেই হবে।

—হুঁ—তা যা বলেছো! ব'লে ললিত আর এক পেগ মদ গলায় ঢেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে। —আচ্ছা রতিপতি, অন্যে না জানুক কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে মিশে জেনেছি যে তুমি কি! এককালে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রী নিয়ে প্রফেসারি করতে, তোমার আজ এ প্রবৃত্তি কেন?

—আমি যে পাগল!

—একেবারে সত্যি না হলেও কতকটা সত্যি! তোমার মাথার খিল সত্যিই কয়েকটা আলগা! তা নইলে তোমার মত লোক বেশ্যা-বাড়ীর দোরে দোরে ধন্না দেয়—না তবলা বাজিয়ে দিন গুজরাণের চেষ্টা করে!

—তুমি ভুল কচ্ছো মাষ্টার। তবলা বাজাই আমি দিন গুজরাণের জন্য নয়, স্রেফ্ আমোদের জন্য। পাগলই হই আর যা-ই হই —একটা কিছু নিয়ে আমায় বাঁচতে হবে তো! দিন গুজরাণের জন্যে আমি ভাবি না মাষ্টার, এ পাড়ার মেয়েদেব ভাত যতদিন জুটবে— আমার আট্‌কে ততদিন এদের ঘরে বাঁধা। যতদিন আমি এদের জগতে এসেছি—একটা দিনও আমায় না খেয়ে কাটাতে হয়নি।

—নিশ্চয় তোমার মত জ্ঞানী লোক বিয়ে করেনি?

—না—বিয়ে আমি করিনি। তবে সে কাজটা বাকী থেকে গেছে জ্ঞানের জন্য নয়—, সাহসের অভাবে। বয়স যখন ছিল তখন বিয়েটা ছিল আমার কাছে আনন্দের চেয়ে আতঙ্ক বিশেষ। বিয়ে করে সংসারী হওয়ার মত সাহস আমাব কোন দিনই ছিল না। ভগবান রক্ষে করেছেন। গত দিনের চেয়ে মতিগতি আমার এক তিলও বদলায় নি বর্তমানে, বোঝ দেখি—বিয়ে করলে আজ তাদের

অবস্থাটা কি রকম ভয়াবহ হ'য়ে উঠতো! বিয়ে যারা করে মাষ্টার—তারা আর এক ধাতু দিয়ে গড়া। এই যেমন ধর তুমি! তুমি কোনদিন বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না। তোমাকে যতটুকু আমি—

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল রতিপতি—ললিত বাধা দিয়ে বললে, তুমি প্রফেসারি ছাড়লে কেন, রতিপতি?

—সে কি আজকের কথা রে ভাই! কি খেয়াল হলো—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে পণ্ডিচেরী গিয়ে হাজির হলেম। বেশ লাগলো ওখানের আবহাওয়া। আশ্রমের বাসীন্দারা না সন্ন্যাসী আর না সংসারী—গেরুয়ার বালাই নেই। কেউ ওখানে বসে খায় না, সবাই কর্মী। নিজের শিক্ষা বা আভিজাত্য নিয়ে কেউ ওখানে মাথা ঘামায় না। দেখে শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল। মন বললে—এই তো চাই! মদ কি শেষ হয়ে গেল মাষ্টার?

—ঐ তো তোমার চোখের সামনে আধ বোতল মদ বসানো। নাঃ আজকাল দেখছি তুমি আর খেতে পাবো না। বল—তারপর কি হলো? ব'লে ললিত এক পেগ আন্দাজ মদ গ্লাসে ঢেলে রতিপতির হাতে দিলে।

মদের গ্লাস নিঃশেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে রতিপতি আবার বলতে সুরু করলে, তারপর আর কি, চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ওখানে বসেই একটা চিঠি লিখে দিলাম কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। লেগে গেলাম ওখানে উচ্ছিষ্ট বাসন ধোয়ার কাজে।

—তুমি ধুতে এঁটো বাসন!

—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে। তুমি ওখানে কোনদিন যদি যাও তো বুঝতে পারবে যে সে এক নতুন দেশ। না আছে থাকার আড়ম্বর আর না আছে খাওয়ার আড়ম্বর। এ বেলা এক তরকারী ভাত, ও বেলা এক তরকারী রুটি। তরকারীরও আবার বিশেষত্ব আছে, ঢেঁড়সের দিনে মাসকয়েক চললো স্রেফ ঢেঁড়স চচ্চড়ী

—সিমের দিনে স্রেফ সিমের তরকারী—বেগুনের দিনে স্রেফ বেগুনের তরকারী। রুটিন মাপা কাজ, রুটিন মাপা খাওয়া।

—শুনেছি শ্রীমা নাকি প্রতিদিন সূর্য্য উদয়ের সময় ভক্তবৃন্দকে একবার মাত্র দর্শন দেন আর শ্রীঅরবিন্দ বৎসরে মাত্র একদিন ?

ললিতের কথার উত্তর দেওয়া রতিপতির আর ঘটে উঠলো না, বেড়ালছানা কোলে নিয়ে বিন্দু পাগলী পর্দা সরিয়ে দরজার সামনে এসে হাজির হলো। চোখ মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়া চুলগুলো ডান হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বললে বিন্দু, আচ্ছা—আপনারাই বলুন বাবু, আমি না হয় পাগলই হয়েছি, তা বলে দু'আনা—দশ পয়সা নিয়ে কখনো কি বাবু ঘরে আনতে পারি। মুখপোড়া ডোমেদের একবার আক্কেলটা দেখো! খিস্তী ক'রে ব্যাটাচ্ছেলেদের বাপ্ চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে হয় কি না হয়' চারটে পয়সা আপনারা আমাকে দেবেন—বেড়ালছানাটাকে একটু দুধ কিনে খাওয়াবো ?

পাগলীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ললিত একটা আনি ছুঁড়ে দিলে।

আনিটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজার সামনে বিন্দু পা ছড়িয়ে বসলো বেড়ালছানাটাকে দু'পায়ের মাঝখানে চেপে। বেড়ালছানাটা চেপে ধরে আঁচলের খুঁটে সে আনিটা দু তিনটে গেরো দিয়ে বাঁধলে।

পাগলীর পায়ের চাপে ছানাটা পরিত্রাহী চীৎকার করতে লাগলো। ছানাটার চীৎকার শুনে বিন্দু বললে, দেখেছো একবার হারামজাদীর অসভ্যতা! বাবু ভেইয়ার সামনে অমন করে হাড়ি রাখালি করে!

—পয়সা তো পেয়েছিস. এবার ছানাটাকে দুধ কিনে খাওয়াগে যা। বললে রতিপতি।

সে কথার ধার দিয়েও গেল না বিন্দু। বললে অতি বড় ভাল মানুষের মত কাকুতিভরা কণ্ঠে, আচ্ছা- আপনারা তো কাজে অকাজে এখানে ওখানে যান, আমার একটা উপকার করতে পারেন ?

পাগ্‌লীর কথার বাঁধুনি ওদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। অবাক হ'য়ে ওরা পাগলীর মুখের ওপর চোখ তুলে চায়।

—লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে তাহলে বলেই ফেলি! আ-মর্‌ মিউ মিউ ক'রে মরিস কেন! বাধা দিলে কখনো কথা হয়! লোকে কথায় বলে—আপনার ভাল পাগলেও বোঝে, কিন্তু বোঝে না এ মুখপোড়া! হ্যাঁরে মুখপোড়া বাঘের মাসী, বাবু আমার না জুটলে দুধের কাঁড়ি খাবি কোথা থেকে। রোজ রোজ ভিক্ষে ক'রে তোকে তোর কোন্‌ বাপ চৌদ্দ পুরুষ খাওয়াবে—শুনি! আমার কাছে সাফ্‌ কথা, আমি আর লোকেব কাছে তোব জন্যে দাঁত নিকুটি করতে পারবো না বাপু!

—বাজে ভ্যাড় ভ্যাড় করিসিনি, বিন্দু! এখান থেকে আপাততঃ তুই বিদেয় হ'! বললে রতিপতি।

—ডোমেরা বলে কিনা দু' আনায় বাবু ঘরে নিতে। আঁটকুড়িব ব্যাটাদের একবার আক্কেলটা দেখেছেন! আপনারা আমার একটা ভাল দেখে বাবু জুটিয়ে দিন না।

—আচ্ছা, তোমার জন্যে একটা ভাল বাবু কুমারটুলি গিয়ে বায়না দিয়ে আসবো! আজকের মত পাতলা হও তো সোনারচাঁদ! বললে রহস্যঘন কণ্ঠে রতিপতি।

—আমি এবার খিস্তি-বিখিস্তি ক'রে বসবো বাপু! বাবু ভেইয়া নিয়ে ঠাট্টা তামাসা আমি মোটেই পছন্দ করিনি—হুঁ! স্পষ্ট কথা বললে যদি বন্ধু বেগড়ায় তো বেগড়াক্‌! কি গো নতুন জামাই, তুমি যে ছাই কথাই বলছো না? ললিতের উদ্দেশে বললে বিন্দু।

—দেবো—তোমাকে একটা ভাল বাবু আমিই জুটিয়ে দেবো। পাগলীকে খুসী করতে বললে ললিত।

—ডোম ফোম নয় কিন্তু! ও ব্যাটারা বড় হারামী। ওরা খালি ফোকটসে কাজ সারতে চায়। বোঝ না কেন—আমার তো এখন

ঘর-দোর নেই আর বাবু ভেইয়াও নেই, পড়ে থাকি লোকের রকে। তা আপনাদের বলবো কি বাপু—সারারাত ডোমেদের ছেলে বুড়ো আমায় জ্বালাতন করে মারবে, দু চোখের পাতা এক করতে দেবে না। আঁটকুড়ির ব্যাটারা কি মানুষের বাচ্ছা—না জানোয়ারের বাচ্ছা! পাঁটা—পাঁটা! বিলকুল পাঁটা! একটা সিগারেট দিন না খাই!

ললিত একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিলে।

—একি চিবিয়ে খাবার জিনিষ যে চিবিয়ে খাবো! কেন—দেশলাই দিতে কি ভয় হয়, পাছে একটা গোটা দেশলাই আমি মেরে দিই! ধ্যেৎ—সে বান্দা আমি নই। দেশলাই মেরে চোখের সামনে পকেটস্থ করে ভদ্দোর লোকেরা!

ললিতের ছুঁড়ে দেওয়া দেশলাইটায় সিগারেট ধরিয়ে পাগলী তার বেড়ালের মুখে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরে বললে, নে—একটান খা, খেতে শেখ।

বেড়ালটা চীৎকার করে যেন প্রতিবাদ জানালে।

—এঁ—সতীপনা! খাতায় নাম লিখিয়ে সিগারেট খাবেন না—মদ খাবেন না—বাবু ঘরে আনবেন না! তবে করবেন কি—মালা জপ? চলে যা শ্রীবৃন্দাবন। সেবাদাসী হ'য়ে তিলক ফোঁটা কেটে করগে যা মালা ঠক্ ঠক্। তেব্বি জাত্ কি জগন্নাথ! ব'লে বিন্দু পাগলী দিলে তার বেড়ালটাকে ছুঁড়ে ফেলে।

বারান্দায় চিৎপাত হ'য়ে পড়ে গিয়ে বেড়ালটা যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ করে উঠলো এবং পরমুহূর্তে এক লাফে উঠে ছুট্টে একদিকে চলে গেল।

—দেখলেন বাবুরা একবার বেইমান জাতের বেইমানী! কোথায় দুধ কিনে খাওয়াবো ব'লে আপনাদের কাছে পয়সা ভিক্ষে করলুম—না বেইমান জাত এক ছুটে ভাগল্বা হয়ে গেল! মুখ পোড়া একদম বুটো নোচ্চার জাত? ওর কি কোন ধম্মোজ্ঞান আছে! বলে বিন্দু পাগলী গান ধরলে :—

"এত ভাল বাসরে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে।
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে ॥
এত যে বাসিতে ভাল,
ভালবাসা জানা গেল ॥
পেতেছিলে মায়াজাল
অবলা বধিবার তরে ॥"

গান শেষ করে পাগলী হাত পেতে বললে, দিন—প্যালা দিন!

মুগ্ধ ললিত উঠে গিয়ে তার হাতে একটা আধুলি ফেলে দিলে। গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পাগলী চলে গেল।

ললিতের বিস্ময়-মুগ্ধ ভাব লক্ষ্য করে হাসলে রতিপতি। বললে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই মাষ্টার। এক কালে ওর গান শোনবার জন্যে কত রাজ রাজড়ার দরবারে ওর ডাক পড়তো। এই গলা শুনেই তোমার বিস্ময়ের অন্ত নেই, তখনকার গান যদি ওর শুনতে তাহলে তুমি পাগল হ'য়ে যেতে মাষ্টার।

মিথ্যা বলেনি রতিপতি। এককালে বিন্দু একজন নামকরা বার-বণিতা ছিল, অপরূপ, অপূর্ব অপ্সরানিন্দিত ছিল তার কণ্ঠ। আজ যাদের দুয়ারে দুয়ারে সে বাসন মেজে, বাজার ক'রে দিন গুজরাণ করে—এমন একদিন ছিল যেদিন ও এদের মত পাঁচ সাতটা মনিবকে কিনতে পারতো।

কাঠামোটাই শুধু পড়ে আছে, সে চেহারা—সে রূপ আজ আর নেই—তার তিলাংশও নেই। রূপ গেছে, যৌবনে পড়েছে ভাঁটা, অযত্নে বিন্দুর দেহে এসেছে অকাল বার্দ্ধক্যের ছাপ। মাথায় এবং বুকে কাপড় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করে না। অনেক সময় পরণে কাপড় রাখার তাগিদও তার থাকে না। আজ সে অর্দ্ধ উলঙ্গ বা পরিপূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় বসে থাকে, পায়চারি করে। আত্মসম্ভ্রমসম্পন্ন ভদ্রলোক তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, রঙ্গ-চিঙ্গার দল তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। বিন্দু

তাদের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে, নির্লজ্জের দল সেই আদিরসমিশ্রিত গালাগাল শুনে হাসে, উপভোগ করে, আরো বেশী ক'রে কর্ণ কুহরকে তৃপ্ত করার জন্য তাকে নিয়ে রঙ্গ করার চেষ্টা পায়।

অথচ এমন একদিন ছিল—যেদিন এই বিন্দুর মুখ তো দূরের কথা, পায়ের নখ পর্য্যন্ত কেউ দেখতে পেতো না। প্রথম শ্রেণীর বারবণিতাদের মত সেও থাকতো চিকের আড়ালে। চাকরে করতো তার বাজার, ঝিএ করতো তার ঘর সংসারের কাজ, ফাই-ফরমাস খাটতো একটা ছোট ছেলে আর হেঁসেলের ভার ছিল এক উড়ে ঠাকুরের ওপর। এই ঠাকুরটি ছিল রূপে রতিপতি।

দরজায় ছিল বিন্দুর ভোজপুরী দ্বারোয়ান। বিন্দুকে পাহারা দেবার জন্য তার মাড়োয়ারী বাঁধা বাবু রেখেছিল ঐ ভোজপুরীকে। ভোজপুরী মাইনে খেতো মাড়োয়ারীর কিন্তু কথা শুনতো বিন্দুর। ফলে—বিন্দুকে পাহারা না দিয়ে সে পাহারা দিত তার বাড়ী।

বাড়ীখানা ছিল বিন্দুর নিজস্ব। ওটা কোন বাবুর দেওয়া দান নয়—গান গেয়ে অর্জিত অর্থে সে ঐ বাড়ীখানি তৈরী করিয়েছিল, মাড়োয়ারী বাবুর একখানা মোটর বিন্দুরই গ্যারেজে থাকতো তার ব্যবহারের জন্য। ড্রাইভার থাকতো নীচে ঐ গ্যারেজেরই পাশের একখানি ঘরে।

বিন্দুর সখ ছিল ফুলের। বাড়ীর সামনের প্রাঙ্গনে সে করিয়েছিল ছোট্ট একটি ফুলের বাগান।

শুধু ফুল নয়, বিড়ালের সখও তার ছিল ছেলেবেলা থেকে। ভাল ভাল বিড়াল সে পুষতো এবং নিজের হাতে তাদের যত্ন করতো। বিড়ালের অযত্ন সে সইতে পারতো না, এই নিয়ে ঝি, চাকরের সঙ্গে প্রায়ই হতো তার বচসা।

মাড়োয়ারী বাবুটি তার বিড়াল দুচক্ষে দেখতে পারতো না, কিন্তু

বিন্দুর বিড়ালের যত্ন নিতে সে চেষ্টার ক্রটি করতো না—শুধু বিন্দুকে খুসী করতে।

হীরে, জড়োয়া, পান্না, চুণি, মুক্তো প্রভৃতির তিন চার সেট গহনা, নানা ডিজাইনের সাত সেট সোনার গহনা, রূপার বাসন, ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সোনার সিংহাসন, নগদ টাকা প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার। এ ছাড়া ছিল পাঁচ সাতখানা ঘর ভর্ত্তি খাট, পালঙ্ক, আসবাব, বিছানা, পিতল কাঁসার বাসন।

বিন্দু ছিল একদিন ঐ সব জিনিষেরই মালিক। সেদিনের বিন্দু আর আজকের বিন্দু। আজকের বিন্দুকে দেখলে সত্যিই মনে হবে—ও সব যেন আরব্য উপন্যাসের অলৌকিক গল্প।

ভোগ তার অদৃষ্টে বিধাতা বেশী দিন লেখেননি তাই যৌবনেই তাকে যোগিনী হ'য়ে পথে নামতে হলো। তার সব গেল—বাড়ী গেল আসবাব পত্র গেল, নগদ টাকা গেল—যা ছিল সব কর্পূরের মত তার হাত ছাড়া হ'য়ে গেল।

কেমন করে—? অল্প কথায় উত্তর দেওয়া যায়—"পিরীতি হলো শূল গো অর্থাৎ কাল গো।"

অর্থই জগতে সব নয়, অর্থ শান্তি দিতে পারে না। অর্থে পেট ভরে কিন্তু বুক ভরে না। বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর কাছে বিন্দু অর্থের আশাই করেছিল, শান্তির আশা করেনি। কিন্তু সেও মানুষ! বুক খালি রেখে অপর্য্যাপ্ত ভোগের মাঝে ক'দিন মানুষ বাঁচতে পারে!

ভোজপুরীকে হাত করলে বিন্দু! অর্থে কি না হয়!

লুকিয়ে এক সুপুরুষ তরুণের সঙ্গে বিন্দু করলে ভাব ভালবাসা। মাড়োয়ারী বাবু সপ্তাহে আসতেন বড় জোর দু'দিন—না হয় একদিন, তাও ঘণ্টাখানেকের জন্য। দ্বারোয়ান, ড্রাইভারের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিন্দুর তত্ত্বাবধানের ভার—ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বিন্দুর ভালবাসার বাবুটি আর কেউ নয়—স্বয়ং ড্রাইভার। ড্রাইভারটি সুন্দর, সুপুরুষ, তরুণ—নাম নিমাই। যার প্রেম-বন্যায়

'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায় রে"—এ নিমাই সে নিমাই না হলেও—এর প্রেম-বন্যায় বিন্দু ভেসে গেল আপন হাবা হয়ে।

দিন যায়। ওদের প্রেম দরিয়ায় তুফান ওঠে। ভোজপুরী মাইনে ছাড়া উপরি পায়; খায়-দায় আর তার বহুদিনের পুরাতন তুলসীদাসী রামায়ণের জরাজীর্ণ পাতা উলটে সুর করে পড়ে।

অত্যধিক অত্যাচারে বছরখানেকের মধ্যেই নিমাইয়ের শরীর ভেঙে পড়লো। দেশে যাবার নাম করে নিমাই তার মনিবের কাছ থেকে মাস কয়েকের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিলে বা বিন্দুই করিয়ে দিলে। আসলে তার দেশে যাওয়াটা সব ভুয়ো, বিন্দু তাকে নিজে খরচ দিয়ে বিদেশে বায়ু পরিবর্তনে পাঠালে। বিদেশে নিমাইকে একা পাঠাতে বুকটা তার ভেঙে গেল, বিরহানলে জ্বলে উঠলো তার সারা মনপ্রাণ কিন্তু এই বলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলে যে—প্রেমের চেয়ে প্রাণটা আগে। নিমাই বেঁচে উঠলে সারা জীবন তারা প্রেম দরিয়ায় হাবু-ডুবু খেতে পারবে। কিন্তু নিমাই যদি এ জগৎ ছেড়ে চলে যায়—উঃ ভাবতেও বুকটা বিন্দুর ছাত করে ওঠে, সারা দেহ-মনে জাগে মৃত্যুর শিহরণ। চোখের জলে সে নিমাইকে বিদায় দিলে।

নিমাইয়ের সঙ্গ নেবার জন্য প্রাণটা তার আকুলি বিকুলি করে উঠলো, কিন্তু বিন্দু নিরুপায়। নিমাইয়ের সঙ্গে গেলে সব জানাজানি হয়ে যাবে, মারা যাবে তার রুটি, নিমাইয়ের যাবে চাকরী। উঃ পরাধীন হওয়ার কি বিড়ম্বনা! মনটা বিন্দুর চলে গেল নিমাইয়ের সঙ্গে, দেহটা শুধু পড়ে রইলো তার বাড়ীতে।

দিবা রাত্র প্রতিটি মুহূর্তে নিমাই ভাসছে তার চোখের সামনে। জেগে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ নিমাইয়ের চিন্তাই তার ধ্যান, ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে নিমাইকে! লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়, খেতে বসে খাবার মুখে তুলতে গিয়ে বিন্দু আনমনা হ'য়ে মুখের গ্রাস নামিয়ে রাখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বাথ-রুমে গিয়ে বসে থাকে আর নয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে নিমাইয়ের

কথা, ভুলে যায় স্নান করতে। বাইরে থেকে কেউ তাকে মনে করিয়ে দিলে তবে সে আপনাতে আপনি ফিরে আসে, মাথায় জল ঢালে।

যে বিড়ালকে বিন্দু অত ভালবাসতো—সে বিড়ালের দিকে যেন ফিরে চাইতেও তার ইচ্ছা যায় না।

দিনের দিন বিন্দু শুকিয়ে আসে, দেহে মুখে জাগে বিবর্ণতা। না থাকে তার খাওয়ায় রুচি আর না থাকে প্রসাধনে।

পিয়ারী তার অসুস্থ হ'য়েছে ভেবে মাড়োয়ারী বাবু বড় বড় ডাক্তার এনে হাজির করেন। ডাক্তাররা বিন্দুকে পরীক্ষা করে নানা জনে নানামত প্রকাশ করে কিন্তু সঠিক অসুখটা যে কি তা সঠিকভাবে কেউ-ই নিরূপণ করতে পারে না। কেমন করে পারবে, অসুখ তো তার দেহে নয়—মনে! মনের রোগ ডাক্তার ধববে কেমন করে—সে যে ধন্বন্তরীর নাগালের বাইরে!

শিশি শিশি ওষুধ আসে, বিন্দু সে সব ওষুধের শিশি অন্যের অলক্ষ্যে নর্দ্দমায় ঢেলে দিয়ে শিশি খালি করে খাওয়ার ভাণ করে।

শেষ পর্য্যন্ত বিন্দুকে শয্যাশায়ী হ'তেই হলো। মাড়োয়ারী বাবুর নির্দ্দেশে ডাক্তার এলো, এলো পাশ করা নার্স। পুরোদমে চিকিৎসা সুরু হলো বিন্দুর। সব কিছু তত্ত্বাবধানের ভার পড়লো রাঁধুণী ঠাকুরের ওপর। লোকটি সত্যিই বড় ভাল, তাব চেহারার মত মনটিও তার স্বচ্ছ, শুভ্র। আপ্রাণ চেষ্টায় সে গৃহকর্ত্রীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলে।

মাস কয়েকের মধ্যে ঈষৎ সুস্থ হ'য়ে উঠলো বিন্দু। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, তারপব তার শরীরের একঘেয়েমি অসুস্থতা আব কিছুতেই বাড়েও না আর কমেও না। ডাক্তাবরা প্রমাদ গণলেন, ততোধিক প্রমাদ গণলেন বামুন ঠাকুর।

'মাইনে করা দাতার বুকে মায়ার ব্যথা নাই!' নার্সরা সময়ের মাপকাটির নির্দ্দেশ মত ডিউটি দিয়ে যে যার চলে যায়—, তাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করে রাঁধুণী ঠাকুর। দিনের পর দিন, রাতের

পর রাত নিজের মা বোনের মত দ্বিধাহীন চিত্তে সেবা করে যায় বিন্দুর। কিন্তু বিন্দুর সুস্থ হ'য়ে ওঠার সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিতই সে পায় না। হতাশায় ভরে ওঠে রাঁধুণী বামুন শ্রীমন্তের মন। ডাক্তার, বৈদ্য, মাড়োয়ারী বাবু, স্বয়ং শ্রীমন্ত পর্য্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে। বিন্দুর সেরে ওঠার আর কোন সম্ভাবনাই তারা দেখতে পেলে না।

এ হেন সঙ্কটজনক মুহূর্তে ফিরে এলো নিমাই। অল্প দিনের মধ্যেই বিন্দুর দেহে ও মনে সুস্থতার লক্ষ্মণ দেখা গেল। বিন্দুর সেরে ওঠার আশ্বাসে সকলেই হলেন আশান্বিত। বিন্দুর স্বাস্থ্যের এই আকস্মিক, অস্বাভাবিক উন্নতি দেখে খুসীর অন্ত নেই শ্রীমন্তের। হতাশার ভাব কেটে গেল তার মন থেকে, সে আবার নিজেকে ডুবিয়ে দিলে গৃহকর্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা ও যত্নের মাঝে।

শ্রীমন্তের এই ঐকান্তিকতাকে কিন্তু ভুল বুঝলে নিমাই। বাড়ীর লোকের কাছে খবর পাওয়া গেল যে—বিন্দু অসুখে পড়া পর্য্যন্ত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শ্রীমন্ত নিজেকে ভুলে একনিষ্ঠ ভাবে মনিবের সেবা করে আসছে। বাড়ীর পরিজনেরা শতমুখে করলে তার প্রশংসা। বললে, হ্যাঁ—লোকটা গুনের কদর জানে। শ্রীমন্তর শুশ্রূষায় খুসী হ'য়ে মাড়োয়ারী বাবু তার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

নিমাই সারা-দেহ এবং মনে শত বৃশ্চিক জ্বালা অনুভব করলে। নিশ্চয় শ্রীমন্তর সঙ্গে বিন্দুর দৈহিক যোগাযোগ হয়েছে নইলে মনিবের জন্যে এতখানি দরদ তার কোথা থেকে এলো! যে মানুষ তার ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করতে পারে সে যে তার রাঁধুণী বামুনের সঙ্গে প্রেম করবে এ আর বিচিত্র কি? উঃ, মেয়েছেলে জাতটা কি শয়তান!

শ্রীমন্ত! শ্রীমন্তই হচ্ছে সমস্ত অনিষ্টের মূল। ওকে এখান থেকে সরাতেই হবে।

বিন্দুকে একান্তে পেয়ে নিমাই জানালে তার মনোভিলাষ, শ্রীমন্তকে জবাব দেবার জন্য সে জেদ ধরে বসলো।

বিন্দু বললে, কি বলছো তুমি! প্রাণ দিয়ে সেবা করে যে আমায় বাঁচিয়ে তুললে তার দেবো জবাব!

—আলবৎ দেবে। ওকে জবাব তোমায় দিতেই হবে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে নিমাই।

—কি দোষে জবাব দেবো?

—ওসব আমি শুনতে চাই না। তুমি ওকে জবাব দেবে কিনা আমি তাই শুনতে চাই।

—এমন তেরিয়া হয়ে গরম গরম কথা বলছো কেন? তার কি দোষ—সেটা তো আমাকে বুঝতে হবে। সত্যি সে যদি দোষী হয় তবে তাকে নিশ্চয় জবাব দেবো, একশোবার জবাব দেবো।

বিশ্রী মুখভঙ্গী ক'রে নিমাই বললে, ন্যাকামি কচ্ছো কেন বিন্দু, তার কি দোষ তা কি তুমি জানো না!

—তার মানে?

—ভেবেছো আমি কিসসু বুঝি না? এত লোক থাকতে তোমার ওপর ওরই বা এত দরদ কেন উথলে ওঠে?

—শুধু শুধু তুমি রাগ করে মাথা গরম কচ্ছো। তোমার ভাবনা ভেবে ভেবে আমি কঠিন অসুখে পড়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি— ঐ বেচারী তোমার বিন্দুকে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। ওর মনে কোন পাপ নেই।

নিমাই দাঁতে দাঁত চেপে বললে, ওর মনে নাই থাক, পাপ আছে তোমার মনে—তাই তুমি ওকে জবাব দিতে চাইছো না।

—ছিঃ কি বলছো তুমি! ও যে আমার পেটের ছেলে! ঠিক নিজের মায়ের মত ও আমায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বিনা দোষে একটা লোককে জবাব দিলে ভগবান সইবে কেন!

—ও সব নটীপনা আমি ঢের দেখেছি! তুমি স্বীকার না করলেও

আমি তোমায়. বুঝে নিয়েছি ! ওকে তুমি জবাব দিতে পারবে না, প্রাণ থাকতে ওকে জবাব দেওয়া তোমার সাধ্যে কুলোবে না। এটাই হলো তোমার পরীক্ষা। রক্তচক্ষু কপালে তুলে বললে নিমাই।

—আমি একটা রাঁধুণী বামুনের সঙ্গে ভাব ভালবাসা করবো—এটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো ! উঃ কি বেইমান জাত তুমি !

—বেইমান আমি নয়—তুমি। নিজের বাবুর সঙ্গে বেইমানী ক'রে যে তার ড্রাইভারকে ভালবাসতে পাবে—সে যে তার রাঁধুণী বামুনেব সঙ্গে পিরীত করবে—এ আর এমন বিচিত্র কি।

নিমাইয়ের কথা যতই কঠোর হোক, যতই অপ্রিয় হোক—অমোঘ সত্য। নিমাইয়ের যুক্তি অস্বীকার করবার নয়।

—বিন্দু ঘাড় হেঁট করে গুম খেয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইলো। চোখ হুটো তার লজ্জা, ঘৃণা, আত্মগ্লানিতে টসটসে হ'য়ে উঠলো। সত্যিই সে বেইমানী কবেছে। কিন্তু সেও তো মানুষ। তারও আছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশা, আকাঙ্খা। শারীরিক প্রয়োজনেব চাহিদাকে এড়িয়ে যাবাব ক্ষমতা তার নেই, তার জন্মে দায়ী কি একাই বিন্দু। তবে হ্যাঁ, উপযুক্ত লোককে আত্মদান কবাই তার উচিত ছিল। কিন্তু প্রেম যে অন্ধ। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দবিদ্র, কানা, খোঁড়া—কোন কিছুর দোহাই সে মানে না। তাব কাছে সব সমান। অন্ধের চাই অবলম্বন, বাচ বিচারের ধার সে ধাবে না !

দোষ নিমাইয়ের নয়, দোষ বিন্দুর নয়, দোষ তাব অদৃষ্টেব। নইলে প্রাণঢালা ভালবাসার বিনিময়ে নিমাই তাকে এমন ভুল বোঝে ! মূর্খ !

কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে সে এখন নিমাইয়ের হাতে খেলার পুতুলের চেয়েও অসহায়। ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে নিমাই সব কিছু ফাঁস ক'রে দিয়ে তার অন্নে ধূলো দিতে পারে। ওব কি, এখানের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জায়গায় কাজ নেবে। কিন্তু বিন্দু—

ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে বিন্দু বললে, দোহাই তোমার নিমাই।

তুমি আমায় ভুল বুঝে অন্যায় অনুরোধ করো না, তোমার কথা আমি রাখতে পারবো না।

—ও—শ্রীমন্তকে জবাব দিতে বুকে বড় ব্যথা বাজছে—নয়! তোর বেইমান জাতের বাপের মাথায় মারি জুতোর বারি।

—খবরদার নিমাই। আস্‌কারা পেয়ে তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। আমি নিজে খাল কেটে কুমীর এনেছি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তুমি আমাকে যা খুসী ব'লে গায়ের ঝাল মেটাতে পারো কিন্তু আমার বাপ মাকে এর মধ্যে টেনে আনছো কেন? তুমি যদি মানুষ হতে তাহলে অন্যের বাপ মা তুলে কথা বলবার আগে নিজের দিকটা একবার ভেবে দেখতে। জেনে রাখো—আমি এমন কোন অন্যায় কাজ করিনি যার জন্যে ভয়ে পড়ে শ্রীমন্তকে আমি জবাব দেবো। আমার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

অর্থহীন বিশ্রী হাসি হাসলে নিমাই। বললে তাচ্ছিল্য ভরে, শ্রীমন্তকে তুমি যে ছাড়তে পারো না তা আমি জানি। সেটাই শুধু আমি চেয়েছিলাম আমার বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে।

ক্ষণেক নীরবতার পর বিন্দু বললে, তুমি যা-ই কিছু বল না কেন—সবই আমি মাথা পেতে নেবো, কারণ তোমার কাছে আমার হাত, পা, মন সব কিছুই বাঁধা। তুমি কতখানি মরেছো তা তুমিই জানো, তবে আমি মরেছি একেবারে। নিজের হাতে করেছি নিজের সর্বনাশ।

উপহাসের অট্টহাসি হাসলে নিমাই। বললে, হুঁ—মরেছো যে কতখানি তা তোমার কাজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

—ছাখো, যে কথা বলেছি—তার পর শ্রীমন্তর সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত-পূর্ণ কথা তোমার মুখ থেকে না শোনবার আশাই করি। শ্রীমন্ত আমার ছেলে, আমি তার মা। তবে আমি তোমায় শেষবার বলে দিচ্ছি—ভালবাসার দোহাই দিয়ে আমি কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবো না।

নিমাইয়ের সন্দেহ কিন্তু ঘুচলো না। ঘোচা দূরে থাক—শ্রীমন্তকে না তাড়াবার জন্যে তার সন্দেহ দিনের দিন ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। শ্রীমন্তকে চোখের সামনে দেখলে সে একেবারে অন্তরে অন্তরে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো।

বিন্দু আর শ্রীমন্তর একই বাড়ীতে অবস্থান এবং শ্রীমন্তর হাতে বিন্দুর সেবা যত্নের ভার কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলে না নিমাই। সে মরিয়া হ'য়ে উঠলো।

যে যাকে যত বেশী ভালবাসে—সেই হয় তার সব চেয়ে বড় শত্রু। বিন্দুর ওপর প্রতিশোধ নেবে নিমাই। প্রাণে সে তাকে মারবে না, সে সাহস তার নেই। খুন যে করে সে মানুষ, কিন্তু খুন না করে মানুষকে যে পাগল ক'রে দেয় সে শয়তান। নিমাই মদের সঙ্গে কি যেন খাইয়ে বিন্দুকে উন্মাদ ক'রে দিলে।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—কেউ কিছুই বুঝলে না, বিন্দু হলো বদ্ধ উন্মাদ।

শয়তানের হাসি হাসলে নিমাই। মুখে বললে, আহা!

মাড়োয়ারী বাবু তাকে সুস্থ করতে জলের মত অর্থ ব্যয় করলে। এলো বড় বড় ডাক্তার। পাঠানো হলো চেঞ্জে। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর গেল মাস, বছর এলো ঘুরে। কিছুতেই কিছু হলো না, যে পাগলকে সেই পাগলই রয়ে গেল বিন্দু।

মনে মনে নিমাই হাসলে শুধু শয়তানি হাসি।

মাড়োয়ারী বাবু বেঁচে থাকলে কি হতো বলা যায় না। ভদ্রলোক হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। বিন্দু পথে বসলো। পথে বসাই বলতে হবে। নিমাই বিন্দুর বাড়ীখানা নিজের নামে লিখিয়ে নিলে বিন্দুকে দিয়ে। সই করার তারিখটা দিলে আগের দিনের, বিন্দুর ছিল যখন সুস্থ মস্তিষ্ক।

ভোজপুরী দ্বারোয়ান মাইনে না পেয়ে কাজে জবাব দিয়ে চলে গেল। শ্রীমন্ত শেষ পর্য্যন্ত টিকে ছিল। নিমাই তাকে একদিন চুরির

বদনাম দিয়ে মেরে তাড়ালে। বাড়ীর ঝি, চাকরকে জবাব দিয়ে নিমাই বিন্দুকে নিয়ে বাইরে গেল চেঞ্জে। কিছুদিন পরে নিমাই একা ফিরে এলো। বিন্দুর বাড়ীর নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ওপরে সে গ্যাঁট হয়ে বসলো।

নিমাই প্রচার করে দিলে যে বিন্দু বিদেশে গিয়ে কোথায় যে চলে গেল তার কোন ঠিক ঠিকানা হাজার সন্ধান ক'রেও পাওয়া গেল না। বিন্দু নিরুদ্দেশ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোন ফল হলো না। মনে হয়—সে আর বেঁচে নেই।

সত্যি—বিন্দুর আর কোন পাত্তাই নেই। দিন যায়—মাস যায়—বছর যায়—, পাড়ার লোক ভুলে গেল বিন্দুকে। বিন্দুর বাড়ী এখন নিমাইয়েরই বাড়ী। বাড়ীর ফটকে নিমাইয়ের নামাঙ্কিত শ্বেত-পাথর বসানো। বিন্দুর সেই মাড়োয়ারী বাবুর দেওয়া গাড়ীখানা চড়ে নিমাই এখন হাওয়া খেতে বেরোয়।

নিমাই এবার বিয়ে করলে। বিন্দুর টাকায় সে খুললে এক মোটর সারাইয়ের কারখানা। সে শুধু ড্রাইভার নয়, একজন সুদক্ষ মেকানিক।

বিন্দুর স্মৃতি-সমাধির ওপর উঠলো নিমাইয়ের বাসর ঘর। নব বধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেল বিন্দুর শেষ স্মৃতি।

বছর খানেক পরে বিন্দু ফিরে এলো।

বিন্দুকে আর চিনবার উপায় নেই। আসল বিন্দু যেন সত্যিই মরে গেছে, এ তার প্রেতাত্মা!

চিনে চিনে ঠিক সে নিজের বাড়ীতে এসে উঠলো। বাড়ীতে ঢুকেই বিন্দু মনিবানা চালে চেঁচামেচি সুরু করে দিলে ঠিক আগের দিনেরই মত।

—ওরে ও হরিয়া! হরিয়া! যশোদাকেও দেখতে পাচ্ছি না! আ-মর, সব গেল কোন চুলোয়! ভোজপুরী ছাতুখোরটাকেও দেখছি না। "বামুন গেল ঘর তো সব লাঙোল তুলে ধর।" মনিব

যে কদ্দিন পরে বাড়ী ফিরলো—সে দিকে কারুর লক্ষ্য নেই। তাড়াবো—সব একধার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদি করবো।

বিন্দুর চীৎকারে ছুটে এলো নিমাইয়ের বউ ; ছুটে এলো তাদের চাকর-বাকর।

নিমাইয়ের বউ বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললে, তুমি কে বাছা ? বলা নেই—কওয়া নেই ওপরে উঠে এমন বিশ্রীভাবে চীৎকার কচ্ছো কেন ? কাকে চাই তোমার ?

—তুমি কে শুনি? আমার বাড়ীতে তোমরা সব কোথা থেকে এলে?

—তোমার বাড়ী !

অপূর্ব মুখভঙ্গি করে বিন্দু বললে, ব'লে—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। কোথা থেকে সব উড়ে এসে জুড়ে বসে—আমায় বলে কিনা 'তোমার বাড়ী' ! এ্যাই দ্বারোয়ান, এ্যাই হরিয়া। দেতো সব ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বার করে।

—বাড়ীর কর্তা ফিরুক। বোঝা পড়া তার সঙ্গে করো। এখন তুমি যাও, বাছা। শুধু শুধু গণ্ডগোল করো না। বললে নিমাইয়ের বউ।

বিন্দু সে কথায় কান করলে না। সে এ ঘর ও ঘর সে ঘর যেন চষে ফেলতে লাগলো এবং তার জিনিষ পত্তর তছনছ করার জন্য চীৎকার করে, গালাগাল দিয়ে বাড়ী মাথায় করলে।

বিন্দুর সেই মারমুখী মূর্তির সামনে চাকর-বাকররা এগুতে সাহস করলে না। নিমাইয়ের বউ নিমাইকে সংক্ষেপে সব কথা জানিয়ে দিলে টেলিফোনে।

নিমাই নিজে এলো না। আসবার সাহস হলো না। স্ত্রী এবং বাড়ীর চাকর-বাকরদের সামনে সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে বিন্দুর সামনে এসে নিমাই দাঁড়ালো না। বিন্দুকে বাড়ী থেকে পথে বার করে দেবার জন্য সে তার কারখানা থেকে জন কয়েক ষণ্ডামার্কা লোক পাঠিয়ে দিলে।

নিমাই বুদ্ধিমান। পৈশাচিক কাজের পিছনে থেকে বুদ্ধিমান লোক কার্য্য উদ্ধার ক'রে থাকে। চক্ষু লজ্জার হাত এড়িয়ে পিছনে থেকে কাজ যত সহজে সম্পন্ন হয়, এমনটি আর কিছুতে হয় না।

কার্য্যতঃ হলোও তাই। নিমাইয়ের প্রেরিত লোকরা এসে আগে ভাল কথায় বিন্দুকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বললে কিন্তু ফল না হওয়ায় তারা ঘাড় ধরে বিন্দুকে বাড়ী থেকে রাস্তায় বার করে দিলে। নিমাইয়ের নির্দ্দেশে ফটকে বসলো কড়া পাহারা—যাতে ভবিষ্যতে বিন্দু আর কোনদিন ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে।

পথে বেরিয়ে বিন্দু রাস্তার লোককে সাক্ষী মানলে। সাক্ষী মানলে ভগবানকে—ফল কিছুই হলো না।

অভিশম্পাত দিতে দিতে সে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হলো। পাগলীর পাগলামো দেখতে তার চারপাশে জড় হলো পথচারী জনতা। কেউ হাসলে, কেউ টিটকারী দিলে, আবার কেউ বা 'আহা' ব'লে চলে গেল নিজের কাজে। দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে অর্দ্ধ-উলঙ্গনী নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে যাদের লজ্জা এবং রুচিতে বাধে না—তারাই শুধু দাঁড়িয়ে রইলো তার চারপাশে ভিড় করে।

পাগলী বিন্দু কাঁদে—পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—পথের ভাত কুড়িয়ে খায়।

ঘটনা যখন ঘটে তখন নাটকীয় ভাবেই ঘটে। একদিন দ্বিপ্রহরে ডাষ্টবিন থেকে কি যেন খাবার কুড়িয়ে বিন্দু খাচ্ছিল। কয়েকটা রাস্তার কুকুর এসে সেই খাবারে ভাগ বসালে। বিন্দু অশ্রাব্য ভাষায় কুকুর গোষ্ঠীর পিতৃ-মাতৃ কুলের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ সুরু করলে।

সে দৃশ্য চোখে পড়লো পথচলতে শ্রীমন্তর। সে কাঠের মত পলকবিহীন নেত্রে দাঁড়িয়ে গেল, চোখ ফেটে তার জল এলো।

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখার মত ধৈর্য্য তার ছিল না, সে এগিয়ে গিয়ে ডাকলে, মা—।

বিন্দু আস্ত-ব্যস্ত পরণের একটা ছিন্ন খুঁট মাথায় ঢাকা দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, কি ঘেন্নার কথা মা ! একটা আধবুড়ো মিনসে আমায় বলে কিনা, মা !

—আমায় চিনতে পাচ্ছো না মা, আমি তোমাব শ্রীমন্ত ! তোমার ছেলে !

অনেক অবান্তর কথা কাটাকাটির পর বিন্দু শ্রীমন্তকে চিনতে পারলে। অনেক সাধ্য-সাধনা করে শ্রীমন্ত তাকে নিয়ে গেল নিজের বাসায়—ভাঙা বস্তির একটি ভাঙা ঘরে।

মাস কয়েক শ্রীমন্তর আশ্রয়ে বিন্দু রইলো। তারপর হঠাৎ একদিন শ্রীমন্তর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে খেয়ালেব বশে বিন্দু পথে বেরিয়ে পড়লো।

শেষ পর্য্যন্ত ববাতেব ফেবে তার স্থান হলো এই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে। এখন সে লোকেব বাড়ী বাসন মাজে, বাজার করে, ঘব মোছে, বাবুরা এলে বিবিদের হুকুমে পানেব দোকান থেকে সোডা কিনে আনে, আনে রেঁস্তোরা থেকে চপ্, কাটলেট, কারি মাথা একটু ভালো থাকলে মদেব দোকানে গিয়ে মদও কিনে এনে দেয়। দিল খুস থাকলে—বাবুদের মজলিসের অনতিদূরে বসে গান শোনায়, প্যালা না দিলে আদিবসমিশ্রিত অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিতেও কসুর করে না। যার-তার বাড়ীর রকে সে পড়ে থাকে। রোদ, বৃষ্টি যায় তার মাথার ওপব দিয়ে, সেদিকে নেই তার ভ্রূক্ষেপ। বিন্দু পাগলীকে সবাই ভয় কবে আবার ভালও বাসে। ক্ষেপলে সে কারুর বাপের খাতির করে না আবার মাথা ঠাণ্ডা থাকলে নেড়ী কুত্তারও অধম।

বেড়ালের মায়া তার অস্থিমজ্জাগত। রাস্তার বেড়াল ধরে ধবে সে দড়ি দিয়ে লোকের বাড়ীর রেলিঙএর গায়ে বেঁধে রাখে, নিজে

না খেয়ে তাদের খাওয়ায়, শীতের রাতে নিজে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বেড়াল ছানাগুলোকে কোলের কাছে নিয়ে তাদের গরমে রাখতে চেষ্টা পায়।

মাঝে মাঝে আজও তার সাজবার সাধ হয়। ছিন্ন, জীর্ণ, ময়লা শাড়ীখানা সে ফেরতা দিয়ে পরে। ভাঙা চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধে। রাস্তায় ফেলে দেওয়া গতরাতের বাসি মালা কুড়িয়ে নিয়ে খোঁপায় জড়ায়। কারো কাছ থেকে একটু পাউডার হাতের তেলোয় চেয়ে নিয়ে বিড়ির দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার ঘসে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কিলো বিন্দু, আজ তোর এত সাজের বহর কেন?

বিন্দু ঠমকে ঠমকে চলতে চলতে উত্তর দেয়, কেন আবার' আজ যে আমার ভালবাসার বাবু আসবে—তাও বুঝি সব জানো না! বড় ভাল মাংস রান্না করে আমাদের শ্রীমন্ত। সে-ই গেছে বাজারে কচি পাঁঠার মাংস কিনতে।

বিন্দুর কথা এমনই দরদভরা যে—কে বলবে সে পাগল! কে বলবে যে—সে যা বলছে তার বিন্দু বিসর্গও সত্য নয়।

গভীর রাতে মাঝে মাঝে বিন্দুকে গাইতে শোনা যায় দরদ মিশ্রিত কণ্ঠে তার একখানি প্রিয় গান:—

"কে আবার বাজায় বাঁশী
এ ভাঙা কুঞ্জবনে।
হৃদি মোর উঠলো কাঁপি
চরণের সেই রণনে॥
কোহেলা ডাকলো আবার—
যমুনায় লাগলো জোয়াব,
কে তুমি আনিলে জল
হরিণ দুই নয়নে।"

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী হিসাবে শ্রীমতী চঞ্চলার নাম সারা বাংলা দেশে কে না জানে! শুধু বাংলা দেশ কেন, ভারত জোড়া নাম তার। খবরের কাগজে তার নাম ছাপা হয়, ছবি ছাপা হয়, বড় বড় হরফে তার নাচের তালিকা বের হয়।

পুরুষালী ধরনের চেহারা। সুশ্রী না হলেও কুশ্রী বলা চলে না, লালিত্যের ছাপ এবং ছায়া তার সারা অঙ্গে, তবে সেটাও কিঞ্চিত পুরুষালী। হোক পুরুষালী—ওতেই ওকে মানিয়েছে ভাল। সব চেয়ে দেখার জিনিষ ওর চুল।

অমন দোহারা চেহারা চঞ্চলার সেবার হরিদ্বারে বায়ু পরিবর্তনে গিয়ে একেবারেই বদলে গেছে। মাংসপেশীর ওপর চেপেছে অপর্য্যাপ্ত মেদ। নাচা তো দূরের কথা—মোটা হওয়ার ফলে এখন চলতে পর্য্যন্ত তার কষ্ট হয়।

লোকে বলে, অত্যধিক মোটা হওয়ার জন্যেই তার ভাটিয়া বাবুটি তাকে ছেড়ে গেল;

মোটা হওয়ার জন্য বাবুটি তার হাত ছাড়া হলো কি অন্য কোন বিশেষ কারণে গেল তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, তবে মোটা হওয়ার জন্য নাচের আদর এবং কদর তার একেবারে চলে গেল। চলতে যার কষ্ট হয়--সে আবার নৃত্য করবে কেমন করে। না:, মোটা হওয়া সত্যিই তার কাল হলো।

নগদ টাকা, গহনা, আসবাব পত্র সমেত প্রায় পঞ্চাশ, ষাট হাজার টাকার মালিক চঞ্চলা। তবে বসে খেলে রাজার রাজত্ব চলে যায় আর এতো মোটে পঞ্চাশ হাজার! চঞ্চলা এখন নিজে না নেচে অন্যকে নাচায় অর্থাৎ নাচ শেখায়। এক নাচের স্কুলের সে হচ্ছে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। শুধু শিক্ষয়িত্রী নয়—স্কুলের সে একজন অংশীদারও বটে।

স্কুলের আয় থেকেই তার সংসারের খরচ খরচা সব চলে যায়; জমার খাতায় হাত পড়ে না। বেশী লোকজন তার নেই, একটি

ঝি আর একটি চাকর। ঝি করে ঘরের কাজ, চাকর করে রান্না আর বাইরের কাজ। রাঁধুণীর বালাই তার নেই।

বর্তমানে বাবুরা যে তার দ্বারস্থ না হয় এমন নয়, তবে সে ছটাক বাটখারা বাবুদের পাত্তা দেয় না। বেশী পয়সার লোভে এক আধদিনের জন্য সে বাবুদের ঘরে স্থান দেয় না।

ভগবান জানে—লোকে তার নামে বিশ্রী রকমের নক্কারজনক একটা বদনাম রটিয়ে আসছে। বেটাছেলের চেয়ে সে নাকি মেয়েছেলেই বেশী পছন্দ করে; মেয়েছেলের সঙ্গই তার প্রিয়। তবে যে কোন মেয়েছেলে নয়, অল্পবয়সী এবং সুশ্রী মেয়েরাই তার কাম্য। এ রোগ নাকি তার বহুদিনের, 'যৌবন-কৈশোর দুঁহু মেলি গেল' অবস্থা থেকেই এই সম-জাত প্রেম প্রবৃত্তি তার অন্তরে বাসা বেঁধেছে। নাচের পার্টির বহু মেয়েই নাকি তার প্রেমিকার আসন দখল করে ধন্য হ'য়েছে। ধন্য ঠিক হোক বা নাই হোক, নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

এক জায়গায় সে বহুদিন স্থায়িত্ব অর্জ্জন করতে পারেনি এবং তার মূলেও ঐ প্রেমিকা! প্রায় প্রতি জায়গাতেই ভালবাসা নিয়ে মেয়েছেলে হয়ে মেয়েছেলের সঙ্গে বাধে তার ঝগড়া, মারামারি কাটা-কাটি করে হয় কাটান-ছিড়েন। পরিণতি—বাসা পালটানো।

এই প্রবৃত্তির সন্ধান যারা রাখে তারা পারত পক্ষে তাকে ঘর ভাড়া দিতে চায় না। সুনামের সঙ্গে বদনামটাও তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

মাস কয়েক হলো চঞ্চলা এই বাড়িতে উঠে এসেছে। মিশুকে এবং দিলখোলা মানুষ হিসাবে এ বাড়ীর সবার সঙ্গেই তার সমান অন্তরঙ্গতা। তবে সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেখা গেল লীলার সঙ্গে। লীলার ভার স্বেচ্ছায় সে কাঁধে তুলে নিলে লীলার মা হাঁপ ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

চঞ্চলা যে মানবী নয়—দেবী, সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা—এই কথাটাই

প্রকারান্তরে লীলার মা সারা পাড়ায় সকাল, দুপুর সন্ধ্যা—প্রচার করে ফিরতে লাগলো।

লীলার ফ্ল্যাটের ভাড়া বাকি পড়েছিল মাস কয়েকের। চঞ্চলা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তার বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দিলে। চঞ্চলার কথায় লীলা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে চঞ্চলার ফ্ল্যাটের একখানা ঘরে গিয়ে উঠলো। এখানে ভাড়া তার লাগবে না, সে আশ্বাস চঞ্চলা তাকে দিয়েছে।

আপাততঃ চঞ্চলার ওখানেই লীলা আর তার মায়ের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হলো। এর জন্য তাদেব কিছুই দিতে হবে না। লীলার মা হাতে পেলে আকাশের চাঁদ।

ভাল ডাক্তার এনে লীলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে চঞ্চলা। বড় ডাক্তা: ..োটা ফি—দামী তার প্রেসক্রিপসন। প্রেসক্রিপসমের ওষুধ শুধু দামী নয়, দুর্লভ—দুষ্প্রাপ্য। টাকায় কি না হয়; বিলাত ফেবৎ ডাক্তার জার্মান থেকে ওষুধ আনিয়ে দিলে লীলার জন্য।

চঞ্চলা যে ঘরখানা লীলাকে দিয়েছিল সে ঘরে পাখা ছিল না। পাখা ছাড়া লীলা গ্রীষ্মকালে থাকতে পারে না, অভ্যাস বড় বালাই। লীলার শোবার ব্যবস্থা হলো চঞ্চলারই ঘরে। শুধু ঘরে নয়—তাবই খাটে। অসুস্থ মানুষেব সঙ্গে একই বিছানায় শুতে তার প্রবৃত্তিতে এতদিন বাধতো কিন্তু আজ তার ঘটলো ব্যতিক্রম।

লীলার মা পঞ্চমুখে প্রচার করলে, লীলা গত জন্মে চঞ্চলার মায়ের পেটের বোন ছিল। নইলে—পরের জন্য পরকে এতটা করতে কেউ কোনদিন শুনেছে।

বাড়ীর লোক বললে, যার কেউ নেই তাব ভগবান আছে!

পাড়াব লোক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে, এমন তো কখনো শুনিনি?

বাড়ীওলা মহাদেব শুধু মনে মনে একটু হাসলে—অর্থপূর্ণ হাসি।

দিন যায়।

লীলা খায়, দায়, হেসে খেলে বেড়ায়। কিন্তু মনটা কেমন যেন তার ঈষৎ ভার ভার! তার মনের দুয়ারে কোথায়, কি ভাবে, কিসের যেন একটা ঘা লেগেছে। থাকে থাকে—মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, মর্মান্তিক কোন কিছু একটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রাণটা তার আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। কিন্তু হাত, পা, মন যে দুয়ারে বাঁধা—সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া কি মুখের কথা! অব্যাহতি পাবার সমস্ত আশা মন থেকে মুছে ফেলে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আত্মদান করাই বুদ্ধিমতির কাজ।

একদিন গভীর রাতে স্পষ্টই বললে লীলা, চঞ্চলাদি! কিছু যদি মনে না করো তো একটা কথা তোমায় বলি।

চঞ্চলা জিজ্ঞাসু নেত্রে ওর মুখের দিকে চাইলে।

—তুমি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছো, এ কথা জীবনে আমি ভুলবো না।

—হুঁ—তারপর?

লীলা নীরব।

—কি—আসল বক্তব্য তো বললি না?

কিন্তু হয়ে লীলা বললে, বলছিলাম কি—এ ভাবে, মানে—এই একই খাটে দুজনে একসঙ্গে শুলে আমার অসুখ শাগগীব সাববে না, চঞ্চলাদি?

ক্ষণেক গুম খেয়ে থেকে চঞ্চলা বললে শুষ্ক কণ্ঠে, হুঁ—বুঝেছি! সত্যি তুই যদি আমায় ভালবাসতিস তাহলে এ কথা বলতে মুখে তোর বাধতো। আমিই তোর জন্যে মরেছি, তুই তো আর আমার জন্য মরিসনি। বেশ, কাল থেকে আমি নীচে শোব, তুই খাটের ওপর শুস্!

—ও মা, তা বুঝি আবার হয়!

—বেশ, তাও যদি না হয় তাহলে আমিই বরং তোর ঘবে গিয়ে শোব—তুই যেমন খাটে শুস—খাটেই শুবি।

—আমি কি তোমায় তাই বললাম! তুমি আমায় ভুল বুঝো না চঞ্চলাদি!

করুণ কণ্ঠে চঞ্চলা বললে, আমার ওপর তোর যে কতখানি দরদ তা আজ বোঝা গেল! লোকে কথায় বলে, যতই করি শিব সাধনা —কলঙ্কিণী নাম ঘোচে না।

দুঃখভরা কণ্ঠে লীলা বললে, তুমি কি চাও চঞ্চলাদি, আমি চিরদিন পঙ্গু হয়ে তোমার কাঁধে ভর ক'রে থাকবো? এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে কি মরণ ভাল নয়?

—ষাট্ ষাট্ বলাই! ও সব কি অলুক্ষুণে কথা বলছিস্? আমি এত পয়সা জলের মত খরচ কাচ্ছি কি তোকে চিরদিন পঙ্গু ক'রে রাখার জন্যে! আমার বরাতটাই খারাপ তাই তুইও আমাকে এ ভাবে অপমান করতে পারলি। জানিস—তুই যদি আজ মরিস তবে কাল লোকে চঞ্চলাকে পাখার সঙ্গে গালায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখবে। বলতে বলতে চঞ্চলার স্বরটা ধ'রে এলো :

—তুমি কি বলতে চাও, চঞ্চলাদি?

—আমি চাই—তুই ভালভাবে সেরে ওঠ।

—তারপর?

—সেরে উঠে খা-দা, থাক্। জামা বল্—কাপড় বল্—গয়না বল্—যখন যা দরকার সব আমার কাছে নে, এছাড়া যত টাকা লাগে তোর হাত-খরচা—তাও আমি দেবো।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে লীলা বললে, চিরদিন আমার এই ভাবে কাটবে?

—নিশ্চয় কাটবে।

—বাবু-টাবু?

—না। কোন ব্যাটাকে আমি সহ্য করবো না। বাবু তুই ঘরে আনতে পাবি না—বাবু ঘরে আনতে আমি দেবো না।

দুঃখের হাসি হেসে বললে লীলা, তুমি কি তাহলে আমায় বাঁধা রাখতে চাও?

আধ শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলো চঞ্চলা। একটা তাকিয়া কোলের ওপর টেনে নিয়ে পুরুষোত্তি গদিয়ানী চালে বসে বললে, তুই কি মনে ভাবিস, আমি পারি না তোকে বাঁধা রাখতে! তোর খাওয়া, পরা, থাকা ছাড়া বল তুই কত টাকা মাসে চাস্?

হিঃ হিঃ করে হেসে ফেললে লীলা। বললে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে চঞ্চলাদি!

—আমার যা কিছু আছে—ভবিষ্যতে সে সবেরও মালিক তুই।

চঞ্চলার কথা শুনে লীলার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার যোগাড়।

—হাসছিস্ যে বড়! আমার কথা তোর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না! আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো চঞ্চলা।

এতক্ষণ এদের কথা বার্তা, তর্ক বিতর্ক অন্ধকারেই হচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে চঞ্চলা বেড্ সুইচটা জ্বেলে দিলে।

সদ্য বিবাহিতার লাজ-নম্র কণ্ঠে লীলা গায়ের ও পরণের কাপড় ঠিক করে নিতে নিতে বললে, আঃ কি যে কর, চঞ্চলাদি! তুমি যে পুরুষকেও হার মানালে বাপু!

লীলার দিকে বঙ্কিম নয়নে চেয়ে চঞ্চলা মন্দ-মধুর হাসতে লাগলো।

—বাঃ রে লজ্জা করে না বুঝি!

—আমার কাছে এখনো তোর লজ্জা! ব'লে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলে চঞ্চলা।

—আচ্ছা—লোকে যদি শোনে তাহলে তোমাকে আমাকে কি বলবে বলতো? তোমার আমার সম্বন্ধ জানতে পাবলে গায়ে যে থুতু দেবে!

মুখ মুচকে চঞ্চলা বালিসের ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে বললে, হুঁ—থুতু অমনি দিলেই হলো! কেন—মেয়েছেলেকে ভালবাসা কি মেয়েছেলের অপরাধ! আমার খুসী আমি তোকে

ভালবাসা কি মেয়েছেলের অপরাধ! আমার খুসী আমি তোকে ভালবাসবো—তোর খুসী তুই আমায় ভালবাসবি, এতে কে কি বলবে না বলবে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কি আছে!

—কাজটা কিন্তু ভাল নয়, চঞ্চলাদি!

—আমি যদি তোর জন্যে একবুক জলে নামতে পারি—তুই তাহলে কি আমার জন্যে এক হাঁটু জলে নামতে পারবি না! কেন, পুরুষের ভালবাসাই তোর কাছে সব আর আমার এই ভালবাসা কি কিছুই নয়! চঞ্চলা প্রায় কেঁদে ফেললে।

—আমি তাই বলেছি!

চঞ্চলা সরে এসে লীলার দুটো পা জড়িয়ে ধরে বললে, বল—তুই তাহলে আমাকে ভালবাসিস?

—সে কথা কি আর ব'লে বোঝাতে হবে! আচ্ছা পাগল তো তুমি। ছিঃ—পা ছেড়ে দাও।

—না, তোকে তিন সত্যি করতে হবে, নইলে তোর এই পায়ের ওপর আমি মাথা খুড়ে মরবো।

—হ্যাগো—হ্যাঁ, বাসি—বাসি! হল তো—এবার পা ছাড়ো! বলে লীলা একরকম জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে চঞ্চলার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে।

চঞ্চলা আনন্দের আতিশয্যে লীলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বনে তার মুখ, বুক, মাথা ভরিয়ে দিলে।

মাস কয়েক কেটে গেল। লীলার সুস্থতার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চঞ্চলার আদর আপ্যায়ন, শুশ্রূষার নেই ত্রুটি, কিন্তু বরাত বড় বালাই।

ডাক্তারের পরামর্শে লীলাকে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলে চঞ্চলা। যথাসম্ভব সত্বর গোছ-গাছ করে নিয়ে সদলে চঞ্চলা লীলাকে নিয়ে পুরী এসে হাজির হলো।

বিকাল হতে না হতেই উঠলো কালবৈশাখীর ঝড়। বিশ্বের অন্ধকার নেমে এলো ধরণীর বুকে। প্রথমে এলো ধূলো, কাঁকরের প্রবল বন্যা—, সে বন্যা প্রশমিত হতে না হতেই উঠলো ঝড়—সঙ্গে সঙ্গে এলো মূষল ধারে বৃষ্টি। আকাশে সুরু হলো মেঘের গর্জ্জন, বিদ্যুৎ চমকিত হয়ে রূপালী আলোয় পলকের জন্য ভরিয়ে দিলে মাটির পৃথিবী।

দরজা, জানালা, সার্সি বন্ধ ক'রে কতক্ষণ আর জুজুবুড়ী হয়ে ঘরের কোণে একা একা আটক থাকা যায়। টাইমের বাবুই হোন আর বাঁধা বাবুই হোন—এই কালবৈশাখী মাথায় করে কে এই অসময়ে এসে মেয়েমানুষের ঘরে হানা দেবে বল!

বড় একঘেয়ে লাগলো আশার। সে নিজের ফ্ল্যাটে যেন ছুট ফটিয়ে মরতে লাগলো। ভাবলে—খানিকটা মদ খাই। কিন্তু একা একা কি কখনো মদ খেতে ভাল লাগে! বাড়ীর বান্ধবীদের ডেকে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে মদ খাইয়ে কাপ্তেনী করার মত প্রকৃতি তার নেই, কোনদিন হয়-ও না। কৃপণ হিসাবে বদনাম না থাকলেও—হাতদরাজ হিসাবে সুনামও তার নেই। তা ছাড়া নিজের কড়ি খরচ করে মদ সে খুব কম দিনই খেয়েছে, এত কম দিন যে তা আঙ্গুলে গোণা যায়। মদ খায় বাবুদের পয়সায় আর নয় বন্ধুদের পয়সায়। নিজের পয়সায় মদ খাওয়া মানেই গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা।

—বাপ্‌রে বাপ্‌—এ কি ঝড়! ও মা তুই আজ স্টুডিওতে যাবি না! আজ না তোর নাইট-সুটিং ছিল? বললে এসে নন্দ।

—হ্যাঁ—ছিল, কিন্তু হলো না। ঝড়ো হাওয়া আসছে, ভিতরে আয়। বললে আশা।

—তোর তাহলে আজ ছুটি। বলতে বলতে নন্দ এসে তার সোফাটার ওপর কাৎ হয়ে পড়লো।

—হ্যাঁ ভাই। পর পর ক'দিন নাইট-সুটিং করে শরীরটা বড় বিশ্রী লাগছে।

—তা তো হবেই ভাই। এক রাত জাগলে তিন রাত যায় টাল সামলাতে। তা হঠাৎ স্যুটিং বন্ধ হলো কেন?

মৃদু হাসি হেসে আশা বললে, হরি যা করেন মঙ্গলের জন্য। অত্যধিক মদ্য পানের ফলে হিরো এখন শয্যা নিয়েছেন। জীবন মরণ সমস্যা! মুখ দিয়ে নাকি মাঝে মাঝে রক্ত উঠছে।

—বাস্তবিক—ভগবানের এ যেন একটা অভিশাপ! ছবির জগতে নামকরা একটা কেষ্টো-বিষ্টু হলেই আর রক্ষা নেই, মদে তাকে ডুবে থাকতেই হবে। অত বেশী মাতাল অথচ ছবিতে যেন একটি গো-বেচারী নিরীহ ভদ্রলোক, কে বলবে যে ইনি দিনরাত মদে ডুবে আছেন। যে কোন ছবিই দেখতে যাই না কেন—প্রত্যেকখানাতেই নীহারবাবু। নীহারবাবু না থাকলে ছবির নাকি টিকিটই বিক্রী হয় না।

—অভিনেতা হিসাবে নীহারবাবু চিত্রজগতে নতুন কিছু দিয়েছেন। সেই গতানুগতিক থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়—এক-ঘেয়েমির হাত থেকে দর্শকদের দিয়েছেন রেহাই, এদিক দিয়ে তাঁর কাছে বাংলার দর্শকসমাজ ঋণী।

-নীহারবাব এখন ক'খানা ছবিতে কাজ করছেন? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে নন্দ। অভিনেতা নীহারবাবুর সে একজন ভক্ত।

—তা প্রায় শতকরা নিরানব্বুই খানাতেই নীহারবাবু আছেন। বুঝতে পাচ্ছিস না—এক এক সময় এক এক জনের পড়তা আসে, যাকে বলে সুসময়—মানে পাথরে পাঁচ কিল। এখন পড়েছে নীহারবাবুর যুগ। কি প্রযোজক—কি পরিচালক—সবাই চায় নীহারবাবুকে, নীহারবাবু নইলে বক্স অফিসে মাছি ভ্যান ভ্যান করবে—ধুনো দেওয়াই হবে সার। বললে আশা ঈষৎ ঈর্ষান্বিত কণ্ঠে।

—বছর খানেক আগে একটা যুগ এসেছিল সন্দেশ বিক্রেতা কেষ্টো ঘোষ, জামা কাপড় বিক্রেতা করিমুদ্দিন মোল্লা আর হাস্য-রসিক অভিনেতা হীরে গাঙ্গুলীর।

নন্দর বলার ধরনে আশা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

—কি বাবা, তোমাদের এত হাসি কিসের? বলতে বলতে টলতে টলতে ঘরে ঢুকলো মত্ত রাজু।

—ও মা, এই অবেলাতেই টেনেছিস? বললে আশা।

—মদের আবার বেলা অবেলা আছে নাকি বাবা! সাধে কি আর খেয়েছি বাবা—পিরীতের জ্বালায় খেয়েছি। ললিত আমার পিছনে বড্ড লেগেছে! ওর ওপর রাগ করে আজ ভাত না খেয়ে শুধু মদই খেয়েছি। পিরীতের বড় জ্বালারে—পিরীতের বড় জ্বালা। খবরদার—তোরা আর যা করিস করিস—কারো সঙ্গে যেন পিরীত করে বসিসনি। তাহলে আমার মত বোতল বোতল মদ খেয়েও বুকের জ্বালা জুড়োতে পারবি না! ব'লে কেঁদে ফেললে রাজু।

—আঃ কি হচ্ছে রাজুদি! চুপ করো। কাঁদলে যে দাদাবাবুর অকল্যাণ হবে। বলে নন্দ নিজের আঁচল দিয়ে রাজুর চোখের জল মুছিয়ে দিলে।

সেই মুহূর্তে গাইতে গাইতে নাটকীয় ভাবে ললিতের প্রবেশ। রাজুর সামনে এসে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে ললিত জড়িত কণ্ঠে গাইলে:—

"কে গো তুমি বিরহিনী
আমারে সম্ভাষিলে।
এ পোড়া পরাণ তরে
এত ভাল বাসিলে॥
হরিত বসনে সাজি
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধু থাকে
মনপ্রাণে হাসিলে॥"

রাজুর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে ললিত গান শেষ করলে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উঠলো হাসির রোল।

সঙ্গে সঙ্গে চৌকাঠের ধারে রতিপতির আবির্ভাব। তার সারা অঙ্গ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। হাত দিয়ে কপালের, চোখ মুখের জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, বেড়ে আছো সব মাইরি !

—তুমি যে হঠাৎ ? জিজ্ঞেস করলে আশা।

—আমি যখন আসি—এমনি হঠাৎই আসি। ব'লে বারান্দার ধারে এগিয়ে গিয়ে রতিপতি কোঁচাটা খুলে নিঙড়ে নিলে। তাই দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে আবার চৌকাঠের ধারে এগিয়ে এলো।

—আগে গায়ের জামাটা খোল। ব'লে আশা একখানা টাওয়েল ওর দিকে এগিয়ে ধরলে।

- রাখো ঠাকরোণ তোমার বাসিকবা টাওয়েল। আমার এই কোঁচার খুঁটই যথেষ্ট ! একটা ছেড়া কাপড় চোপড় যদি থাকে তো দাও।

বারান্দার এক কোণে ভিজে জামা কাপড় জড় ক'রে রেখে আশার দেওয়া একখানা কাপড় লুঙ্গির মত ক'রে পরে ঘরে এসে ঢুকলো রতিপতি।

—তারপর রতিপতি ! তুনিয়ার হালচাল কি ? বললে ললিত।

তুনিয়ার হালচাল ব'লে এখন আর কিছু নেই. সারা তুনিয়া এখন বানচাল হয়ে গেছে। দাও—সিগারেট ফিগারেট যদি থাকে তো দাও, জল ঝড়ে একেবারে ক্বালিয়ে গেছি। বাপরে বাপ্. পৃথিবীর বুকের ওপর যেন প্রলয় কাণ্ড হচ্ছে। এরই নাম কালবৈশাখী।'

আশার দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে রতিপতি বললে রাজু, নন্দ আর আশার দিকে চেয়ে, দিব্যি আছো- কেমন ! মাইরি— তোমাদের দেখলে আমার দস্তুরমত হিংসে হয়। তোমরা—তোমরা দ্যাখো দেখি কেমন ঘরের দোর জানালা বন্ধ করে প্রেমের খোস গল্প কচ্ছো আর তোমাদের বাবুরা হয়তো এখন মোটরে বসে বসে ভিজছে— মোটরের ইঞ্জিন গেছে ঠাণ্ডা হয়ে, অথবা কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তার ধারে গাড়ী-বারান্দার তলায়— জলে গেছে সর্বাঙ্গ ভিজে।

—প্রেমিক পুরুষ জাতকে প্রেমিকাদের জন্যে ও রকম কষ্ট সহ্য করতেই হয়। বললে নন্দ।

হাসলে রতিপতি। বললে, প্রেম! কথাটার কোন অর্থ নেই—অর্থ হয় না—অর্থ হবে না! স্রেফ একটা ভুয়ো কথা। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নেবার জন্য সুবিধাবাদী দুনিয়ার মেয়েপুরুষ ঐ প্রেম কথাটার সৃষ্টি করেছে। প্রেমটা আর কিছুই নয়—আধুনিক জগতে স্তোকবাক্য দিয়ে ধাপ্পাবাজি। প্রত্যেক তথাকথিত প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের শুধু অভিনয় করে, অন্তর দিয়ে প্রেম কবতে জানে না, করতে শেখেনি—করার ক্ষমতা তাদের নেই।

—মুখ সামলে রতিপতি! প্রায় গর্জ্জে উঠলো ললিত।

—তুমি আমায় হাসালে মাষ্টাব। চোখ রাঙিয়ে প্রেম জাহিব করা যায় না বন্ধু, নিজেকে শুধু ধরাই দেওয়া হয়।

—তুমি কি বলতে চাও—আমি রাজুকে আন্তরিক ভালবাসি না?

—হ্যাঁ, ভাল হয়তো বাসো তবে সেটা ঠিক আন্তবিক নয়।

—রতিপতি! ওজন বুঝে কথা বলো।

হাস্যমুখর কণ্ঠে রতিপতি বললে, নাঃ ভেবেছিলুম হাটের মাঝে হাড়ী ভেঙে সবকিছু বেফাঁস করে দেবো না কিন্তু মাষ্টার বেজায় বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। আচ্ছা মাষ্টার! যে যাকে আন্তবিক ভালবাসে সে কি তাকে বিপদের মুখে ফেলে পালাতে পারে? শবৎ-সুন্দরীর বাড়ীতে ষোড়শী খুন হবার পর রাজুকে ফেলে পালিয়েছিল যে মাষ্টার—সে কি সত্যিকার প্রেমিক?

—সেটা—সেটা অবশ্য—

—চুপ্! দোষী তুমি একা নও। তোমার রাজুবিবি কি। দু'টাইমের দু'বাবুর কাছে বাঁধা। তারা জানে—রাজুর ঘরে আব তৃতীয় পক্ষ ব'লে কেঁউ আসে না। দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে রাজু তোমায় নিয়ে প্রেম ক'রে চলেছে আর তাদের সঙ্গে কচ্ছে প্রেমের অভিনয়। যে তাদের সঙ্গে অভিনয় করে

তোমার সঙ্গে প্রেম করতে পারে সে যে একদিন অন্তের সঙ্গে প্রেম ক'রে তোমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় না করবে—এ কথা জোর গলায় কে বলতে পারে।

রাজু রতিপতির কথায় মোটেই চটলো না। স্মিত হাস্যে বললে, নিশ্চয়! ও যদি ধার করে—আমায় শুধতে হবে বইকি!

—ঠক বাছতে গাঁ উজোড়! তোমাদের বাড়ীর গৌরীর কথাই ধরা যাক্। আগে ও ঐ পনের নম্বরে একলা ছিল একটা বাড়ী নিয়ে। পাহারা দেবার জন্য বাঁধা বাবু ওর দরজায় বসালে বাহাদুর। পিঁপড়ে গলবার উপায় নেই। কিন্তু মেয়েমানুষ কি চীজ বাবা, বাহাদুর নীচে বসে ঝিমুতো আর গৌরী পাশের বাড়ীর ছাদ ডিঙিয়ে বাবু ঘরে নিয়ে এসে পিরীত করতো মাঝ রাত্রে।

—আর শব বাবু? জিজ্ঞাসা করলে আশা।

—ভাল লোক কখনো কি এসব জায়গায় রাত কাটায়! তিনি তো রাত দশটা বাজতে বাজতেই হাওয়া হয়ে গেলেন। পাশ বালিস নিয়ে কি আর জলজ্যান্ত যুবতী মেয়েছেলের ঘুম আসে—না রাত কাটে। দোষ অবশ্য কোন্ পক্ষের তা হচ্ছে গবেষণা সাপেক্ষ।

—পাশের বাড়ীর ছাদ ডিঙিয়ে কোথা থেকে নাগর আসতো, রতিপতি? জিজ্ঞাসা করলে নন্দ।

—নাগরটি হচ্ছে পাশের বাড়ীর একটি মেয়েমানুষের বাবুর বন্ধু। ছাদে ছাদে হলো প্রেম—মাটির সঙ্গে নেই সম্পর্ক। রাত দশটার পর ছাদ টপকে বাবুর আগমন আর কাক-কোকিল না ডাকতে ডাকতে নাগরের ঐ পথেই প্রস্থান।

—পরিণাম? জানতে চাইলে ললিত।

—চোরা গোপ্তা প্রেম যতই মধুর হোক না কেন, পরিণাম তার কোন দিনই ভাল হয় না। দেয়ালেরও কান আছে, গৌরীর গুপ্ত প্রেমের খবর কানে গেল বাঁধা বাবুর। নাগরটি দেখলে যে আর বেশী দিন তার প্রেম করা চলবে না এ ভাবে, বিদায় তাকে নিতেই

হবে। এভাবে যারা প্রেম করে তারা কোনদিনই ভাল লোক হয় না, যাবার সময় প্রেমিকপ্রবর জানিয়ে দিয়ে গেল যে—কে গেল! গৌরীকে অত্যধিক মদ খাইয়ে তার সো-কেস ভেঙে দু'সেট গয়না আর হাজার খানেক টাকা—মানে হাতের কাছে যা পেলে তাই নিয়ে চিরদিনের জন্য প্রেমিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ললিত হাসতে হাসতে বললে, তুমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছো না রতিপতি, গৌরীর ঐ দু'সেট গয়না আর হাজার খানেক টাকা সে চুরি করে নিয়ে যায়নি—নিয়ে গেছে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ।

রাজু বললে একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, রতিপতির কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। যতই সুখে স্বচ্ছন্দ থাকি না কেন—এ শুধু মনকে আঁখি ঠারা, আমরা সদাই ভাসছি সবাই অকূল পাথারে।

—দুঃখ করে লাভ নেই। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো—যদ্দিন যায় তদ্দিন ভালো। সব হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। প্রেমের পরীক্ষায় সবাই হচ্ছেন পি-আর-এস্।

নন্দ বললে, বেশ। পরীক্ষাটা আজই হ'য়ে যাক। যার ঘরে বসে আছি তার ওপর দিয়েই হোক। আশা আজ ওর তিনটি টাইমের বাবুকেই একে একে টেলিফোন করে জানিয়ে দিক যে—ও আজ খুব অসুস্থ।

—কিন্তু পরীক্ষাটা হবে কেমন করে, অসুখটা কি? জিজ্ঞেস করলে আশা।

—আচ্ছা, সে সব ব্যবস্থা আমিই ঠিক করে দিচ্ছি। তোর ঘরে বাসন মাজবার খোল আছে?

—খোল। কি খোল?

—আঃ যে খোল গরুতে খায়রে বাপু।

—হ্যাঁ, আছে। বললে আশা।

—আচ্ছা। মাষ্টার মশাই, রতিপতি—তোমরা গিয়ে ভাই রাজুর ঘরে বসো। আমি আর রাজু একটু পরেই যাচ্ছি। বললে নন্দ।

বাত তখন সাড়ে সাতটা কি আটটা। বাধেশ্যাম ঘবঘরিয়া পর্দা সবিয়ে ঘবে এসে ঢুকলেন।

—আবে, এ কেয়া তাজ্জব! তুমহারা এ কেয়া হাল হুয়া বিবিজান! এঁ –বলেই ত্রস্তে দবজাব দিকে দু'পা পিছিয়ে গেলেন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে।

আশা একজন নামকবা সিনেমা অভিনেত্রী। অভিনয় কবা তাব কাছে কিছুই নয়। বাবুকে দেখে গোঁঙানী তাব বেড়ে গেল। হাতে পায়ে খিল ধবতে লাগলো। মাথা বেঁকে নেমে এলো বুকেব কাছে। বেঁকে আশা ধনুক হ'য়ে গেল। আশাব কলেবা হ'য়েছে।

সাবা ঘবেব মেঝেয় ছড়িয়ে আছে মল মূত্র, বিছানাব শুজনীতে লেগেছে মলেব দাগ। মল মূত্র মেখে আশা বোগেব যন্ত্রণায় ছটফট্ কবছে।

কলেবা বড মাবাত্মক বোগ, ছোঁয়াচে বোগ। ঘবঘবিয়া বাবুব মুখখানি ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পিছু হট্‌তে হট্‌তে বাবুমশাই চোকাঠেব বাইবে এসে দাঁড়ালেন।

আশা ইসাবায় বাবুকে এসে তাব শিয়বে বসতে বললে। খিল ধবা হাত এগিয়ে দেবাব চেষ্টা কবলে টেনে দেবার জন্য।

বাবু বললেন বাইবে দাঁড়িয়ে, আজ হামাব বহুৎ জরুরী কাম— পিযাবী! পাশ শো রূপেয়া বাখো –ডাগ্‌দাব ডাকো—নার্স বোলাও। জলদি বাহাদুবকো ভেজো। বলতে বলতে পাঁচশো টাকার এক বাণ্ডিল নোট ছুঁড়ে দিলেন বাবু আশাব বিছানার ওপর।

ক্ষীণ কণ্ঠে আশা বললে, আমি ম'বে যাবো, বাবুসাব। উঃ— ওঃ– মাগো—

—আবে বাম কহ, বিবিজান। ওসুখ তো হামেসাই হোয় –

আদমীয়ই হোয়, ডোরিয়ে মাত্ ! হোনুমানজীকো ডাকো—সারিয়ে উঠবে। এ বাহাদুর !

—জা—হোজুর।

—জলদী বোলাও—আচ্ছা ডাগ্দার বোলাও। বলতে বলতে ঘরঘরিয়া ত্রস্তপদে নীচে নেমে গেলেন, যেন তিনি নিজেই ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছেন।

ঘরঘরিয়ার গাড়া স্টার্ট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দ, রাজু, গৌরী প্রভৃতি আশার ঘরে এসে ঢুকলো। আশা তখন উঠে বসে নোটের তাড়া খুলে নোট গুণছিল।

—ও টাকায় কিন্তু আমাদেরও ভাগ আছে। বললে নন্দ।

আর সকলে আশার হাত থেকে নোটগুলো ছিনিয়ে নিলে। সমবেত অট্টহাস্যে ঘরখানা যেন ফেটে পড়লো।

—এবার আমার দ্বিতীয় বাবু হরিশচন্দ্রের পরীক্ষা। নন্দ. আমি টেলিফোন করলে ধরা পড়ে যাবো। আমার হয়ে তুই ভাই টেলিফোনটা করে দে। কলেরা ব'লে বলিসনি, তাহলে শুধু আজ কেন—এক সপ্তাহ আর এ পথ মাড়াবে না। পরে একদিন এসে বলবে, আমার পিসতুতো. দাদা কি কাকা—যাহোক একজন হঠাৎ মারা গেল, তাই আসতে পারিনি। আহা, তুমি কি হয়ে গেছ ! যাক্, বেঁচে উঠেছো—সেই যথেষ্ট ! হাড় থাকলেই মাস হয়, ভাল ক'রে খাও দাও, সেরে উঠবে।

আশার ঘরেই টেলিফোন আছে। নন্দ ফোন করলে হরিশ বাবুকে, হ্যালো—কে ? হরিশবাবু ! অ—আমি—? আমি—গলাটা কি চেনা চেনা লাগছে না ! না—না—আমি আশা নয়, নন্দ। হ্যাঁ—খবর সব ভালো। আপনার আশার মাথাটা বড্ড ধরেছে। একবার আসবেন ! না—না—ঘরঘরিয়া বাবুর দিন হলে কি হবে, তিনি আজ বাইরে গেলেন। হ্যাঁ—সত্যি, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এ্যাঁ—ছিঃ ছিঃ আপনাকে এনে কি কখনো

অপ্রস্তুতে ফেলতে পারে আশা। শীগগীর আসুন—, আপনি না টিপে দিলে ওর মাথাই সারবে না। না—না—ঠাট্টা নয়, সত্যি—ও মাথার যন্ত্রণায় একেবারে উঠতেই পাচ্ছে না। বলেন তো ওকেই না হয় ফোনটা দিই! দেবার দরকার নেই, আচ্ছা ধন্যবাদ! শীগগীর আসুন কিন্তু। ছেড়ে দিচ্ছি।

ফোন ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার হাসির হল্লা উঠলো। রতিপতি পর্দ্দার পাশ দিয়ে মাথাটি বাড়িয়ে বললে, আসতে পারি!

—'সময় এখনো হয়নি নিকট!' বললে রাজু।

চোকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই রতিপতি আঙ্গুলে টাকা বাজাবার কশরৎ দেখিয়ে বললে, কত হলো?

—পাঁচ শো!

মুখ মচকে রতিপতি বললে, মোটে! যাক্—পাঁচ মিনিট অভিনয় ক'রে পাঁচশো টাকা—মন্দের ভাল। তবে হ্যাঁ—এত কম সময় অভিনয় করে পাঁচশো টাকা আশা জীবনেও কোনদিন উপায় করেনি। তোমার ঘরঘরিয়া মশাই পরীক্ষায় ফেল তো হলেনই, উপরন্তু ফেলের খ্যাসারত দিয়ে গেলেন পাঁচশো টাকা।

—এবার হরিশবাবুর পালা। দেখা যাক, খোদা বরাতে কি মাপিয়েছে! বললে আশা।

—কতক্ষণ আর আশায় আশায় থাকা যায় বল! চট্‌পট্ তোমার প্রেমের অভিনয় শেষ করো না বাবা। ধৈর্য্য যে আর বাগ মানছে না!

দরজার গোড়ায় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

—অই—এসে গেছে। শুয়ে পড় আশা—শুয়ে পড়! আ—মর্ কাত্‌রাতে সুরু কর না।

সে আমি কচ্ছি—তোরা দূর হ' না চট্‌পট্! বলে আশা, শুয়ে পড়লো।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পেয়ে ওরা ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্যুটধারী হরিশচন্দ্র 'আশা' বলেই পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আশাকে গোঁঙাতে দেখে এবং ঘরের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দেখে শিহরণ জাগলো প্রেমিক হরিশচন্দ্রের দেহ ও মনে। মল মূত্র সমাকীর্ণ ঘরখানার ভিতর পা বাড়াবার জায়গা নেই। সেণ্ট মাখানো রুমালখানা নাকেব ওপব চেপে ধরে হরিশবাবু বললে, এসব কি কাণ্ড। তবে যে শুনলাম – তোমাব মাথা ধরেছে? হয়েছে কি— ?

গোঁঙাতে গোঁঙাতে আশা ক্ষীণ কণ্ঠে বললে টেনে টেনে, ওগো, আমি আর বাঁচবো না গো—আমি আব বাঁচবো না। কাল বোগে ধবেছে। হাতে পায়ে ধরছে খিল। কলেবা—এসিয়াটিক কলেবা। শীগগীর আমার কাছে এসে বসো, জনমেব মত তোমায় একবাব দেখে নিই হরিশ। উঃ মাগো—একি যম-যন্ত্রণা।

—কলেরা—তোমার কলেরা হয়েছে! একথা আমায় আগে বলতে হয়।

—তাহলে বুঝি এ পথ আর মাড়াতে না। শ্মশান ঘাটে গিয়ে আমায় চিতার ওপর দেখতে।

—ছিঃ এসব তুমি কি বলছো। আমি মানুষ —না কষাই।

—তোমায় মানুষ ভেবেই তো ভালবেসেছিলাম হবিশ। তুমি ছাড়া এ সময় আমার আব কেউ নেই। দেখছো না—সব্বাই ভয়ে এ পাশ মাড়ায় না। এক বিন্দু জল দেবে—এমন একটি প্রাণীও নেই। তাদেরই বা দোষ কি, প্রাণের মায়া সবাবই তো আছে। উঃ—আর কথা বলতে পাচ্ছি না হবিশ। গলা শুকিয়ে আসছে, ভিতর থেকে জীব টেনে ধরছে। উঃ কি কবি, কষ্টটা যে বড্ড বেশী হচ্ছে। তুমি আমায় বাঁচাও হরিশ। আমাব মাথা তোমাব কোলে তুলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দাও, তোমাব হাতের ছোয়া লাগলেই অসুখ আমার আপনা হতে সেরে যাবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হরিশ বাবু বললে ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে, কি যে

ছেলেমানুষের মত আবোল তাবোল বকছো! এ সময় কি কখনো মাথার কাছে বসে সোহাগ করা সাজে! কোন ভয় নেই আমি ডাক্তার ডাকতে চল্লুম।

—তুমি তার চেয়ে আমার কাছে বসে থাকো। বাহাদুর ডাক্তার ডাকতে যাক।

—হুঁ—বসে থাকবার কি আমার সময় আছে। বাড়ীতে আমার দিদির টাইফয়েড, এখন যায়—তখন যায় অবস্থা। আজ ছুপুরেই তো টাল গেল। বলতে বলতে যাবার জন্য পিছন ফিরলো হরিশ।

ক্রন্দন বিজড়িত কণ্ঠে আশা বললে, তুমি আমায় এই অবস্থায় ফেলে চলে যাবে। না—না হরিশ—তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে আমি মরে যাবো। যদিও মরি—মরবো তোমার কোলে মাথা দিয়ে। আমার এই নিদেন অবস্থায় তুমি আমায় একা ফেলে যেও না!

—এটা আদিখ্যেতার সময় নয় আশা! আগে সেরে ওঠ—আদব কাড়ানোর সময় অনেক পাবে।

—আমার এই অবস্থায় কড়া কড়া কথা শোনাতে তোমার মুখে একটু বাধছে না, হরিশ! ছিঃ—তুমি না আমায় ভালবাসো। উঃ—মাগো—আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না মা। বলে আশা বালিশের ওপর মুখ গুজড়ে কাতরাতে লাগলো।

—এতক্ষণ কষ্ট করেছো, আর একটু কষ্ট সহ্য কর ডারলিঙ্, আমি এখুনি তোমার জন্যে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। ব'লে হরিশ ক্ষিপ্রপদে নীচে নেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি সামলাতে সামলাতে হুড়-হুড় ক'রে আশার ঘরে এসে ঢুকলো -রাজু, নন্দ, গৌরী।

—উঃ বাপ্‌রে বাপ্। অভিনয়ের ঠ্যালায় প্রাণান্ত। তোরা যাই বলিস ভাই—এ অভিনয় সে অভিনয়ের তুলনায় অনেক শক্ত!

কি-ন-তু ভালবাসা দেখাতে হরিশ কি সত্যি সত্যি কোন ডাক্তার ডেকে দেবে নাকি? উঃ ইচ্ছে ক'রে হাত-পায়ে খিল ধরিয়ে এখন সত্যি সত্যি খিল ধরতে বসেছে।

—ডাক্তারকে শুধু ডেকে দেবে—, নিজে সঙ্গে আসবে না? জিজ্ঞেস করলে গৌরী।

হেসে উঠলো আশা। বললে, তার দিদি মর মর।

সবাই হাসলে।

—কি-ন-তু এ বাজিটা যে বৃথাই গেল! নগদ কিছুই তো—

আশার মুখের কথা মুখেই রইলো। বাহাদুর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়ে ছোট্ট একটি নোটের বাণ্ডিল এগিয়ে ধরলে। আশা নোটের তাড়াটা নিয়ে বললে, কে দিলে বাহাদুর?

—মেজবাবু!

—কিছু বলেছে?

—ডাক্তার ডাকতে বললেন।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি কিছু বলনি তো?

স্মিত হাস্যে বাহাদুর বললে, না—মাজী!

বাহাদুরের সঙ্গে আগে থাকতেই গড়াপেটা ছিল আশার। বাহাদুর হাতে না থাকলে এসব ব্যাপারে হাত দেওয়া যায় না, সব ফন্দী বেঁফাস হয়ে যাবার ভয়। আশা বললে, ঠিক আছে।

বাহাদুর সেলাম দিয়ে হাসিমুখে নীচে নেমে গেল।

রতিপতি এসে দরজার বাইরে থেকে মুখটি বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে ঈষৎ চাপা গলায়, এ বাজীতে কত হলো?

রতিপতির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে আশা বললে, দুশো।

—মোট হলো তাহলে সাত শো! তা কলেরায় তোমার যে চোখ মুখ বসে গেছে আশা! এক পেগ টেনে নেবে নাকি?

—পাগল হ'য়েছো! শেষ বাজীমাৎ না ক'রে মদের গ্লাস

ধরতে পারি! গন্ধ পেলে সব ভেস্তে যাবে। আর আধ ঘণ্টা সময় আমায় দাও রতিপতি, তার মধ্যেই সব ফয়সালা হ'য়ে যাবে।

—অতি উত্তম কথা। দুজনের ভালবাসা তো বোঝা গেল, বাকি শুধু নিরঞ্জনবাবু। তাকে এখন হাজির করবে কি ক'রে? তার বাড়ীতে তো ফোন নেই যে 'হ্যালো' 'ওলো' ব'লে ডাকলেই এসে হাজিব হবে।

গৌরী বললে, সত্যি, বড়ই মুস্কিলের কথা!

—মুস্কিল আসান করতে পারে একমাত্র রতিপতি। যাবে বতিপতি একবার নিরঞ্জনের বাড়ী? আমি তোমায় ট্যাকসি ভাড়া দিচ্ছি। বললে আশা আগ্রহান্বিত কণ্ঠে।

—অনেকদিন আগে একবার নিরঞ্জনবাবুর বাড়ী গেসলাম। সেদিন ছিলাম নেশায় বুঁদ। রাত্তির বেলা বাড়ীটা কি ঠিক কবতে পারবো?

—খুব পারবে! এই নাও ট্যাকসি ভাড়া। কি বলতে হবে বুঝতে পেরেছো তো?

—মোটেই না। কি বলবো ব'লে দাও।

—বলবে—ঘরঘবিয়া বাবু আজ সকালে হঠাৎ লাখ্‌নো চলে গেছেন। ঘর খালি। আশা আপনাকে বিশেষ করে যেতে বললে। না গেলে—সে ব'লে দিয়েছে—কেলেঙ্কারীর একশেষ করবে। যাও চট্‌ পট্‌ বেরিয়ে পড়।

—যো হুকুম বেগম সাহেবা। ব'লে কুর্ণিস করে রতিপতি চলে গেল।

—কিরে নন্দ, তুই যে একেবারে গুম খেয়ে গেলি? কি—কথা বলছিস না যে?

—তুই আর কি অভিনয় করিস আশা! আমাদের বাবুরা তোর চেয়ে হাজার গুণ ভাল অভিনয় করতে পারে।

—সে কথা হাজারবার সত্যি! বাবুরা যখন দু'চোখ ছলছলিয়ে

আধো আধো সোহাগের সুরে বলে, বাপরে—সোনারে। তোমার জন্যে আমার বুক যায়, প্রাণ যায়। তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড আমার কোথাও তিষ্ঠুতে ইচ্ছে করে না—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। সত্যি বল্ দেখি ভাই, তখন কি মনে হয় না যে লোকটা আমাকে ভালবাসে। এই যেমন ধর—আমাদের হরিশবাবুর কথা। কোন দিন কি মনে হয়েছে যে আমাকে এমন মরণাপন্ন অবস্থায় ফেলে ভদ্রলোক ছল করে পালিয়ে যাবে।

গৌরী বললে, মেয়েরাও ভাই কিছু কম যায় না। পয়সা খ্যাচবার মতলবে মেয়েরাও কম অভিনয় করে না। তুমি আমিই তাব প্রমাণ।

বাজু বললে, কিন্তু ভাই, মেয়েরা যখন যাকে ভালবাসে এক-জনকেই বাসে। অথচ পাঁচঘাটেব জল খেয়ে না ফিবলে বেটাছেলেদের তেষ্টা মেটে না।

আশা বললে, তাব উদাহবণ আমাদেব হবিশ। হবিশ পাঁচ-ঘাটা। অথচ মজা এই -সব কিছু জেনে শুনেও আমি ওকে ভালবাসি।

—কিন্তু হবিশবাবু যে তোকে কতটা ভালবাসে তাতো আজকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল।

ক্ষণেক নীববতাব পব আশা বললে, ও যে এ অবস্থায় আমায় ফেলে চলে যেতে পাবে তা আমাব স্বপ্নেরও অগোচব ছিল!

দরজায় ট্যাক্সি থামার শব্দ হলো।

আশা বললে, আব শুয়ে শুয়ে কাতরাতে পারি না বাবা। এর চেয়ে সত্যি অসুখ হওয়া ঢেব বেশী ভাল ছিল। ওকি—পালা সব। তোরা যে বসে রইলি!

রহস্য ক'রে নন্দ বললে, শুধু শুধু অসুখ মানুষটাকে একা ফেলে গিয়ে লাভ কি! নিরঞ্জনও যে ধূলো পায়ে বওনা দেবে—এ কথা হলপ্ করেই বলা যায়। যা তিরিক্ষি মেজাজের মগে মারা লোক।

—বিশেষ করে সে যখন জানে যে— আমি হরিশকেই ভালবাসি! বললে আশা শুয়ে শুয়ে।

—ফলেন পরিচিয়তে। পরীক্ষা তো আর বিশবার হয় না—,হয় একবার। আমরা থাকলে এদের প্রেমের অভিনয় ভালরকম জমবে নাঃ ভাই, এখান থেকে আপাতত আমাদের যাওয়াই ভাল। ব'লে উঠে পড়লো রাজু।

ওরা বেরুতে যাবে—দোর গোড়ায় নিরঞ্জন।

—একি আপনারা সব নাকে কাপড় দিয়ে পালাচ্ছেন কোথা? স্মিতহাস্যে বললে নিরঞ্জন।

রাজু ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বললে, আর বল কেন ভাই। পাপের ভোগ আব কাকে বলে। যাই—এই রা'তভূপুরে আবার গিয়ে স্নান করে মরি।

—হয়েছে কি? বিস্ময় ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে নিরঞ্জন।

—এই নন্দই যত কাল করলে।

নাকের ঢাকা না সরিয়েই নন্দ বললে, কলেরা হয়েছে জানলে আমি কখনো আশার ঘরে ঢুকি। তায় আবার আমার খালি পেট।

—কলেরা! কার কলেরা হয়েছে—আশার?

—হ্যাঁ ভাই। তোমার জিনিষ—তুমি ভাই এবার বুঝে পড়ে নাও। হাসপাতালে পাঠাতে চাও—হাসপাতালে পাঠাও আর বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করাতে চাও—তাই করো। মোট কথা— রোগীর নিদেন অবস্থা। আমরা ভাই চললুম। পড়ি-কি মরি হ'য়ে সবাই সন্ত্রস্তভাবে স্থান ত্যাগ করলে।

নিরঞ্জন ওদের গমন পথের দিকে একবার চেয়ে সরাসরি ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলো। দরজার ধারে জুতো খুলে সে ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা একবার দেখে নিয়ে একেবারে আশার শিয়রে গিয়ে বসলো।

—কে নিরু! এসেছো—! আমার আর কথা বলার শক্তি নেই।

তোমাকে একবার শেষ দেখা দেখবো ব'লে আসতে ব'লেছিলাম। সে সাধ আমার মিটলো। আর তুমি দেরী করো না নিরু, এবার পালাও। কলেরা ভারী ছোঁয়াচে রোগ। লক্ষ্মীটি, বেশীক্ষণ থেকো না এখানে। বলতে বলতে আশার যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

আশার মাথাটি ধীরে ধীরে কোলের ওপর তুলে নিয়ে নিরঞ্জন বললে, কি বলছো তুমি! আমি তো আমি, তোমায় এই অবস্থায় ফেলে কোন মানুষ চলে যেতে পারে! দাঁড়াও—এক মিনিট! বলে নিরঞ্জন এক টুকরো কাগজে কি যেন লিখে ডাক দিলে, বাহাদুর!

—বাহাদুরকে কেন ডাকছো?

—আমার এই চিঠিটা নিয়ে ও ডাক্তার দাসের কাছে যাবে। কলেরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দাস আমার বিশেষ বন্ধু! এখুনি এসে পড়বে।

—তোমায় পৌঁছে দিয়ে ডাক্তার দাসের কাছেই রতিপতি গেছে। বাহাদুরের যাবার আর দরকার নেই।

—ঠিক গেছে তো?

—হ্যাঁ। রতিপতির কথার দাম আছে। বললে আশা টেনে টেনে।

—দাঁড়াও, এক মিনিট। ডাক্তার আসার আগে ঘরটা আমি পরিষ্কার করে ফেলি। ব'লে গায়ের জামা খুলে ফেললে নিরঞ্জন।

হাসি চেপে আশা বললে, তুমি কি সত্যি সত্যি পাগল হলে নিরঞ্জন! কলেরা রোগের ভয়ে বাড়ীর লোক ঘর ছেড়ে গেল আর তুমি করবে তার—

—যারা চলে গেল তারা তো আমার মত তোমায় ভালবাসে না আশা। সত্যি যদি তারা তোমায় ভালবাসতো তাহলে কখনই তোমায় এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারতো না। তুমি থামো—বেশী বকো না। আমার কাজ আমায় করতে দাও। ব'লে দু'হাতে

ছ'টো খবরের কাগজের টুকরো নিয়ে ঘরের মেঝেয় বিক্ষিপ্ত মল পরিষ্কার করে এক জায়গায় জড় করলে।

—তুমি নিশ্চয় মারা যাবে নিরঞ্জন। দুঃখ আমার আর কিছু নয় —আমার জন্যে তোমাকেও মরতে হলো। উঃ এ দুঃখ কি আমার মলেও যাবে। বলতে বলতে কেঁদে ফেললে আশা।

—আঃ তুমি থামবে না শুধু বকেই যাবে। আচ্ছা মুস্কিল তো! বেশ, মরি মরবো—তোমার জন্যেই মরবো। আমি তো আর কচি খোকাটি নয় যে নিজে নিজের ভালমন্দ বুঝি না। কৈ—ডাক্তার এখনো আসছে না কেন? নাঃ এগুলো পরিষ্কার করে নিজেই একবার যাই। কি করবো বল, বরাতের ভোগে একাই তোমাকে একটু থাকতে হবে। এমন বোকা লোকও আমি দেখিনি। একবার রতিপতি যদি আমায় আসবার সময় বলতো তাহলে ডাক্তার দাসকে একবারে সঙ্গে নিয়েই আসতে পারতাম!

—উঃ আর পারিনে বাবা। ব'লে আচমকা উঠে বসে আশা অট্টহাস্যে ঘরখানা ফাটিয়ে ফেললে। হাসি আর কিছুতে থামতে চায় না। হেসে হেসে পেটে প্রায় খিল ধরার অবস্থা। হাসতে হাসতে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হতভম্ব নিরঞ্জন নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো আশার গমন পথের দিকে। বাইরে তখন উঠেছে উৎকট হাসির রোল। নিরঞ্জন নিকটস্থ সোফাটার ওপর বসে পড়লো। পাশের ঘরের রেডিওতে তখন গান চলছে :—

"ভাল আছ সুখে আছ, ভালবাসনি।
তুমি তো সুখের আশে সুখ-আশা নাসনি॥
তুমি তো কাহার লাগি—
বিফল যামিনী জাগি
আঁখি নীরে ভাসনি।
তুমি কি জানিবে বল—

কারে বলে ভুখানল

কি দাহন অবিরল হৃদয়-গহনে।

তুমি তো আপন করে

মরম ছেদিয়া পরে

ডালি দিতে আসনি।”

হঠাৎ রতিপতি ঘরে ঢুকে একটা ফুলের গ'ড়ে নিবঞ্জনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, আশাকে সত্যি যদি কেউ ভালবাসে তবে সে আপনি। প্রেমের পরীক্ষায় আপনি ফুল মার্ক পেয়েছেন তাই আজ সবার পক্ষ থেকে—বিশেষ করে আশার পক্ষ থেকে ফুলেব গ'ড়ে দিয়ে আমি আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করলাম।

—আশার কিছুই হয়নি ?

—সেটা বুঝতে এত দেরী হলো আপনার ?

—তবে এই ঘরময়—

হেসে ফেললে রতিপতি। বললে, ও সব মল নয়—, খোল ভেজানো অমনি ক'রে সারা ঘবময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

—তাইতো বলি—দুর্গন্ধ নেই কেন!

—খোলটা একটু পচিয়ে নিলে বোঝবার আর কোন বালাই-ই থাকতো না। ব'লে রতিপতি বাইরের উদ্দেশে ডাক দিলে—কৈ গো সব এয়োর দল। এসো ঝটপট, এবার যে বর বরণ করতে হবে। ব'লে রতিপতি নিজেই মেয়েছেলের মত উলু দিয়ে উঠলো।

উলু দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো আশা, গৌরী, নন্দ, রাজু, ললিত আর মহাদেব। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি বিলাতি মদের বোতল। বরণ করার মত তারা সবাই নিবঞ্জনের চারদিকে উলু দিয়ে ফিরে এলো।

রতিপতি বললে, এবার মালা বদল। সব খুঁটিখাটা ছেড়ে দাও—নয় ভাতার পুতের মাথা খাও।

নিরঞ্জন সহাস্যে নিজের গলা থেকে ফুলের গ'ড়েটা নিয়ে আশার গলায় পরিয়ে দিলে। সবাই আর একবাব উলুধ্বনি দিলে।

গান ও পানের আসব বসলো আশার ঘরে। আশার উপরি উপায় ঐ সাত শো টাকা জমাই রইলো, নিরঞ্জন ও টাকায় হাত দিতে দিলে না। সেদিনের পান ভোজনের টাকা সে-ই দিলে নিজের পকেট থেকে। ও সাত শো টাকা তোলা রইলো পরবর্তী আসরের জন্য।

আশার নিমন্ত্রণে বাড়ীর সকলেই এসে জমায়েত হলো তার ঘরে। নন্দ, বাজু, গৌরী, ললিত, রতিপতি, মহাদেব—এক বাড়ীউলি ছাড়া বাড়ীর আর কেউ বাদ রইলো না। বাড়ীউলির না আসবার কারণ —আফিম। আফিমের নেশায় সে তখন বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। মহাদেব বললে, ও বুড়ী শালিককে বাদ দাও, আশা। ওর কালার প্রেমে মন মজেছে, আফিমের নেশা না কাটলে ও মদের গ্লাস ছোবে না।

ফাউল কাটলেট আর মদ—এই নিয়ে আসব স্থুরু হলো। নানা গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে গ্লাস ঘুরতে লাগলো। জমি তৈরী হতেই এক বোতল হুয়িস্কি উবে গেল। খোলা হলো দ্বিতীয় বোতল। আরো কয়েক পেগ পেটে পড়ার পর সবাই একযোগে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো নিরঞ্জনের প্রশংসায়। হ্যাঁ—এমন সত্যিকারের প্রেমিক হাজারে একটা মেলে। একে অবহেলা, অপ-ঘেন্ন' করলে আশার যে নরকেও ঠাই হবে না—এই কঠোর রায় আসরের সভ্যাবৃন্দ মুক্ত কণ্ঠে জাহির করলে।

তু'বোতল বিলাতি মদ শেষ হলো।

চাকর—বাবু, বিবিদের জলযোগের জন্য এক একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডিসে একখানি করে মোগলই পরটা আর কতকটা করে মুরগীর কারি নিয়ে এলো।

আশা চাকরের হাত থেকে নিয়ে সবার সামনে একটি করে ডিস

ধরে দিলে। চাকর দিলে সবার হাতে একখানি করে ফরসা তোয়ালে।

ললিত বললে, মদের পালা শেষ না করে আমি তো কিছু খাই না!

রতিপতি বললে, মাষ্টার করতে গিয়ে ছাত্র, ছাত্রীদের উপদেশ দাও, বক্তৃতা কর—কেমন করে স্বাস্থ্যটাকে সুস্থ রাখতে হয়, অথচ নিজে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন। খালি পেটে গোগ্রাসে মদ গিললে ক'দিন টিকবে বন্ধু! লিভারের দফা রফা, তোমার স্বাস্থ্যের বাজবে বারোটা আব আমাদের রাজুর বরাতে বৈধব্য যোগ'

সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

—কিন্তু খালি পেটে মদ না খেলে নেশা যে ভালো জমে না! বললে ললিত।

—কোন চিন্তা নেই দাদাবাবু, আপনার নেশা আজ ভালো ভাবে জমিয়ে তবে ছাড়বো! নিন—চট্‌পট্‌ খেয়ে ফেলুন। বলে আশা ললিতের হাতে ডিসটা তুলে দিলে।

—কিছু খেয়ে আবাব মদের গ্লাস ধরলে যদি বমি হয়'

—হয় হবে, সে বমি আমি নিজের হাতে পরিষ্কাব করবো।

খাওয়া শেষ করে রতিপতি বললে, এ তো হলো জলযোগ, এরপর আসল খাওয়াব পালা শেষ হবে গোলযোগেব মধ্য দিয়ে!

—গোলযোগ কেন হবে রতিপতি?

—হবে না! শেষ বোতল যখন শেষ হবে তখন ক'টা লোকের খাওয়ার অবস্থা থাকবে বল? এ পড়বে ওব ঘাড়ে, ও পড়বে তার ঘাড়ে—মানে, এই রকমই আজ পর্য্যন্ত দেখে আসছি কিনা! ব'লে রতিপতি একটা সিগারেট ধরালে।

—অতটা বেহেট হ'য়ে না খেলেই চলবে!

—ও কথাটা তুমি যেমন বোঝ, তোমার মত বুঝি আমরাও পাচজন। বেশী বোঝদার হওয়ার ফলেই তো মাত্রা ঠিক থাকে না, মানিক!

ম'কার জাতীয় পদার্থের এমনি মহিমা যে আচ্ছা-আচ্ছা বোঝদার মানুষকেও একেবারে ভুট্টা বানিয়ে ছেড়ে দেয়। মদ আর মেয়েমানুষ তার মধ্যে অন্যতম!

—আমরা কি পদার্থ বিশেষ! কৃত্রিমক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে রাজু।

—তার প্রমাণ শিয়ালদ' আর হাওড়ার ষ্টেশন। ট্রেনগুলি যখন আসে তখন দাঁড়িয়ে থেকে দেখো—আমার কথা কতখানি সত্যি। মেয়েছেলে জাতটা পদার্থ কি অপদার্থ—তাহ'লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

ললিত হাতখানা রতিপতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, কন্‌-গ্রাচুলেশন্‌!

রাজু ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বললে, মেয়েছেলে জাতটাকে তোমরা গালাগাল দিতেও ছাড়ো না—অথচ এই মেয়েছেলে জাতটা নইলে তোমাদের এক মুহূর্তও চলে না।

—ভাইস-ভার্সা। আমাদের নইলেও তোমাদের একমুহূর্ত চলে না। এঃ বোতল যে খালি!

আলমায়রা থেকে এক বোতল বিলাতি মদ আশা বার করে দিলে। রতিপতি নীরবে মদ বিতরণে মন দিলে।

নিরঞ্জন বললে আশার দিকে চেয়ে, এরই মধ্যে আজকের আসরটা কেমন যেন ঝিমিয়ে এলো!

আশার বদলে উত্তর দিলে নন্দ। নন্দ বললে, গানের বদলে গাল দিয়ে কি আর মদের আসর জমানো যায়! গান নেই, বাজনা নেই শুধুই ঠোক্‌রা-খকরি ঠেসা-ঠেসি! এ সব কি আর ভাল লাগে—না মদের মুখে বরদাস্ত হয়।

—তা দিন না দিদি—আপনিই আসরটা জমিয়ে দিন না! অনুরোধ করলে নিরঞ্জন।

নিরঞ্জনকে সমর্থন করলে স্বয়ং বাড়ীওলা মহাদেব এবং আর আর সকলে।

নন্দর উৎসাহ বেড়ে গেল। সে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে রতিপতির উদ্দেশ্যে বললে, ধরতো ভাই তবলাটা।

সবাই আর এক পেগ ক'রে টেনে নিলে। গান সুরু হয়ে গেল।

"আমার এই আম বাগানে
ফলেছে আম টাকায় জোড়া,
এ আঁটির চারা নয়রে যাদু—
প্রাণ নাথের কলম-করা॥
যে বাগান ক'রেছিল—
(ওগো) জন্মভোর নাহি র'ল
ছোট আম বড় হলো—
মবে গেল মালি ছোড়া॥"

আগামী কাল সত্যনাবায়ণের সিন্নি।

গৌরীর আজ নিবামিষ। বাড়ীব আর সবাই মাছ খেলে—খেলে না শুধু গৌরী। বামুনমেয়ে তাব জন্য পঞ্চব্যাঞ্জন নিরানিষ তবি-তরকারী রান্না করলে।

সত্যনারায়ণের পূজোয় কি কি লাগে তা গৌরীর কণ্ঠস্থ। বদনকে দিয়ে ফর্দ্দ করিয়ে তাকে গৌরী তাড়া দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলে। শুধু ফর্দ্দ করিয়ে তার যেন তৃপ্তি হলো না, সে এক জিনিষের কথা পঞ্চাশ বার ঘুরে ফিরে বদনকে স্মরণ করিয়ে দিলে পাছে তার ভুল হয়। ভুল হ'লেই সর্বনাশ! পূজোর ঘটবে অঙ্গহানি। পূজা পর্ব সম্বন্ধে গৌরীর দুর্বলতা অসীম। গুরু এবং পুরোহিত তার কাছে জীবন্ত দেবতা। তাকে তুমি দু'ঘা মারো তা সহ্য করবে কিন্তু গুরু পুরোহিত সম্বন্ধে কোন রকম অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। চেঁচিয়ে, কেঁদে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়বে।

পূজোর দিন ভোরে উঠে গৌরী ট্যাক্সী ডেকে গেল গঙ্গাস্নানে। সঙ্গে গেল ঝি! ফিরে এসেই দস্তুরমত চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে। সম্পূর্ণ অর্থহীন চেঁচামেচি, কেন চেঁচামেচি—কিসের চেঁচামেচি—তার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

প্রথম ঝালটা গেল বামুন মেয়ের ওপর দিয়ে। কেন এত বেলা অবধি আঁচ দেওয়া হয়নি। অথচ আঁচ এত সকালে কোনদিনই দেওয়া হয়না। দ্বিতীয় ঝালটা গিয়ে পড়লো নবাগতা পিসীমার ওপর। না হ'য়েছে পূজার যোগাড় আর না হয়েছে ফল কুচোনো! অথচ অন্যকে দিয়ে ফল কুচোনোয় কোনদিনই গৌরীর তৃপ্তি হয় না। ভুক্তভোগীরা জানে গৌরীর প্রকৃতি তাই তারা ও সব কাজে হাত দেয় না, ফলের টুকরো এক সাইজ না হয়ে ছোট বড় হলেই গৌরী গর্জে উঠবে। তার চেয়ে দূরে থাকাই ভালো।

তারপর গৌরী পড়লো ঝিয়ের ওপর। নিশ্চয় 'মেয়ে' পায়রা গুলোকে দানা দেয়নি—নইলে ওরা কখনো এতজোরে বাক্-বাকুম-কুম করে।

ন্যায় হোক, অন্যায় হোক তোড়ের মুখে সে অবিশ্রান্ত ভাবে ব'লে যাবে। এই ভাবে সময়ে অসময়ে বকে যাওয়াটা তার একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এ সময় কেউ যদি প্রতিবাদ করে তবে তার আর রক্ষা নেই! যারা তাকে চেনে তারা সেই সময় এ .ক কোন কথা বলে না, মুখটি বুজে সহ্য করে।

আসলে মেয়েটা খারাপ নয় গৌরী। দিলটা তার খুবই ভালো দোষের মধ্যে সে একটু হাউ-হেয়ে। বাড়ীওলা মহাদেব ঠাট্টা করে, বলে—মা-মনসার মাথার খিল গোটা কয়েক আলগা আছে। গৌরীকে রাগাবার জন্যে মহাদেব মাঝে মাঝে তাকে মা-মনসা ব'লে থাকে।

—আচ্ছা বদন, ঠাকুরের বাসন-কোসনগুলো উপুড় ক'রে রাখতে হয় তো! এতক্ষণে জল ঝরে যেতো। ফল-পাকুড়গুলোর গতি কতক্ষণে হবে—কে জানে। বামুনঠাকুর এসে বসে থাকবে, থাকে

থাকবে—আমি আর কি করবো। একটা মানুষ তো আর সাতটা হতে পারি না। মরুকগে—চুলোয় যাকগে সব।

দামী গরদের শাড়ী পরে সদ্যস্নাত নন্দ এসে হাজির। পূজোর যোগাড় দেবার জন্য আগের দিন গৌরী তাকে বলে রেখেছিল। সিন্নির যোগাড় ব'লে কথা।

বঁটি পেতে নন্দ ফল কুঁচুতে বসলো। বললে সে স্তূপীকৃত ফলের দিকে চেয়ে. এ যে ফলের পাহাড়! কত লোককে প্রসাদ দিতে হবে শুনি?

—তা প্রায় শতাবধি হবে।

—এ তো দেখছি দুশো লোকের আয়োজন!

নন্দর মন্তব্যে যেন ব্যথিত হলো গৌরী। বললে, তা হোক ভাই। যার কল্যাণে পাচ্ছি তার পূজো একটু ভাল কবে করবো না। এ তো মা লক্ষ্মীরই দেওয়া ভাই, আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র। আচ্ছা, এ বড় পাথবের খোরাটায় সিন্নি গুললে হয় না?

পাথর বাটিটার আকার দেখে হেসে ফেললে নন্দ। বললে, ওতো একটি ছোট-খাটো পিপে বিশেষ। ডাবাও বলা যায়। দরকার হলে ঘোড়াতে দানাও খাবে আবার গরুতে খাবে জাব।

—ছিঃ ঠাকুর দেবতাব পাত্র নিয়ে ইযারকি ঠাট্টা কবতে নেই। ওঃ রাজুর বুঝি এই আসবাব সময় হলো। আমি একা নাটা-ঝাপটা খেয়ে মরছি আর তোবা—

গৌরীর মুখেব কথা কেড়ে নিয়ে বললে বাজু, কি করতে হবে দেখিয়ে দিয়ে তুই মুখটি বুজে চুপ ক'রে বসে থাক্। আমরা তোব পূজোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—আজ কিন্তু তোদের দুজনকে এখানে খেয়ে যেতে হবে।

নন্দ বললে, ও সব ফাঁকি আমরা বুঝি! আজ সিন্নি—তোমাব বাড়ী নিরামিষ। নিরামিষ আমরা খেতে যাবো কোন্ দুঃখে, আমরা

হচ্ছি জন্ম এয়োস্ত্রী। মাছ, মাংস করে আমাদের নিমন্ত্রণ খাওয়াতে হবে। কি বল রাজুদি— !

—নিশ্চয়! তুই ভাই বরং গিয়ে তোদের রান্না-খাবার ব্যবস্থা করগে যা। তোদের বামুন-মেয়ে—ঐ দেখ—আঁচে কয়লা দিচ্ছে আর পাথা টেনে টেনে হাত ব্যাথা করছে।

—ও মা! মেয়ে বুঝি এখনো ভাঁড়ার বাব ক'রে রান্নার যোগাড় দেয়নি!

—কেমন ক'রে দেবো মা! তোমার হুকুম না পেলে তো আর কোন কাজ করতে পারি না। শেষকালে হিতে বিপরীত ঘটে যাবে! মেজাজ বুঝে তো আমায় কাজ করতে হবে! মেয়ে বললে তার কথাব সুরে হুল মিশিয়ে।

দেখো মেয়ে! তুমি আজকাল বড্ড মুখে-মুখে কথা বলতে আরম্ভ করেছো। আমি না তোমার মনিব! বললে গৌরী বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে।

—সে কথা আব কে অস্বীকার কচ্ছে মা! ভগবান তোমায় মনিব ক'বে পাঠিয়েছে তাই তুমি মনিব, আর আমায় ভগবান তোমাদেব দোবে খাটতে পাঠিয়েছে তাই আমি ঝি।

মাবমুখী হ'য়ে গৌরী বললে, ফেব মুখে মুখে জবাব কচ্ছো!

নন্দ মাঝে পড়ে বললে, আঃ তুমিই একটু থামো না বাছা! কথা বাড়ালেই বাড়ে। তা ছাড়া মনিবেব সঙ্গে সমানে সমানে উত্তর ক'বে যাওয়াটাই কি ভাল!

—সত্যি কথা। মনিবরা অমন দু'পাঁচ কথা বলেই থাকে! বললে রাজু।

—বেশ মা—বেশ! ভগবান আমাকে সহ্য করতে পাঠিয়েছে আমি সহ্য করেই যাই। ব'লে চাল বাছতে বসলো।

—এটা চাল বাছবার সময় নয়। ও কাজ অন্য সময় করলেও চলবে। আগে কুটনো কুটে দাও। একটা যদি বুদ্ধি-সুদ্ধি তোমার

ঘটে আছে বাছা! বাপরে-বাপ্ যে দিকটা না দেখবো—সে দিকটা আর হবার উপায় নেই। কাজের নেই একটা লোক, শুধ্ আছে সব মাথা ভরা রাগ। ওগো বামুন-মেয়ে। শোন বাছা কি কি রাঁধবে। চুলটা ঠিক করতে করতে বলি—এসো আমাব ঘবে। বলতে বলতে গৌরী নিজের ঘবে গিয়ে ঢুকলো।

পূজার যাবতীয় যোগাড় করে নন্দ ডাক দিলে. কৈ লো গৌবী! তোর পুরুতঠাকুর এলো।

—না ভাই—এখনো তো ঠাকুরমশাইয়েব দেখা নেই। বললে গৌরী রেডিওর বোতাম টিপতে টিপতে।

অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও। এবার আপনাদেব দেহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি গান শোনান হচ্ছে,—'ডাক দেখি মন হবি বোলে!' গান-খানি রচিত হ'য়েছে সম্ভবতঃ বাঙলা ১২৭১ সালে। বচয়িতা—ধর্মনন্দ মহাভাবতী।

"ডাক দেখি মন হরি বোলে।
পেয়েছো মানব জনম, ও ক্ষেপা মন.
বলবি কি নাম সময় গেলে॥
ভাই বন্ধু দারা সুত—
কেহ নয় বশীভূত.
তাসিয়ে রবিসূত ধরবে যখন চুলে।
তারা তখন থাকবে কোথা—
কেবা মা তোর কেবা পিতা, শুনবে মন।
আমাব কথা, বদ্ধ হোস নে মায়া জালে।
ব্যাধিতে করবে জরা,
ছাড়লে প্রাণ বলবে মড়া,
পরিবার দেবে 'ছড়া', ভেসে নয়ন জলে।
যত দেখ আত্ম বন্ধু ভাই,
এরা মিলে মিশে তোমায় সবাই,
এ দেহ করবে ছাই, পোড়ায়ে তোমায় অনলে।"

গান শুনতে শুনতে ড্রেসিঙ্ টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে গৌরী চুলটা ঠিক করে নিচ্ছিল, আয়নার ওপর ছায়া পড়তেই সে ফিরে দাঁড়াল। সামনা সামনি হতেই অরবিন্দু মিলিটারী কায়দায় সেলাম দিলে।

—তুমি! এ সময়!

—হ্যাঁ—, অফিস পালিয়ে।

—তা তো পোষাকেই মালুম। ওমা—পিছনে উর্দ্দীপরা—ও আবাব কে! বলতে বলতে বুকের অর্দ্ধ-স্খলিত আঁচল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করলে গৌরী।

—ও আমার আরদালী জাহাঙ্গীর। কেন—তুমি তো ওকে চেনো। কতবার ওর হাত দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি। ব'লে অরবিন্দু কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে বেখে সাহেবী কারদায় পা লম্বা কাব দিয়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলে।

—ওকে কেন এনেছো, আজ যে আমার সত্যনারাণের সিন্নি।

—ভয় নেই, ও তোমার ঠাকুরঘরে ঢুকে ফুলও ফেলবে না আর যষ্ঠিতে কাঠিও দেবে না। বদনকে বল—ওর হাত থেকে ফল আর সন্দেশের চ্যাঙারিটা নিক। তুমি নিজের হাতে দু'টাকা বখশিস দিয়ে ওকে বিদেয় কর! ব'লে অরবিন্দু দুটো টাকা গৌরীর হাতে দিলে।

টাকা নিয়ে গৌরী ঘরের বাইরে এলো। অরবিন্দু একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে গলাব টাইটা আলগা করতে লাগলো।

রেডিওতে তখন সেতার বাজনা হচ্ছিল। গৌরী আগেই কমিয়ে দিয়ে গেসলো, অরবিন্দু উঠে বোতাম টিপে সুইচটা অফ্ ক'রে দিলে।

গৌরী একটি কাগজে মোড়া বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, হ্যাঁ-গা, ফল মিষ্টির সঙ্গে এটা কি!

—ওটি হচ্ছেন হোয়াইট লেভেল! ওকি, মুখটা অমন কালো হ'য়ে গেল কেন? বুঝেছি—! তা—হাঁা—আমার বাহনটিকে

বিদায় করেছো ? ব'লে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অরবিন্দু গৌরীর দিকে চাইলে।

গৌরী নীরব। মুখখানা তার ভারাক্রান্ত।

—জাহাঙ্গীরকে একটূ জল-টল খেতে দিয়েছো তো!

—তোমার একটু—মানে ইয়ে নেই। মোছলমানকে কিসে খেতে দেবো শুনি

অম্লান বদনে অরবিন্দু বললে, কেন—ডিসে!

—সেই ডিস আবার আমি ধুয়ে মুছে ঘরে তুলবো! তাতে তুমি খাবে ?

—নিশ্চয় খাবো। বার বা রেঁস্তোরায় যে সব ডিসে আমরা খাই তা কি শুধু ভাট পাড়ার ভট্টাচার্যি বামুণেরই উচ্ছিষ্ট—? নাঃ আজও পর্যান্ত তোমার জাতের বালাই ঘোচাতে পারলাম না।

মুখ মচকে গৌরী বললে, তোমাব মত লোকের ছায়া মাডালেও পাপ হয়।

—নিশ্চয় হয়। আমি যে জাতে বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বামণেব ছায়া যদি শুদ্দুব মাডায় তবে তার পাপ হওয়া 'নিশ্চয়ই স্বাভাবিক'।

অরবিন্দুর কথা বলার ধরণে হাজাব চেষ্টা সত্বেও না হেসে থাকতে পারলে না গৌরী। তা ছাড়া হাসিটা তার মজ্জাগত অভ্যাস। কারণে অকারণে সে হাসে—খোলা হাসি হাসে, শুধু হাসে না—কাঁদেও, চোখ দিয়ে এক লহমায় জল গড়িয়ে পড়ে—সে জল কষ্টসাধ্য নয়।

—তা জামা কাপড় ছাড়বে—না সাহেব সেজেই বসে থাকবে! বললে গৌরী।

—অফিস পালিয়ে এসে পড়েছি যখন—কাপড় আমায় ছাড়তেই হবে, তবে কাপড় নয়—প্যান্ট!

—দিললাগি করার সময় নেই, এখুনি আমার পুরুত এসে পড়বে। ব'লে গৌরী এক হেঁচকায় অরবিন্দুর গলার টাইটা ছিনিয়ে নিলে।

—উঃ আর একটু হ'লে গলায় ফাঁস লেগে যেতো!

সার্টের বোতামগুলো সোফার পাশে বসে খুলতে খুলতে গৌরী বললে, কেন যে ও ছাই পাঁশগুলো গলায় বাঁধো তা তো বুঝি না! কি যে বাহার খোলে তা তোমরাই জানো। নাও—এইবার বালিশের খোলটা ছাড়ো।

—মদের বোতল খোলা না হ'লে পোষাক আমি খুলছি না।

—তা আমি খুলে দিচ্ছি কিন্তু খেতে আমাকে আজ বলবে না।

—আজ বছর সাতেক তোমার ঘরে আসছি। অন্য কিছু বুঝি আর না বুঝি—শুধু এইটুকু বুঝেছি যে নিষ্ঠাটুকু তোমার এক চেটে। অতএব মদ খাওয়ায় আজ তোমার ছুটি!

—তা আর বুঝিনি, রাক্ষস পেটে একা গিলবে তাই তো—

পর্দার বাইরে থেকে ঝি বললে, মা! পোরুতমাশা এসে গেছে।

হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি গৌরী বাইরে বেরিয়ে এসে পায়ের ধূলো নিলে। ঝি জলের ঘটি নিয়ে এলো। গৌরী নিজের হাতে পুরোহিত মশাইয়ের পা ধুইয়ে দিলে। আঁচল আর নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিলে তাঁর পায়ের জল। পূজোর ঘরে গিয়ে একটি আসনের ওপর বসে পুরোহিত ঠাকুর বিড়ি ধরালেন।

—তোমাদের যোগাড়-পত্রের আর কত বাকি? একগাল ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরমশাই।

—এই দুধটা এলেই হয়।

ঝি একটা সিগারেট এনে ঠাকুরমশাইয়ের হাতে দিলে।

—সিগরেট! তা বিড়ির চেয়ে সিগরেটটাই লাগে ভালো। তা ছাড়া বিড়ি খাওয়ার আর এক বিপদ হচ্ছে দেশলাই। একটা বিড়ির পিছনে লাগবে চোদ্দগণ্ডা দেশলাই। আর এক কাঠিতেই সিগরেট ফরসা। তাই তো—দুধের আর কত দেরী?

গৌরী বললে নম্র কণ্ঠে, বদন দুধ আনতে গেছে, এলো ব'লে। সত্যনারায়ণ বলে কথা—যাকে বলে কাঁচা খেকো দেবতা! বদন

সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দুধ দুইয়ে আনবে। বলা যায় কি পুরুতমশাই —দুধে এককোঁটা জল মেশালে ওদের আর কি বলুন না, পাপ যা হবে তাতো আমারি! ও মেয়ে—! পুরুতমশাইকে আব একটা সিগারেট এনে দাও।

—একটা একটা ক'রে আর কাহাতক কষ্ট করবে, তার চেয়ে একটা প্যাকেটই দিয়ে যাক। দেশলাইও মা একটা দিতে বল, আমার দেশলাইয়ের কাঠি প্রায় ফুরিয়ে এলো। তোমাদের লক্ষ্মী গো —গাইয়ে লক্ষ্মী! ব'লে পুরুতঠাকুর সিগারেটে একটা সুখ টান দিলেন। টানের বহর দেখে মনে হয় যে ঠাকুরমশাই একজন পাকা গঞ্জিকা সেবী।

—কেন, কি হয়েছে লক্ষ্মীর? জিজ্ঞেস করলে নন্দ।

—হয়নি কিছুই, তবে যজমান যে এতটা কেপ্পোন হয় তা আমাব আগে জানা ছিল না। দুটি কাঠি চাইলাম তো গণে দিলে মাত্তোব গোটা দশেক কাঠি। কেন্‌রে বাপু—একটা গোটা দেশলাই কি ইচ্ছে করলে দিতে পাত্তিস না। কি আর বলবো বাছা, এরি নাম ঘোর কলি। গুরু পুরোহিতের ওপর লোকেব ভক্তি-শ্রদ্ধা একদম কমে গেছে। আমার এই গৌরী মায়ের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করতে এ যুগে খুব কমই দেখা যায়।

—ছিঃ ছিঃ একি কথা বলছেন পুরুতমশাই। আমি হচ্ছি কীটানু কীট, ভক্তি শ্রদ্ধার আমি কি জানি বলুন।

গৌরীর কথা শেষ হতে না হতে বাইরে থেকে বদন ডাকলে, বড়দি! একবার বাইরে এসো!

গৌরী বাইরে আসতে বদন তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ কবে কি যেন বললে। গৌরী হন্ত-দন্ত হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে অরবিন্দুর উদ্দেশে বললে, সব্বোনাশ হয়েছে। বদন এসে বললে—গাই বেলা তিনটের আগে দোয়া হবে না! এখন উপায়?

—কিসের উপায়? মদের বোতল খুলতে খুলতে বললে অরবিন্দু।

—তুমি তো বেশ আছো! পুরুতমশাই যে চলে যাবে। তাঁর এখন পঞ্চাশবাড়ী পূজো সারতে বাকি। এখন আমি কি করি!

—তোমায় কিচ্ছু করতে হবেনা! আমার নাম করে পুরুতমশাইকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও। ব'লে অরবিন্দ নির্বিকার চিত্তে সোডা মেশালে।

—তুমি মদ খাচ্ছো। এ ঘরে কখনও তাঁকে ডাকতে পারি!

—তোমার পুরুতঠাকুরকে কেউ যদি আটকে রাখতে পারে তবে সে আমি! বেশী কথা বাড়িও না—চট্‌পট্ ডেকে দাও। ব'লে অরবিন্দু গেলাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে।

গৌরী চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দরজার পর্দ্দা একটু ফাঁক করে পুরুতঠাকুর বাইরে থেকে বললেন, আমাকে ডেকেছেন?

—আসুন! আসুন!! তাকিয়া ঠেসান দিয়েই ঢালা বিছানার ওপর থেকে অরবিন্দু তাঁকে অভ্যর্থনা করলে

একটু ইতঃস্তত করে নাকে উত্তরীয় দিয়ে পুরুতঠাকুর ঘরে ঢুকলেন।

বদন খেয়ে উঠতে গৌরী তাকে আবার পাঠালে গয়লার বাড়ী। সসব্যস্ত হ'য়ে গৌরী তার ফ্ল্যাটে অর্থহীন চং কী ঘোরা ঘুরতে লাগলো। দুধ না আসা পর্য্যন্ত যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। না পাবারই কথা, পুরুতমশাই অন্যবাড়ী পূজো করতে একবার যদি বেরিয়ে যান তবে তাঁর ফিরতে যে বৈকাল পেরিয়ে যাবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হতে লাগলো —এই বুঝি পুরুতমশাই তার ঘর থেকে বেরিযে এসে বলেন, আমি এখন চল্লুম। ঘুরে আসবো।

বদন ঘুরে এসে বললে, আরো আধঘণ্টা!

গৌরী পূজোর ঘরে ঢুকে গালে হাত দিয়ে বসলো। প্রায় তার

তখন কাঁদবার পূর্ব অবস্থা। গৌরীর অবস্থা দেখে বেচারা বদন আবার ছুটলো গয়লার বাড়ী ধন্না দিতে।

নন্দ জিজ্ঞাসা করলে, সিন্নি মাখবে কে—ঠাকুরমশাই?

—মাইরি বলছি! বাবা তারকনাথের দিব্যি—আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। দুধ না পেলে সিন্নি মাখা হবে কি আমার মাথা দিয়ে!

—আঃ সব তাতেই তোর বড্ড বাড়াবাড়ি! এত হা-হুতাশ না ক'রে সকালে দুধ নিয়ে রাখলেই পাত্তিস। বাদামের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে বললে রাজু।

—তাই তো ভেবেছিলুম কিন্তু মহাদেবদা যে বারণ করলে। বললে—সকালের দুধ কেটে যাবে। দাঁড়া ভাই—পুরুতমশাই পালিয়ে গেল কিনা দেখে আসি। ব'লে ঘর থেকে বেরুতে যাবে গৌরী—বদন এসে সামনে দাঁড়ালো, হাতে তার দুধের বালতি।

—দুধ পেয়েছিস ভাই! আঃ বাঁচলুম! যা—যা—পুরুত-মশাইকে ডাক। বদনের হাত থেকে দুধের বালতি নিয়ে গৌরী পূজোর ঘরে ঢুকলো।

সিগারেট টানতে টানতে বেশ প্রফুল্ল মুখেই পুরুতমশাই এসে পূজোর ঘরে ঢুকলেন। বললেন স্মিত হাস্যে, না আজ আর কোথাও পূজো করতে যাওয়া হ'য়ে উঠবে না। গৌরী মায়ের পূজো সারতেই সাঁঝের বাতি জ্বলে যাবে। ও ঘরে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি, তোমার বদনকে দিয়ে আমার ভাইপোর কাছে পাঠিয়ে দাও তো মা, অন্য বাড়ীর পূজোগুলো সে-ই সেরে ফেলুক।

—এই যে বাবা, আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি! বলতে বলতে হাসিমুখে আস্ত-ব্যস্ত এসে তার ঘরে ঢুকলো।

—এই যে—বাবা মনসা—! ব'লে অরবিন্দু গ্লাসটা শেষ করে ট্রের ওপর নামিয়ে রাখলে।

মনসা বললে—মাইরি বলছি—বাবা তারকনাথের দিব্যি—মা কমলার দিব্যি—রাগারাগি হ'য়ে যাবে কিন্তু! হ্যাঁ গা—তুমি যে

মদ খাচ্ছো—পুরুতমাশাই কিছু বললেন না? সোফার একধারে বসে পড়ে বললে গৌরী।

আবৃত্তির সুরে বললে অরবিন্দু,

"মোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিও না অনুযোগ,

তাঁরও আছে হায় আমারি মত সুরা মত্ততা রোগ।"

—হ্যাঁ গা—কি ক'রে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলে? আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বললে গৌরী।

আলাদা একটা ভর্ত্তি মদের গ্লাস গৌরীর সামনে তুলে ধরে অরবিন্দু বললে, বলেছি আগেই—'তাঁরও আছে হায় আমারি মত সুরা মত্ততা রোগ।'

—তার মানে?

—এই মদের লোভে তিনি এতক্ষণ বসেছিলেন। পূজো সারা হলেই—

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে গৌরী বললে, পুরুতঠাকুর মদ খান!

—উনি যে শাক্ত। শক্তির আরাধনা করতে হলে ও জিনিষটা চাই নইলে আরাধনার অঙ্গ হানি হয়।

—উঃ তুমি সব করতে পারো!

—তা না পারলে তোমার পুরুতঠাকুর এতক্ষণে হাওয়া হয়ে যেতেন। যাকগে—তোমার সত্যনারায়ণের কিছু ফল-পাকুড় নিয়ে এসো না—মদের মুখে লাগবে ভাল!

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ যা মুখে আসে তাই বল। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ইয়ারকি। নাঃ তোমার চার পো হ'য়ে এসেছে। মাইরি—বাবা তারকনাথের দিব্যি; আমার ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ে করলে হ'য়ে যাবে তোমার সঙ্গে আমার এক চোট হুঁ—তা কিন্তু ব'লে রাখছি। কৈ—দাও, চিঠিখানা বদনকে দিয়ে পুরুতমশাইয়ের বাড়ী পাঠিয়ে দিই।

—সে কাজ তোমার আসবার আগেই সারা হ'য়ে গেছে। হ্যাঁ—

একটা দরকারী কথা। পুরুতঠাকুর যে মদ খাবেন— এটা তিনি তোমার কাছে লুকোতে চান। অতএব পূজোর পর ওঁকে এঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি একটু অন্তরালে থেকো। কি ভাবছো— ?

—শেষ পর্যন্ত তুমি আমার পুরুতমশাইকে মদ ধরালে !

—আরে আমি কি ওঁকে মদ ধরাবো, আমার জন্মাবার ঢের আগে থেকে উনি মদ ধরেছেন। খোঁজ করলে দেখা যাবে—উনি আমার বাবার সঙ্গে মদ খেয়েছেন, হয়তো বা ঠাকুরদার সঙ্গেও,—মানে যাকে বলে—তিন পুরুষের ইয়ার !

—নাঃ তুমি একবারে গেছো। ব'লে উঠল গৌরী।

—কিন্তু তোমারও যে যাবার অবস্থা ! কখন জল খাবে, খিদেয় পেট তো তোমার বাপন্ত করছে।

—যাঃ পূজোর আগে ও কথা বলতে নেই। কষ্ট আব কিছু নয় শুধু মাথাটা একটু ঘুরছে।

—খিদে পেলে অমন আমারও হয়। যাক্‌গে—এক কাপ চা খেলেও তো পারতে !

—কি যে তুমি বল ! চা খেয়ে বাবা সত্যনারাণের উপোস করবো !

—নিশ্চয় করবে !

বাইরে থেকে ঝি বললে, ও মা। পুরুতমশাই ডাকছে। জিজ্ঞেস কচ্ছে—কার নামে কি করবে !

—আর মদ খেয়ো না, তোমার নেশা হয়ে আসছে। ব'লে ক্ষিপ্রপদে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একা একা আর কাঁহাতক বসে মদ খাওয়া যায়। সঙ্গী নইলে নেশা ক'রে আনন্দ নেই। প্রেয়সী না থাকলেও দু'একজন রুচি-সম্পন্ন বন্ধু আশপাশে থাকলে তবু কতকটা শান্তি। ধ্যেৎ—এ রকম একা একা চিৎপাত হ'য়ে কড়িকাঠ গোণার চেয়ে বোটানিকাল গার্ডেনে গিয়ে বটগাছের ছায়ায় একা বসে দার্শনিক ব'নে যাওয়া

ঢের আরামপ্রদ! গৌরীর ওপর রাগ হয় অরবিন্দুর। কিন্তু অর্থহীন রাগ। সে বেচারীর-ই বা দোষ কি। অরবিন্দু আসবে বলে বেছে বেছে সে এই দিনটিতেই সত্যনারায়ণের পূজা ইচ্ছে ক'রে করেনি। আজ সংক্রান্তি। সংক্রান্তি পেরিয়ে গেলে আর কাছাকাছি দিন কোথা। শেষ পর্য্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়লো তার নিজের ওপর।

—নমস্কার ছোটবাবু। অনধিকার প্রবেশের জন্য অধমকে মাপ করবেন। আপনাকে 'দোকা' করবাব জন্য শ্রীমতী গৌরী আমায় পাঠিয়ে দিলে। বসতে আজ্ঞা হোক। বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে ঘবে ঢুকে জোড় হাত করে দাঁড়াল রতিপতি ম্যাটিনের ওপর।

রতিপতির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অববিন্দু জড়িত কণ্ঠে বললে, হুঁ—বস। তুমি দেখছি আজ রঙে আছো।

জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলে রতিপতি, হুঁ—তা একটু আছি।

নীরবে অরবিন্দু দু'গ্লাসে এক এক পেগ মদ ঢাললে। মদে সোডা মিশুতে যাবে—রতিপতি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো, উঁহুঁ—আমি ব' খাবো। দেখছেন না গলার অবস্থা।

—গলাটা তোমার ধরা-ধরা মনে হচ্ছে।

ব' মদটা গলায় ঢেলে দিয়ে রতিপতি বললে, গলাব আব অপরাধ কি বলুন! কসরৎ তো কম হচ্ছে না!

কোন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু নেত্রে অরবিন্দু ওব মুখের দিকে চাইলো।

—ভাবছেন বুঝি—গান বাজনা খুব জোব চালিয়েছি। মোটেই নয় এখন আমি পতিতা-সমাজ-সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত।

হেসে ফেললে অরবিন্দু। বললে, তুমি দেখছি রাজা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় সংস্করণ!

—ঠাট্টা নয় ছোটবাবু! এদের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে আমি এখন মাথা ঘামাচ্ছি।

একটা সিগারেট ধরালে অরবিন্দু। তাকিয়াটা পাশ থেকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে দু'কনুয়ের উপর ভর দিয়ে গদিয়ান হ'য়ে বসে বললে, যথা!

—পতিতা সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা একটা সমিতি করেছি। নাম—পতিতা তারণ সঙ্ঘ।

—সঙ্ঘের কাজ বা উদ্দেশ্য?

—উদ্দেশ্য অতি মহৎ! এরাও যে মানুষ—এদেরও আছে সাধারণ মানুষের মত সুখ, দুঃখ, —সমাজের এরাও একটা অংশ; এই সহজ সত্য কথাগুলো মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ। দিন—সিগরেটের টিনটা এগিয়ে!

—হুঁ—তারপর?

—কিন্তু যাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের এই অভিযান তাদের মধ্যে নেই একতা। তাদের মধ্যে একতা আনতে না পারলে—তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে না পারলে সব কিছুই হবে আমাদেব পণ্ডশ্রম। ব'লে একটা সিগারেট ধরালে রতিপতি।

এতক্ষণ ব্যাপারটার ওপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেনি অরবিন্দু, সে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিয়েছিল। রতিপতির কথা বা যুক্তিকে এখন আর মাতালের মত্ত-প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দিতে পারলে না, তার কথার গুরুত্ব কতকটা যেন অরবিন্দু বুঝতে পারলে। বললে, তা কি ভাবে তোমরা কাজে অগ্রসর হচ্ছো?

—পট্টিতে পট্টিতে ওদের হাতে পায়ে ধরে জমায়েত কবে বক্তৃতা দিচ্ছি। দিচ্ছি ওদের প্রকৃত অবস্থাটা ওদের ভালভাবে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে। শুধু কি তাই, কাগজের সম্পাদকের হাতে পায়ে ধরে প্রবন্ধ লিখছি ওদের নিয়ে। সমাজকে বোঝাতে চেষ্টা কচ্ছি যে—এদের উচ্ছেদসাধন করলে সমাজের মঙ্গল হবে না। সমাজ একটা বড় বাড়ী—এরা তার নর্দ্দমা। নর্দ্দমা না থাকলে বাড়ীর বাসীন্দাদের স্বাস্থ্য খারাপ হবে, ছাদ ধসে পড়বে, ভিত্তি বসে যাবে

মাটির তলায়। প্রত্যক্ষভাবে না পারলেও পরোক্ষভাবে এদের প্রশ্রয় না দিলে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

—এ হচ্ছে তোমাদের—বিষ-গাছকে বাঁচিয়ে রেখে তার ডালপালা ছেটে গাছকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা! বিষ-গাছের মূল শিকড় উপড়ে না ফেললে গাছ মরবে না।

—আহা-হা, আমার কথাটা আপনি ঠিক ধরতে পারছেন না ছোটবাবু! সমাজ বা বর্তমান শাসক সম্প্রদায় চাইছে ওদের দাবিয়ে রাখতে। কিন্তু দাবিয়ে রাখার ফল যে কি বিষময় হবে তা তাঁরা ভেবে দেখছেন না। পতিতা পল্লীতে পুলিশের প্রখর দৃষ্টি। তাদের রোজগারে পড়ছে বাধা। তাই পুলিশের হাত এড়াবার জন্যে তারা গোপনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে ভদ্র পল্লীতে। অর্থাৎ পুলিশ যেন ইচ্ছে করেই সমাজদেহে বিষাক্ত রোগের বীজাণু ইন্‌জেকসন করে সমাজের উন্নতির চেষ্টা কচ্ছে।

—পুলিশের ওপর তোমাদের দেখছি বেজায় গায়ের ঝাল!

সে কথায় কান না দিয়ে রতিপতি বললে, ব্যাপারটার গুরুত্ব কোথায় বুঝুন—, আইন পাশ ক'রে পতিতাদের সব পট্টি ছাড়া করলে—অবস্থাটা কি দাঁড়াবে! আমার মত লোকের অভাব সমাজে নেই। মেয়েমানুষের বাড়ী না গেলে রাত্রে যাদের ঘুম আসে না তারা তখন কি করবে? বাধ্য হয়ে তারা তখন পথে ঘাটে ভদ্র মেয়েছেলের পিছনে ধাওয়া করবে। ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে একবার ভেবে দেখুন!

—তোমাদের চিন্তাধারাটা গতানুগতিক, বহুদূরপ্রসারী মোটেই নয়! ব'লে বিজ্ঞের হাসি হাসলে অরবিন্দু।

বিরক্ত হলো রতিপতি। বললে, চিরকালটা আপনারা দার্শনিকই রয়ে গেলেন আর বড় বড় পুঁথি ঘেটে গাল ভরা কথা আওড়ালেন, আসল কাজের কাজ কিছুই করলেন না। অন্য কিছু করতে গেলে

হাসলেন উপহাসের হাসি। ধরুন,—আপনার বাড়ীর পাশে একখানা বাড়ীতে এসে উঠলো এক পতিতা। পট্টি ছেড়ে আপনারই পাড়ায় সে হলো স্থায়ী বাসিন্দা। পুলিশের হাত এড়িয়ে বেচারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভদ্রপল্লী—এখানে সহজে চলছে না পুলিশের ট্যাঁ—ফুঁ। এখানের কথা জেনে শুনেও ওঁদের কানে দিতে হয় তুলো আর চোখে দিতে হয় ধূলো! যাক্ সে কথা—, একদিন তিনি কপালে দিয়ে সিঁদূরের টিপ, সিঁথেয় দিয়ে সিঁদূর, মাথায় দিয়ে ঢলে-পড়া আধ-ঘোমটা—উঠলেন ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে বা বৈকালে শুকনো কাপড় তুলতে। ধরে নিন্—আপনার ছোট ভাইটিং তখন সবেমাত্র কলেজ থেকে এসে ছাতে গেছে একটু হাওয়া খেতে। আপনার ভাইটিও কিছু ভীষ্মদেব নন আর পাশের বাড়ীর ছাতের উনিও নন্ ভাট্পাড়ার ভট্চায্যিদের বৌ। চার চোখে চাওয়া-চায়ি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এইভাবে চললো কিছুদিন—ঠিক্ যেন মাসিকের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক উপন্যাসের 'ক্রমশঃ'। ক্রমশ স্থুরু হলো চোখের তারায় তারায় থেকে ঠোঁটের কোণে কোণে—দেখা হলেই সময়ে অসময়ে ফিক্ ফিক্ হাসি। তারপর দু বাড়ীর কার্নিসের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে কথা—চিঠি চালাচালি—তারপর যা হবার তাই। ছলে-বলে-কৌশলে নবাগতা আপনার ভাইটির করলেন মস্তক চর্বন!

অরবিন্দু বললে, পতিতা সমস্যা সমাধান করতে হলে সমাজের কাঠামো পুরো মাত্রায় বদলাতে হবে। তুমি আমায় ভুল বুঝো না রতিপতি, আমি বলতে চাই— সমাজকে এমনভাবে গড়তে হবে—সমাজের বিধিব্যবস্থা এমন নতুনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে পতিত ব'লে কেউ থাকবে না, অবশ্য থাকবে না কথাটা বলা ভুল—মানে কমে আসবে। গতদিনের পুরাতন পঙ্গু সমাজকে ভেঙে চুরে আবার নতুন ভাবে না গড়লে পতিতা সমস্যার কোনদিনই সমাধান হবে না। তোমরা যে পথ ধরে চলেছো—সে পথে গেলে না হবে

সমাজের কোন মঙ্গল না হবে পতিতাদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার কোন একটা প্রকৃষ্ট উপায়।

—সমাজ সংস্কার করার ক্ষমতা নিয়ে যারা জন্মায়—আমি তাদের মধ্যে একজন নই। কাজেই অনধিকার চর্চ্চা ক'রে অযথা সময় ও শক্তি ক্ষয় ক'রে কোনই লাভ নেই। অবশ্য আপনার মত আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু পথ আমিমেনে নিতেপাচ্ছি না—সে ক্ষমতা আমার নেই। এঃ—আলোচনাটা একেবারে গল্পে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখি --গ্লাস দিন। ব'লে রতিপতি মদ ঢেলে নিয়ে বোতলটা একপাশে সরিয়ে রাখলে।

—এই যে,—পুরুতমশাই এসে গেছেন; দাও রতিপতি—পুরুতমশাইয়ের হাতে গ্লাস দাও। উঁহুঁ—ও গ্লাস নয়, ও পাশে মদ ভর্ত্তি ঐ পাথরের গ্লাস! কাঁচের গ্লাসে উনি মদ খান না।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে পুরুতমশাই ঈষৎ চাপা গলায় বললেন, গৌরী মা এখন এদিকে আসবে-টাসবে না তো?

—তিনি এখন আপনার জলযোগের ব্যবস্থা কচ্ছেন।

গ্লাসটি মুখে তুলতে গিয়ে পুরুতমশাই বললেন, এতে সোডা-ফোডা দেননি তো? ও জলটা বড়ই ম্লেচ্ছ ভাবে তৈরী হয়, ঠিক শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

রতিপতির দিকে বঙ্কিম নয়নে একবার চেয়ে নিয়ে অরবিন্দু বললে ঠাকুরমশাইয়ের উদ্দেশে, আপনার ব্যথা কোথায় তা আমি বুঝেছি ঠাকুরমশাই। সারাদিন উপোসের পর র' নইলে আপনার ঠিক সানায় না, হাজার হলেও 'বনেদী' তো!

—আপনার কথাগুলি বড়ই অনুপ্রাস বহুল। ব্যাকরণ শাস্ত্রের মত বড়ই জটিল—বোঝা শক্ত। কথাতেই আছে—দ্বাদশ বর্ষেন ব্যাকারণম অধীত! এই জন্যেই আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে ছোটবাবু!

—ওটা টেনে নিয়ে কথা বলুন—শাস্ত্র ব্যাখ্যা লাগবে ভাল। আর আমাকেও আপনার লাগবে খুব বেশী ভাল।

—হ্যাঁ—গৌরী মা হয়তো আবার—, কথা অসমাপ্ত রেখে পুরুতমশাই গ্লাসের অৰ্দ্ধেকটা এক চুমুকে খালি করে ফেললেন।

অর্দ্ধ সমাপ্ত গ্লাসটা কোথায় রাখবেন—ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলেন না পুরুতমশাই। ঘরে তিন জন লোক—তিনটে গ্লাস দেখলে—অনুমানে গৌরীর বুঝতে বাকি থাকবে না যে পুরুতমশাইও এঁদেরই দলভুক্ত। মুস্কিল আসান করলে অরবিন্দু। সে ইসারায় দেখিয়ে দিলে সোফার পিছনটা। পুরুতমশাই গ্লাসটা যথাস্থানে রেখে একটা সিগারেট ধরালেন।

—চমৎকার জিনিষ ছোটবাবু। গন্ধেই প্রাণটা তর্ হয়ে যায়। ব'লে উত্তরীয় দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিলেন।

রতিপতি এতক্ষণ নীরবে উভয়ের কথাবার্তা শুনছিল। পুরুত-মশাইয়ের কথা শুনে উপভোগের হাসি হাসলে। বললে, পুরুত-মশাইয়ের তাহলে আগেই ঘ্রাণে অৰ্দ্ধ ভোজনম্ হয়েছিল, পূজো সেরে এসে বাকি অর্দ্ধেক পূর্ণ করলেন।

—দেখুন—মদ খাচ্ছেন—মদ খান, ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়াবকি করবেন না। বলে ক্রোধ-রক্তিম নয়নে পুরুতমশাই সিগারেটে ঘন ঘন টান দিলেন।

—ওব কথা ছেড়ে দিন পুরুতমশাই। কথাতেই বলে—মাতাল, দাঁতালের ওপর আস্থা করতে নেই। রতিপতির ওপর বর্তমানে চটে যাওয়া মানেই আপনার ব্রহ্মণ্য তেজকে খর্ব করা।

অরবিন্দুর কথায় পুরুতমশাইয়ের মুখখানি খুসীতে ভরে উঠলো। হাই তুলতে তুলতে বললেন আপন মনে চোখদুটো ঈষৎ ওপরে তুলে, হরি হে মাধব।

স্মিত হাস্যে রতিপতি আপন মনে সুর ভাঁজছিল,—

'আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ।
দাদা গেছে গান শুনতে
বাবার কোলে বৌ॥
কথা কও না কেন বৌ—?
কথা কইবো কি ছলে—
কথা কইলে গা জ্বলে।'

—আচ্ছা ঠাকুরমশাই! মদ খাওয়া কি পাপ? সুর ভাঁজা বন্ধ করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠলো রতিপতি।

—কে বলে—কোন্ অর্বাচীন বলে মদ খাওয়া পাপ! মদের আর এক নাম 'কারণ'। কারণ বারি কালী পূজার অঙ্গ। শক্তির উপাসক যারা—মদ তাদের খেতেই হবে। কেন আগে কালের মুনি ঋষিরা বদ খেতো না! বলি বাপু—সোমরস পদার্থটি কি? আজকাল-কার হুইস্কি ব্রাণ্ডি ওর কাছে লাগে? বলে কিনা—মদ খাওয়া পাপ! কৈ--কোথা রাখলাম গ্লাসটা!

রতিপতি তাড়াতাড়ি গ্লাসটা সোফার পিছন থেকে বার ক'রে পুরুতমশাইয়ের সামনে ধরলে।

—আপনি একটা কি বলুন তো মশাই! সিগরেট খাওয়া এঁটো হাতে ধরলেন তো গ্লাসটা! নাঃ মদ খেলেই সব ম্লেচ্ছ হতে হবে—এর কি কোন মানে হয়। যাক গে—হরি হে মাধব! ব'লে মাধমের নামে পুরুতমশাই গ্লাসটি গলায় ঢেলে দিলেন।

—আচ্ছা ঠাকুরমশাই! বেশ্যাবাড়ী আসা কি পাপ?

—কৌটো থেকে একটা সিগরেট দিন তো! দীর্ঘ শীর্ণ হাতখানি কৌটোর দিকে প্রসারিত ক'রে বললেন পুরুতমশাই।

রতিপতির তথাকরণ।

সিগারেটে একটা 'রাম' টান দিয়ে পুরুতমশাই গম্ভীর চালে

বললেন, বেশ্যাবাড়ী আসাটা পাপ নয় কিন্তু বেশ্যাব কাছে আসাটাই পাপ।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন—যেহেতু আমরা বেশ্যার কাছে এসেছি সেই হেতু আমরা পাপী আর আপনি এসেছেন বেশ্যার বাড়ী সেই হেতু আপনি পুণ্যবান!

সম্পুর্ণ না হলেও কথাটা আপনার কতকটা সত্য। জানেন—আমাদের মত ব্রাহ্মণের এখানে পদধূলি পড়ে বলেই এদের দুয়াবেব মাটি লাগে দূর্গা পূজায়!

ঠাকুরমশাইয়েব অলক্ষ্যে অরবিন্দুর দিকে কটাক্ষ ক'রে হাসলে রতিপতি। বললে, সে অবশ্য সত্যি।

পুরুতমশাইয়ের জমি তখন বেশ তৈরী হ'য়েছে। অৰ্দ্ধ সমাপ্ত বোতলটির দিকে লোলুপ নয়নে চেয়ে তিনি তখন ঠোটেব ওপর জীব বুলোচ্ছিলেন। বতিপতির কথায় বিশেষ কান দিলেন ব'লে মনে হলো না।

পুরুতমশাইয়ের অন্তবের গূঢ় বাসনা বুঝতে বতিপতির বাকি রইলো না। পুরুতমশাইয়ের গ্লাসে হড়-হড় ক'রে সে বেশ খানিকটা ঢেলে দিলে। পুরুতমশাই খুসীভরা অন্তরে প্রতিবাদের সুবে ব'লে উঠলেন, আহা—হা আমায় কেন—আমায় কেন!

—কোন দ্বিধা করবেন না, আমি আলগোছে দিয়েছি। সসব্যস্তে বললে রতিপতি।

—রাধামাধব! বোতলে কোন দোষ নেই। পুকুরেব জল কি কখনও উচ্ছিষ্ট হয়! মানে বলছিলাম কি—বহু দিন তো অভ্যাস নেই, বেশী খেলে বেহেট হয়ে যেতে পারি। এটা তো বেশ্যাবাড়ী হিসাবে ধরলে অবিচার করা হবে, এটা হচ্ছে আমার যজমান বাড়ী। তা—তা—

লজ্জার খাতিরে গ্লাসটা ধরবেন কি ধরবেন না—ইতঃস্তত করছিলেন পুরুতমশাই।

রতিপতি বললে, একান্তই যদি না খান তাহলে ওটা নয় আমি প্রসাদ হিসাবে গলায় ঢেলে দিই!

অরবিন্দু কথা বললে, ধ্যেৎ তুমি কিস্‌সু বোঝ না। আরে এই তো সবে পুরুতমশাইয়ের বোধন সুরু হলো, এর পর হবে যথারীতি শাস্ত্র সম্মত ষোড়শ উপচারে পূজো। তুমি যে ছাই কি আবোল-তাবোল বক—তার কোন মানেই হয় না। তোমার নেশা হ'য়ে গেছে, আর খেয়ো না।

—হেঁ—হেঁ আমাদের ছোটবাবুর রসবোধ আছে, একেবারে রসরাজ। এমন গুছিয়ে রসসিক্ত ক'রে কথাগুলি বললেন—যেন সত্যিই বেদ পুরাণের কোন অংশ থেকে উদ্ধৃত করে বাংলা তরজমা শোনালেন। হরিহেমাধব! ব'লেইগ্লাসটিএক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করলেন।

— এক খিলি পান পেলে—বক্তব্য বিষয় শেষ না ক'রে পুরুতমশাই জিব দিয়ে ঠোঁট দুটো বুলিয়ে নিলেন।

পানের ডিবা অরবিন্দুর পাশে ট্রের ওপরই সাজানো ছিল, সে ডিবাটা খুলে তাঁর সামনে এগিয়ে ধরলে। পুরুতমশাই দু'খিলি পান তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে একটি বিড়ি বার ক'রে ভেঙে তার ভিতরস্থ মসলা হাতের চেটোয় নিয়ে খইনি টেপার মত টিপতে লাগলেন। বার কয়েক টেপার পর মসলাগুলি অন্য হাতের চেটোয় ঢেলে নিয়ে তার ওপর দুই থাপ্পোড় দিয়ে ধূলো উড়িয়ে দিলেন। তারপর মসলাগুলি ঢেলে পালগোছে গালে ফেললেন। চিবোতে চিবোতে মন্তব্য করলেন, একটু দোক্তা জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে না এলে তাম্বূল ঠিক মজে না।

পুরুতমশাইয়ের নেশা যত বেশী হয়—তাঁর কথ্য ভাষায় তত বাড়ে গুরুচণ্ডালী দোষ। এটা আর কিছুই নয়, অপর্য্যাপ্তভাবে সাধু ভাষায় বাক্যালাপ করার ব্যর্থ চেষ্টা। চেষ্টাটা খুবই স্বাভাবিক। মদ পেটে পড়লে ইংরাজি জানা লোকও প্রতি কথায় ভুল ইংরাজী বলে নিজেকে জাহির করতে চেষ্টা পান।

—আচ্ছা ঠাকুরমশাই! বেশ্যার নাম শুনলে বা তাদের ছায়া মাড়ালে আপনারা আঁতকে ওঠেন অথচ এই বেশ্যা জাতটা তো আপনাদেরই সৃষ্টি! বললে রতিপতি জড়িত কণ্ঠে।

—তার মানে? গর্জে উঠলেন পুরুতমশাই—যেন এক স্তূপ বারুদের মধ্যে পড়লো একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি।

রতিপতি মোটেই তর্জ্জন-গর্জ্জন করলে না। ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে, আধুনিক পতিতা সমাজের উৎপত্তি দেবদাসী থেকে। গত যুগে দেবতার মন্দিরে মন্দিরে থাকতো দেবদাসী। দেবতার চরণে উৎসর্গ করা হতো তাদের জীবন যৌবন। বোঝান হতো যে ঐ দেবতাই হচ্ছে তাদের ইহজনমের ধ্যান জ্ঞান, জীবন সর্বস্ব স্বামী। রক্ত মাংসেব দেহধারী কোন মানুষকে ভজনা করার অধিকার তাদের নেই, শুধু নেই নয়—মানুষকে ভালবাসা তাদের অপরাধ, পাপ, পরলোকে ঐ পাপের শাস্তি—অনন্ত নরক ভোগ।

—দেব উপভোগ্য দেবদাসীদের সঙ্গে আপনি আজকালকার পতিতাদের তুলনা কচ্ছেন এ সব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করাও মহাপাপ! পুরুতমশাই মুখখানি বিকৃত করে অন্য দিকে চাইলেঁন।

হাসলে রতিপতি। বললে, এই মাটির দুনিয়ায় পাপ থেকে উদ্ধার করতেও আপনারা আর পাপে ডোবাতেও আপনারা!

—পাপে ডোবাই—আমরা মানুষকে পাপে ডোবাই। দস্তুরমত ধমক দিয়ে উঠলেন পুরুতমশাই।

—দেব নাগরীতে লেখা শাস্ত্রের শুধু বাংলা তর্জ্জমা পড়লেই হয় না পুরুতমশাই, ইতিহাসের খবরও একটু আধটু রাখতে হয়।

—খুব সতর্ক হয়ে কথা বলুন রতিপতি বাবু! আপনি কি বলতে চান—আমি সংস্কৃতজ্ঞ নই!

আলোচনার মাত্রাটা ক্রমশঃ তিক্ততার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে অনুপাতে তাতে বাধা না দিলে আশু একটা কিছু অনর্থের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। অরবিন্দু হেসে ব্যাপারটা এমনি হালকি ক'রে

দিলে যে পুরুতমশাই তাঁর দ্বিতীয় রিপুর উত্তেজনার জন্য মনে মনে লজ্জিত হলেন।

অরবিন্দুকে মধ্যস্থ মেনে পুরুতমশাই বললেন, আচ্ছা ধরে নিন্ সংস্কৃত আমি জানি না কিন্তু ইতিহাস জানার আমার কোন্ প্রয়োজন? জাহাঙ্গীরের ক'টা বেগম ছিল, সাজাহান ভাত খেতো কি মোগলাই পরটা খেতো মুরগীর ঝোল দিয়ে, রাণা প্রতাপের ঘোড়ার ক'টা দাঁত ছিল, রিজিয়া কলমা পড়ে বিয়ে ক'রেছিল, কি কাকেও নিকে ক'রেছিল—এ সব জেনে আমার লাভটা কি? তা ছাড়া—আমাদের দেশের ইতিহাস লিখেছে তো বিদেশীরা। বিদেশীদের লেখা ইতিহাসকে যে বিশ্বাস করে—সে আমার মতে বিশ্বাসঘাতক!

—হুঁ—হুঁ, কে বলে ঠাকুরমশাই ইতিহাস জানেন না! এই তো ইতিহাসের একেবারে আদ্য-শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ, তিল কাঞ্চন করে ছেড়ে দিলেন। তবে বিদেশীর লেখা ইতিহাস যে বিকৃত—একথা তোমায় মানতেই হবে রতিপতি! তবে কিছুটা যে সত্যি নয়—এ কথা অবশ্য তোমায় আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না।

—চুলোয় যাক ও সব ইতিহাস-ফিতিয়াস। আমরা কেমন করে এই সব পতিতাদের সৃষ্টি করলাম সেইটে শুধু জানতে চাই! পুরুতমশাইয়ের কথার ভাবে বোঝা গেল—তিনি বেশ টর্-টবে মাতাল হয়ে উঠেছেন।

—ইতিহাস বলে—

গর্জ্জে উঠলেন পুরুতমশাই। গলার স্ফীত শিরাগুলো কাঁপিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, আবার ইতিহাস! আমি জানতে চাই—

রতিপতি উদ্গত হাসি দমন করে বললে, আপনি যা জানতে চান তাই তো আমি বলছি। আর একটা ছোট্ট ক'রে পেগ টেনে নিয়ে—

রতিপতিকে সমাপ্ত করতে না দিয়ে পুরুতমশাই তাঁর গ্লাসটা—এগিয়ে ধরলে তাড়াতাড়ি। বললে, হ্যাঁ— তাই দিন!

মদের গ্লাস পুরুতমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে রতিপতি সুরু করলে নিজে এক পেগ টেনে, কালক্রমে এসব সেবাদাসীদের ভজনার ধারাটা আপনাদেরই চেষ্টায় বদলে গেল। মাটি, কাঠ, পাথরের দেবতার গণ্ডী ছাড়িয়ে তাদের প্রেম হলো দূর প্রসারী। দেবতাই শুধু তাদের উপাস্য রইলো না, দেবতা-মন্দিরে আগত সম্মানিত অতিথিরাও হলো তাদের উপাস্য। দেবমন্দিরের পূজারীর নির্দেশে ঐ সব সেবাদাসী নিযুক্ত হলো অতিথিদের পরিচর্য্যার জন্য। পূজারীরা তাদের বোঝালেন যে অতিথিও দেবতা। অতিথির সেবা করা মানেই দেবতার সেবা। দেবভক্ত দেবদাসীরা তখন দেহ দিয়ে, মন দিয়ে অতিথিকে সন্তুষ্ট করার কাজে আত্মনিয়োগ করলে।

—দেবভোগ্যা দেবদাসীদের এভাবে ব্যভিচারিণী ক'রে পূজারীদের লাভ? জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন পুরুতমশাই।

—লাভ নিশ্চয় কিছু ছিল, either cash or in kind.

—দেবতার পূজারী যারা—তারা অত লোভী নয়। ব'লে পুরুতমশাই সোফাটায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে সিগারেটে একটা সুখ টান দিলেন।

—হুঁ—তার প্রমাণ তো আপনি।

বুজে আসা চোখ টো যথাসম্ভব বিস্ফারিত ক'রে তিনি সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, কি—কি বললেন?

অরবিন্দু কথাটা চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললে, কিছু না। রতিপতি বলছে—এর পব আরো কিছু আছে।

—হ্যাঁ—কি আছে তাই শুনতে চাই। বাদশাহী চালে বললেন পুরুতমশাই।

রতিপতি বললে একটা সিগারেট ধরিয়ে, দিন যায়। নবাগত অতিথিরা অধিকার করে দেবতার স্থান অর্থাৎ সেবাদাসীদের ভোগ-দখল করার অধিকারটা তাদের শাস্ত্র-সম্মত সাব্যস্ত হয়ে ওঠে। দিন যায়! ব্যবসাটাকে ফলাও ক'রে তোলার জন্য সেবাদাসীদের

আনা হয় মন্দিরের বাইরে। তাদের বাসের জন্য দেওয়া হয় স্বতন্ত্র বাসস্থান। দেবদাসীদের বাধ্য করা হয় সাধারণ মানুষের ভোগ্যা হ'য়ে তাদের সন্তুষ্টি করতে। বিনিময়ে আসে অর্থ বা অন্যকিছু। দেবদাসী আর দেবদাসী থাকে না—, নেমে আসে নীচতার নিম্নস্তরে। সমাজের চোখে, মানুষের চোখে ঐ সব দেবদাসী হয় পতিত, দেবদাসীর নব নামকরণ হয় তখন পতিতা!

—তোমাদের ইতিহাসের এসব বানানো কথা আমি বিশ্বাস করি না—। এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি—বিশ্বাস করি না—করি না—করি না!

—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর!

মুখখানা বিকৃত ক'রে পুরুতমশাই বললে, বিশ্বাসে যাঁকে মেলে তিনি হচ্ছেন পতিতপাবন স্বয়ং ভগবান, তোমাদের এই সব চার পয়সানেউলী পতিতা নয়! রাধামাধব! সব কি ফুরুলো ছোটবাবু?

রতিপতি পুরুতমশাইয়ের গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললে, ভর সন্ধ্যেবেলা অমন অলুক্ষণে কথা বলবেন না পুরুতমশাই। সমুদ্র শুকিয়ে যাবে কিন্তু আমাদের ছোটবাবুর মদের বোতল ফুরোবে না। নিন্—ধরুন—একেবারে নির্জলা।

—আর নির্জলা সহ্য করতে পারছি না ভায়া, গলাটা কেমন জ্বালা কচ্ছে।

—তবে কি জল মিশিয়ে দেবো—সোডা নয়, গঙ্গাজল?

—উত্তম প্রস্তাব! পুরুতমশাইয়ের জিব এড়িয়ে পড়েছে।

অরবিন্দু বললে আপন মনে, বলিহারী!

গৌরীর আলমারীর উঁচু তাকে কমণ্ডলভর্তি গঙ্গা জল থাকে, খবরটা রতিপতির জানা। খানিকটা গঙ্গাজল সে গ্লাসে ঢেলে দিলে।

—পানসে হ'য়ে যায়নি তো! বলে পুরুতমশাই গ্লাসের অর্দ্ধেকটা গলায় ঢেলে দিলেন।

—কেমন লাগলো?

—বাঃ গঙ্গাজল দিয়ে মদ বড়ই মুখরোচক তো!

সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে অরবিন্দু বললে, একটা সিগারেট ধরান! মদের সঙ্গে সিগারেট বড়ই মুখরোচক!

—নাঃ এবার একটা মিঠেকড়া বিড়িই খাই! বলে তিনি ফতুয়ার পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে ফেললেন।

কি যেন একটা কাজে গৌরী হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরে এলো। পুরুত-মশাইয়ের মদ্যপানের গোপন কথা অরবিন্দু আগে থাকতে জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল গৌরীকে। কাজের ঝোঁকে, ব্যস্ততার মধ্যে সে সাবধান-বাণী স্মরণ ছিল না গৌরীর, সে অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে পুরুতমশাইয়ের হাতে গ্লাস দেখে অপ্রস্তুতের এক শেষ। জিব কেটে ঘাড় হেঁট ক'রে ঘর থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল—পুরুতমশাই তাকে বাধা দিয়ে বললেন, হাটে হাঁড়ী যখন ভাঙাই হ'য়ে গেল তখন আর ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় কেন মা। নাও পেসাদ পাও! বলেই গ্লাসটি তিনি গৌরীর দিকে এগিয়ে ধরলেন।

—সে কি, আপনার যে এখনো জল খাওয়া হয়নি!

—হ'য়েছে—হ'য়েছে। এ হলো মহাপ্রসাদ। কলামূলোর চেয়ে এ প্রসাদের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। নাও, নলচে আড়াল দিয়ে—I mean আঁচল আড়াল দিয়ে টেনে নাও। ব'লে পুরুতমশাইয়ের হাত থেকে তাঁর উচ্ছিষ্ট গ্লাসটি নিয়ে গৌরীর হাতে দিলে অরবিন্দু।

গ্লাসটি নিয়ে গৌরী কপালে ঠেকালে। লাজনম্র হাসি হেসে গ্লাসটির ওপর আঁচল ঢাকা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দোরের পর্দা সরিয়ে রাজু ঘরে এসে ঢুকলো। চুপ ক'রে দাঁড়াল সোফাটার ধারে। ভ্রূক্ষেপ নেই ললিতের, সে যেমন তন্ময় হ'য়ে লিখছিল তেমনি লিখেই চললো। ললিতের ঔদাসীন্যে ফেটে পড়লো

রাজু। বললে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, দিন নেই রাত নেই শুধু লেখা—লেখা—লেখা। দেবো সব লেখা-যোকা চুলোর দোরে পাঠিয়ে!

ললিত নীরবে ঘাড় হেঁট করে লিখেই চলেছে।

—কী! উত্তর দিচ্ছো না যে? বলতে বলতে ললিতের সামনে এসে দাঁড়াল রাজু।

মাথা তুললে ললিত খাতার বুক থেকে। বললে নিম্ন কণ্ঠে, আমাকে বলছো?

মুখখানি বেঁকিয়ে শ্লেষের সঙ্গে বললে রাজু, না—ও পাড়ার ঐ বিন্দু পাগলীকে।

ললিত ফ্যাল ফ্যাল করে রাজুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো নীরবে।

—আচ্ছা, লিখে কেউ কোনদিন বড়লোক হতে পেরেছে? আজ মাসখানেক যাবৎ একি সুরু করেছো বলতো? হাসি নেই—কথা নেই—গল্প-গুজব নেই, শুধু লিখেই চলেছো! লিখে ক'পয়সা ঘরে আনলে শুনি? ব'লে জিজ্ঞাসু নেত্রে রাজু ললিতের খাতাটা ঠেলে দিয়ে সামনাসামনি বসলো।

—কেন, অগ্রিম দুশো টাকা আনিনি?

—হেঁ—ইচ্ছে ক'রলে ওতো আমার দু'দিনের উপায়! তাচ্ছিল্য ভরে বললে রাজু।

একটা সিগারেট ধরালে ললিত। বললে, এখানেই তো তোমার আমায় তফাৎ। তুমি—তুমি আর আমি—আমি!

—যে ক'টা টাকা পেলে তা তো তোমার চা সিগারেটেই ফুরিয়ে গেল। তা ছাড়া বায়স্কোপ কোম্পানী মাত্রেই জোচ্চোর। আড়াই হাজার টাকার জায়গায় আড়াই শো পেলেই বাঁচি। বলে মুখ মচকালে রাজু।

—একটা গল্পের দাম আড়াই হাজার টাকা! এর চেয়ে আর কত বেশী তুমি আশা কর? তারপর তুমি যা মনে ভেবে ক্ষেপে

উঠছে। আসলে ব্যাপারটা তা মোটেই নয়। টাকা যারা মারে তারা হচ্ছে ওঠাই-গিরে কোম্পানী, ব্যাঙের ছাতার মত নিত্য নূতন জন্মাচ্ছে —গজাচ্ছে। শিশু-মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই, আমার কোম্পানী তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ করেছে। টাকা মারা যাবে না। গল্পটা তাদের পরিচালকের মত অনুসারে একটু ঘুরিয়ে দিতে পারলেই বাকি টাকা নগদ পেয়ে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ছবির কাজও সুরু হ'য়ে যাবে।

—ছবি তৈরী হ'তে কত টাকা খরচ হবে ?

—তা—তা প্রায় লাখ দেড়েক টাকা পড়বে।

মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করে রাজু বললে, যে গল্পকে ভিত্তি ক'রে দেড়লাখ টাকার ছবি উঠবে তার দাম মাত্র আড়াই হাজার !

রাজুর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে ললিত বললে স্মিত হাস্যে, দুঃখ করে কি করবে পিয়ারী ! যস্মিন দেশে যদাচার। এক মাস খেটে আমার মত এ্যামেচার লিখিয়ে যে টাকা পাচ্ছে—সেটাই তো আমার ঊর্দ্ধতন পুরুষের ভাগ্য। কত নাম করা পেশাদার লেখক ওদের দোরে দোরে ধন্না দিচ্ছে বই বগলে নিয়ে। হাজার ত্রো হাজার—শ'য়েতেও বই দিতে তাদের আপত্তি নেই বরং আছে আগ্রহ।

—আর কতখানি লিখতে বাকি ?

খাতার পাতা একখানা উলটিয়ে ললিত বললে, ফিনিসিং টাচ্ দিচ্ছি—মানে আর লাইন কয়েক লিখলেই শেষ হ'য়ে যায়। আমাকে এক কাপ চা ক'রে দিতে বলবে !

—চা ক'রে আনতে আনতে লেখাটা যেন শেষ হ'য়ে যায়, হুঁ—তা কিন্তু ব'লে যাচ্ছি। 'আমি ঢের সয়েছি আর তো সব না' ! সুর করে গাইতে গাইতে নৃত্য ছন্দে ছোট মেয়ের মত রাজু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে লেখায় মন দিলে ললিত।

'এই বুঝি রাজু এসে পড়লো চায়ের কাপ নিয়ে !'—মনের মধ্যে

রাজুর আসাটা মুখ্য হয়ে ওঠায় গৌণ হয়ে গেল তার লেখা। অন্তরে সন্ত্রস্ত ভাব জাগলে লেখার উৎস যে আপনি বন্ধ হয়ে যায়। তাড়াহুড়ো করে লিখতে গিয়ে মোটেই লেখা তার এগুলো না। চিন্তাধারা হলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সব কিছু বারে বারে গেল গুলিয়ে। সন্ত্রস্ত হয়ে প্রতি মুহূর্তে দবজাব উড়ন্ত পর্দ্দাব দিকে চাইলে কখনো কি লেখা হয়!

চায়ের কাপ নিয়ে রাজুর প্রবেশ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কলমটা খাতার বুকে শুইয়ে রাখলে ললিত।

—শেষ হ'য়েছে নিশ্চয়? জিজ্ঞেস করলে বাজু ললিতেব হাতে চায়েব কাপ দিতে দিতে।

নীববে চা... কাপে চুমুক দিয়ে ললিত বললে, তোমাকে সামনে রেখে গল্পটা শেষ কবতে চাই।

—তার মানে?

—তুমি সামনে না থাকলে লেখাব প্রেবণা পাচ্ছি না। বাজুর মুখেব দিকে চেয়ে হাসলে ললিত।

—অন্য দিন তো দেখি—আমি কাছে থাকলে তোমার চিন্তাধারা গুলিয়ে যায়। আজ যে বড় নতুন কথা।

—আহা-হা বসেই খানিকটা দেখো না। চায়েব কাপ শেষ হও্য়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখাও শেষ হয়ে যাবে। দাও—সিগরেটটা ধরিয়ে দাও। বলে খাতাব ওপব ঝুঁকে পড়লো ললিত।

লেখা শেষ কবে ললিত মুখ তুলে চাইলে। বললে, শোন দেখি—গল্পটা কেমন হলো!

—হুঁ—বল! ব'লে বাজু একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলো।

ললিত পড়তে সুরু করলে:—

শহরের প্রান্তে একটা খোলার বস্তী। বস্তীটা নোংরা এবং নিন্দনীয়। স্বল্প মূল্যের রূপ-উপজীবিনীরা এখানে বসবাস করে।

এহেন স্বাস্থ্যকর পল্লীর একটা খোলার ঘরে হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোয় শিল্পী বসে ছবি আঁকছে। ছবির উপাদান শুধু রঙ আর তুলি নয়—ছোট্ট ঘরখানি ভর্ত্তি একদল তরুণী আর মদের বোতল। ওরা হাসছে, কথা বলছে—গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাচ্ছে। শিল্পীর কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই, সে শুধু মদ খায় আর ছবি আঁকে—ছবি আঁকে আর মদ খায়। তুলির টানে ছবিটা যেন ক্রমশঃই প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। বদ্ধ ঘরের আলো-আঁধার মাখা আবছায়া নীল সায়রের জীবন্ত রূপে লীলায়িত হয়েছে শিল্পীর পটের বুকে। পটে আঁকা নীল সায়রের বুকে এক ভয়ার্ত নীলনয়না জলপরী। মত্তা তরুণীদের কারো নাক, কারো চোখ, কারো কুঞ্চিত কেশদাম—অর্থাৎ সবারই একটা না একটা নিখুঁত কোন কিছু বেছে নিয়ে—সব ক'টি উপাদানের একত্র সম্মেলনে সজীব করে তুলেছে।

শিল্পী—তার ঐ নীলনয়না জলপরীকে!

শিল্পী—!

আগন্তুকের ডাক শিল্পীর কানে গেল না।

শিল্পী! দ্বারদেশে এগিয়ে এসে ঈষৎ জোরগলায় আবার ডাক দিলেন আগন্তুক।

শিল্পীর চমক ভাঙ্গলো। অসমাপ্ত ছবির ওপর থেকে চোখ তুলে চাইলে সে, স্বপ্নলোক থেকে নেমে এলো বাস্তব জগতে।

—আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি! আর দেরী করো না—ওঠ!

শিল্পী নীরবে বিহ্বল নয়নে চেয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে।

—আজ ক'দিন ধরে কি খোঁজাই যে তোমায় খুঁজছি! তোমার মত গুণী লোক যে এমন জঘন্য স্থানে আস্তানা নিতে পারে—যাক্ সে কথা। তোমাকে আমাদের এখন বিশেষ প্রয়োজন! তোমার অভাবে সব মাটি হতে বসেছে। উঁ—কি বিশ্রী গন্ধ! বলে আগন্তুক গন্ধভরা রুমালটা নাকের উপর চেপে ধরলেন।

স্নিগ্ধ হাসি হাসলে শিল্পী।

—কৈ, ওঠ ?

—ছবি, মদের বোতল আর তরুণীদের দেখিয়ে শিল্পী বললে, এদের ছেড়ে ?

—আঃ আমি আর দেরী করতে পারি না। গাড়ী দাঁড়িয়ে, তোমায় না নিয়ে কিছুতেই আমার যাওয়া হবে না।

—কোথায় যেতে হবে, sir ?

—থিয়েটারে !

—বইখানা শুনলে তো ? এখানাকেই করতে চাই আমরা এবাবের বড়দিনের আকর্ষণ।

—কিন্তু আমাকে কি করতে হবে ? জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে শিল্পী।

সিগারেটের টিনটা শিল্পীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ম্যানেজার দরদী গলায় বললেন, তোমার যা কাজ,—লাইট্ আর সিন ! কিন্তু মনে থাকে যেন, লাইট এমনি ভাবে ফেলবে—নাটকের নায়িকা আর তার পিছনের সিন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে ! কিন্তু ভারি মুস্কিলে ফেললে, নায়িকা পাই কোথা ?

—আপনারই দলে আছে !

—আমার দলে—কে ?

—ঐ নীলনয়না, যে মেয়েটি ব্যালেতে নাচে ! আমার হাতে যদি ছেড়ে দেন তাহলে—

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ম্যানেজার বললেন, তা কি সম্ভব। আচ্ছা—সিনটা কেমন হবে? আলোর ক্যারামতি দেখিয়ে জমাতে পারবে তো ?

বস্তিতে বসে আঁকা সেই ছবিখানা ম্যানেজারের সামনে খুলে ধরলে শিল্পী।

বিশ্বনিন্দুক স্বয়ং ম্যানেজারও স্তম্ভিত না হয়ে পারলেন না।

উদ্বোধন রজনী। প্রেক্ষাগার লোকে লোকারণ্য—তিল ধারণের স্থান নেই। বহু লোক স্থানাভাবে বিরস মুখে ফিরে গেল।

আরম্ভ হবার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উঠলো মঞ্চের। পশ্চাৎভাগের পটের উপর আলোকপাতে—মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো সীমাহীন নীল সায়রের বুকে ভয়ার্ত্ত এক অপূর্ব রূপসী জলপরী। প্রাণভয়ে সে ভীতা, সন্ত্রস্তা, দিশেহারা। তাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে ঐ নীল জল আলোড়ন করে এক অদ্ভুত উৎকট, বিবাট অক্টোপাশ।

স্তম্ভিত দর্শক ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো আপনহারা হ'য়ে।

শিল্পীর অপরূপ আলোকপাত আরো ভয়াবহ—আরো বীভৎস হ'য়ে উঠলো। নগ্ন রূপসীর লীলায়িত তনু অক্টোপাশের আটটি বাহুর বাঁধনে-বাঁধা এ-ই বুঝি পড়ে! সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো দর্শক সাধারণ।

অভিনয় এগিয়ে চললো বিরাট নীরবতার মধ্য দিয়ে।

শিল্পী—দিশেহারা শিল্পীর অপরূপ আলোকসম্পাতে বাস্তব জগতে নেমে এলো স্বপ্নলোক।

অপূর্ব উন্মাদনাব মধ্যে শেষ হ'লো অভিনয়। দর্শকদেব চোখের সামনে শুধু বেঁচে রইলো—জেগে রইলো ঐ নীলনয়না জলপবী।

যবনিকা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীলনয়না ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলে শিল্পীকে, কৃতজ্ঞতার পরশ এঁকে দিলে সুন্দরী—শিল্পীব অধরে, চোখে, মুখে, মাথায়।

দিনের পর দিন যায়।

নীলনয়না আর সুরার সাথে দিন কাটে শিল্পীর। দুজনে দুজনকে ভালবাসে "যেন দুঁহু কাঁখে দুঁহু কোলে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

দিন যায়—লোকের চোখে নীলনয়না হয়ে ওঠে দেবী সৌন্দর্য্যের প্রতিমা ভেনাস।

হঠাৎ সেদিন অভিনয় অন্তে দেখা গেল নীলনয়না এক জমিদার পুত্রের হাত ধরে গাড়ীতে উঠছে। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান শিল্পীর উদ্দেশে বললে নীলনয়না দুটি হাত কপালে তুলে, আজ মাপ কর্বেন। এঁর সঙ্গে একটা জরুরী engagement আছে।

গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

শিল্পী ক্ষুণ্ণ মনে মদের দোকানে গিয়ে ঢুকলো।

পরের দিন যবনিকাপাতের পর শিল্পী থিয়েটারের দরজায় এসে দাঁড়াল নীলনয়নার প্রতীক্ষায়।

পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে নীলনয়না বললে, ব্যস্ত আছি।

শিল্পীর চোখের সামনে দিয়ে আজকের নব-নায়কের পাশে বসে নীলনয়না উড়ে চলে গেল। মোটরের ধূলোর একটা ক্ষুদ্র কণা এসে পড়লো শিল্পীর চোখে।

ক'দিন পরে।

—তোমার আচরণে আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি, নীলনয়না।

নীলনয়না হাসলে প্রাণহীন সহানুভূতির হাসি।

—দিনের পর দিন এভাবে আর কতদিন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলবে?

—বোধ হয় চিরদিন।

—এর মানে?

—মানে অতি স্বচ্ছ। তোমাকে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এই সোজা কথাটা আর বুঝতে পাচ্ছো না?

—প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ যেমন তার পোষা কুকুর বেড়ালকে

আদর করে, মিষ্টি কথা বলে—তুমিও এতদিন তাই বলে আমায় ছলনা করে এসেছো, কেমন ছলনাময়ী ! শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল করুন। জয় হিন্দ ! বলে—শিল্পী পথে নেমে এলো।

নীলনয়নার আজ সম্মান-রজনী।

কাতারে কাতারে অভূতপূর্ব জন-সমাগম। টিকিটের দর আজ তিনগুণ। দশগুণ হলেও ক্ষতি ছিল না। স্থানাভাবে বহু নরনারী ফিরে গেল ক্ষুণ্ণ মনে।

উচ্ছ্বসিত করতালির মধ্য দিয়ে যবানকা উঠলো, সুরু হ'ল অভিনয়।

দর্শকদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, এ তারা কি দেখছে ! এই বীভৎস অভিনয়ের গগনভেদী সুখ্যাতিতে সারা দেশ মাতোয়ারা !

অস্ফুট গুঞ্জনে সারা প্রেক্ষাগার প্রায় মুখরিত হয়ে উঠলো। সুরু হলো টিপ্পনী, চেয়ার চাপড়ানোর শব্দ, শীষ—যেমনি বীভৎস অভিনয় তেমনি বীভৎস আবহাওয়া।

প্রলয়ের অন্ধকার, সেই অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে এক কঙ্কালাকৃতি প্রেতিনী। আনন্দের পরিবর্তে দর্শকদের অন্তরে জাগে ঘৃণা ! এমন অকথ্য দৃশ্য দেখার জন্য কি সারা দেশে জেগেছে বিপুল চাঞ্চল্য !

যবনিকা পড়বার আগেই ক্ষোভে, দুঃখে দর্শকরা আসন ছেড়ে চলে গেল। দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তে প্রেক্ষাগার হলো জন-মানব শূন্য।

নীলনয়নার স্তাবকের দল সেদিন থেকে আর প্রেক্ষাগারে ভুলেও পদার্পণ করে না। সারা শহরে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো।

নীলনয়না এসে লুটিয়ে পড়লো শিল্পীর পায়ে। বললে করুণ আর্তনাদে, এ তুমি আমার কি করলে শিল্পী!

—সরে বসো, নীলনয়না! তোমার সম্মানহানি হ'তে পারে।

ডুকরে উঠল নীলনয়না, পারলে তুমি এমন মর্মান্তিক প্রতিশোধ নিতে? একটু মায়া হ'লো না—একটু বাধলো না তোমার! ছিঃ তুমি না একদিন আমার ভালবাসার গর্ব করতে?

—সে গর্ব আমার আজও আছে নীলনয়না!

—তবে—তবে—! নীলনয়না শিল্পীর দুটি হাত সজোরে চেপে ধরলো।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শিল্পী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, ভালবাসা আর প্রয়োজন এক নয় শ্রীমতী! তোমার ওপর আজও আমার ভালবাসা আছে—কিন্তু ফুরিয়েছে প্রয়োজন!

নীলনয়না নীরবে চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

শিল্পী হাসলে, বললে, আমাকে তোমার প্রয়োজন ছিল কিন্তু ছিল না ভালবাসা! কিন্তু সে প্রয়োজন তো তোমার ফুরিয়েছে,—রূপসী!

রাজু তন্ময় হ'য়ে গল্প শুনছিল। গল্প পড়া শেষ করে ললিত খাতার বুক থেকে চোখ তুলে রাজুর দিকে চাইল জিজ্ঞাসু নেত্রে, ভাবটা—কেমন লাগলো?

তন্ময়া রাজু বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তারপর—?

—তারপ'র কি গো! গল্প যে শেষ হয়ে গেল! ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে ললিত।

—শেষ হয়ে গেল? এরি মধ্যে! রাজু যেন বিশ্বাসই করতে পারে না।

—নাঃ তোমাকে গল্প শোনানও যা আর একটা দেয়ালকে গল্প শোনানও তা। একটু যদি সূক্ষ্ম রসবোধ আছে! এত কষ্ট ক'রে লিখলাম—

ক্ষুণ্ণ হলো রাজু। বললে, আমার বোঝায় না বোঝায় কি আসে যায় তোমার। যারা বোঝবার তারা বুঝলেই হলো। আমাকে শোনানই তোমার—

—নিশ্চয়, তোমাকে শোনানই আমার ঝক্‌মারি!

—তোমার গল্প শোনা আমারই ঝকমারি! ঝকমারি—ঝকমারি—ঝকমারি! আর যদি কোনদিন শুনতে চাই তাহলে আমাকে তুমি কুকুর বলে ডেকো! বলে গোঁ ভরে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজু। যাবার সময় পা লেগে চায়ের কাপটা ঠিকরে গিয়ে লাগলো সোকেসের পায়ায়, ভেঙে গেল খান খান হয়ে, সে দিকে ফিরেও চাইলে না রাজু।

ললিত গুম খেয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে একটা সিগারেট ধরালে।

প্রায় বছর পেরোতে গেল—নন্দ এক বৃদ্ধ মাড়োয়ারী বাবুর কাছে বাঁধা। বয়সে নন্দ তার বাবুর প্রায় নাতনীর বয়সী। 'পয়সা বড় চীজ আর গোদা বড় নাগর'! পয়সার জন্য নন্দ ঐ থুর থুরে বুড়োর কাছে আত্মবিক্রয় করেছে।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে—দিব্যি আছে নন্দ, খাসা আছে। ঝি, চাকর, বামুন, দ্বারোয়ান—হুকুম মত গাড়ী। সমস্ত খরচ খরচা ছাড়া মাসে মোটা মাহিনা। প্রতিবৎসর পূজোয় এক সেট করে গহনা। এ ছাড়া আছে প্রতিদিনের হাত খরচের একটা বরাদ্দ টাকা। কাপড়, জামা—? সে তো প্রায় প্রতি সপ্তায় নিত্য নতুন। দামী আসবাবপত্রে ঘর সাজানো। শোবার ঘরে তার দুটো বড় বড় আলো আধুনিক সেডের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে রাতকে করে দিন। তার রেডিওর শব্দ এবং 'সেপ্' কেড়ে নেয় মানুষের মন। বিলাতি ছবিগুলি উলঙ্গ, রুচিতে বাধবে নীতিবাগিশের কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে তাকে করতে হবে রূপের প্রশংসা। বড় বড় চারখানা আয়নায় ফুটে উঠেছে সারা ঘরের ছবি। মেহগ্নি কাঠের পালঙ্ক আর সোকেসের পালিস করা জৌলুসে ঠিকরে যায় চোখ। ফুল, লতা-পাতা আঁকা ভেলভেটের কভার দেওয়া সোফায় বসতে মন হয় সঙ্কুচিত।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিছানায় ছিটানো হয় দামী সেণ্ট। ধূপদানীতে জ্বলে আতরমাখা ধূপ।

মাড়োয়ারীরা সেণ্টের চেয়ে আতরটাই বেশী পছন্দ করে। বাবুকে খুসী করতে নন্দকেও মাখতে হয় আতর। মাথার বালিশ আর তাকিয়ার ওয়াড়ে দিতে হয় আতব ছিটিয়ে।

বাবুর রুচির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে নীড়ের মাধুয্য নষ্ট হয়, হয় মন কষাকষি, বাধে গৃহ-যুদ্ধ—তা সে বাক-যুদ্ধই হোক আব শারীরিক যুদ্ধই হোক।

বাবুব রুচি ও নির্দেশ মত নন্দ সদাই ফিটফাট্। সাজপোষ, প্রসাধন, আতর—' রূপ ও গন্ধ ছড়িয়ে নন্দ ঘুবে বেড়ায় যেন একটি পটের বিবি।

চেহাবার দিক থেকেও বদলে গেছে নন্দ। রূপ যেন তার ফেটে পড়ছে। শুধু রূপই নয়—রুচিও তার বদলেছে। তেলকলের ধারে খোলার বস্তির নন্দ—শরৎসুন্দরীর বাড়ীর মাতাল নন্দ যেন মরে গেছে, তার জায়গায় বেঁচে উঠেছে নতুন দেহ ও মন নিয়ে এ আর এক নন্দ।

নন্দ এখন আর অবসর সময়টা মদ খেয়ে কাটায় না—পড়াশোনা করে। রোজ বৈকালে মাষ্টাব আসে তাকে পড়াতে। বাবুই তার এই মাষ্টারটি ঠিক করে দিয়েছে। মাষ্টারও প্রায় তার বাবুর বয়সী, বয়স কিছু বেশীই বরং হবে। অল্পবয়সী ছোকরা মাষ্টার এসেছিল কিন্তু বাবু তাদের রাখেননি পাছে নন্দ তাদের পিরীতে পড়ে যায়।

সকলে ভাবে—নন্দ আছে বেশ। হিংসাও হয়তো কেউ কেউ

করে তার ভাগ্যকে। নন্দও মাঝে মাঝে ভাবে—আছি বেশ। কি ছিলাম—কি হ'য়েছি, বেশ আছি—খাসা আছি।

কিন্তু মনকে আঁখি ঠেরে মানুষের ক'দিন কাটে। গতদিনের তুলনায় অবস্থার উন্নতির দিক দিয়ে বলবার কিছু নেই, কিন্তু মন? বিজনকে নিয়ে যে ক'টা দিন তার কেটেছিল সেই ক'টা দিনই তার জীবনের চরম আনন্দের দিন।

তখন তাকে দিন গুজরান করতে হ'য়েছে গহনা বাঁধা দিয়ে বা বিক্রী করে। তা হোক—বিজন ছিল তখন তার পাশে। বুকভরা শান্তি নিয়ে দুখের ভাত সে সুখ ক'রে খেয়েছিল, কিন্তু আজ!

বৃদ্ধ বাবুকে প্রেমের কথা শুনিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করাও যা আর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে 'গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্ম' শুনে চরম শান্তি লাভ করাও তা। এ-ভাবে আর কতদিন কাটে!

বৃদ্ধের সাহচর্য্যে হাঁপিয়ে উঠলো নন্দ। শান্তির জন্য অন্তরাত্মা হলো তার উন্মাদ। যৌবনের তপ্ত রক্ত উঠলো টগবগিয়ে। উপচে পড়া ফুটন্ত তপ্ত রক্তকে সে প্রশমিত করবে কি দিয়ে! রাশ টেনে কেউ কি কোনদিন ক্ষ্যাপা ঘোড়ার গতি রুদ্ধ করতে পেরেছে! যৌবন পিপাসা প্রশমিত করতে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠলো নন্দ মনে মনে।

আট-ঘাট চারদিক বন্ধ, আশপাশ চতুর্দিকে বাধার প্রাচীর। সবাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে অপলক নেত্রে। ভোগের মাঝে থেকেও তাকে হ'তে হবে সংযমী, সন্ন্যাসিনীর মত প্রথম রিপু জয় ক'রে হ'তে হবে তাকে বিজয়িনী!

মাড়োয়ারীবাবু তার কচিৎ কদাচিত রাত কাটান নন্দর ঘরে। বড় জোর দশটা কি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তাঁর মেয়াদ। তারপর তিনি জামাটি গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগড়ী পরে উঠে পড়েন। নন্দ তাঁকে এগিয়ে দিতে আসে সিঁড়ির মুখ পর্য্যন্ত। বিদায় বেলায় বাবু নন্দর পিঠটা দু'বার চাপড়ে দেন, মাথায় দেন একটি ছোট ঝাঁকি,—এরই

নাম তাঁর প্রেম নিবেদন। দ্বারোয়ান তাঁর পিছনে পিছনে নীচ পর্য্যন্ত গিয়ে মোটরে তুলে দিয়ে সেলাম দেয়।

বাবু কোনদিন মদ খান না। তৃপ্তির জন্য নিজে সামনে বসে থেকে তিনি নন্দকে মদ খাওয়ান। মদটা যে নন্দর প্রিয়—এ কথা তাঁর অজানা নয়। নন্দর নির্দেশে তিনি বাজার থেকে দুষ্প্রাপ্য মদ সংগ্রহ ক'রে আনেন, নন্দ খুসী হয়।

বাবু কতক্ষণ চলে গেছেন তা কে জানে, নন্দ বসে বসে মদ খাচ্ছে। রাঁধুনি তার নির্দ্দেশ অনুসারে ঘরে টি-পয়ের ওপর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে শুতে গেছে। ঝি পাশের ঘরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। বারান্দায় শুয়েছে চাকর গৌতম।

গৌতমের বয়স বছর বাইশ। জাতে সে বিহারী, ইয়া ষণ্ডামার্কা চেহারা—কাঠখোট্টা চেহারায় নেই তার এতটুকু লালিত্য। জোয়ান মরদ, এক সঙ্গে পাঁচ সাতজন লোকের মহড়া নিতে পারে। দিন ভোর খাটে ভূতের খাটুনি, রাত্রে ঘুমায় নিঃসাড়ে।

নন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার আলোটা জ্বাললো। দেখলে গৌতম অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার মুখের দিকে অপলক লোলুপ নেত্রে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নন্দ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে। আলোটা নিবিয়ে আবার সে ঘরে এলো। নিজের ঘরে গ্লাসে মদ ঢাললে। সোডা না মিশিয়ে র' মদ সে গলায় ঢেলে দিয়ে দু'হাতে বুকটা চেপে ধরলে। বুকের জ্বালা কতকটা প্রশমিত হতে আবার খেলে আর এক গ্লাস, এবার আর র' নয়—সোডা মিশিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে একটা টর্চ নিয়ে সে বাবান্দায় এলো। সারা বাড়ী নীরব নীথর, নিস্পন্দ। পড়ে যাচ্ছিল নন্দ, দেয়াল ধরে সামলে নিলে। গৌতম যেখানে শুয়ে ছিল—দেয়াল ধরে ধরে নন্দ সেখানে গিয়ে হাজির হলো। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইলে নন্দ, তারপর গৌতমের শিয়রে গিয়ে টর্চ ফেললে তার মুখের ওপর।

টর্চের তীব্র আলোতেও ঘুম ভাঙে না গৌতমের। নন্দ তার মাথাটা ধরে নাড়া দিলে। গৌতম যেন ঘরে ঘুমুচ্ছে। নন্দ টলকে টলতে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে ছিটিয়ে দিলে গৌতমের চোখে মুখে। আকস্মিক ঠাণ্ডা জলের ছিটে মুখে এসে পড়ায় চট্ করে ঘুমটা ভেঙে গেল গৌতমের, সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। গৌতম কোন কিছু বলবার আগেই নন্দ বললে, গৌতম! আমিরে!

—দিদিমণি! গৌতম সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার পরণের অগোছাল কাপড় গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলে।

গৌতম কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই নন্দ চাপা গলায় বললে, আমার—আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, একটু টিপে দিবি গৌতম?

মাথাধরা নন্দর আজ নতুন নয়। প্রায়ই ধরে। তার জন্য তাকে কোনদিন মাথা টিপতে হয়নি, টিপতো তার ঝি করালি।

—করালি কোথা গেল দিদিমণি?

—কোথা আবার যাবে, সে মরে ঘুমুচ্ছে। আয়—! বেশী কথা না বলে নন্দ টলতে টলতে ঘরে এসে ঢুকলো, পিছনে এলো গৌতম।

নন্দ ধড়াস ক'রে ঘরে খিলটা লাগিয়ে দিলে। গৌতম কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। নন্দ স্খলিত চরণে টলতে টলতে এসে তার বিছানার ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো। যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ করতে করতে কাটা ছাগলের মত বিছানার ওপর খানিকটা গড়াগড়ি দিয়ে সে হাতের ইসারায় গৌতমকে বিছানার ধারে বসতে বললে। মন্ত্রমুগ্ধের মত গৌতমের তথাকরণ। নন্দ সরে এসে তার কোলের ওপর মাথাটা তুলে দিলে। গৌতম পাথর হ'য়ে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে সমস্ত বাতাসটা যেন তার বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে গেল। গৌতম সন্তর্পণে, সন্ত্রস্তভাবে নন্দর মাথা টিপতে লাগলো।

মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর উঠে বসলো নন্দ তাকিয়া ঠেসান

দিয়ে। তার নির্দেশে গৌতম ট্রে সমেত নিয়ে এলো মদের বোতল, গ্লাস আর সোডা। গ্লাসে মদের সঙ্গে সোডা মিশিয়ে নন্দর হাতে তুলে দিতে দিতে বললে গৌতম, আর খেয়োনি দিদিমণি, তোমার আজ বড্ড নেশা হয়েছে!

ঠোঁটের ওপর তর্জ্জনীর স্পর্শে নন্দ তাকে কথা বলতে নিষেধ করলে। এক চুমুক খেয়ে নন্দ মদের গ্লাসটা তুলে দিলে গৌতমের হাতে।

গৌতম কি পাগল হ'য়ে যাবে! মদের গ্লাসটা না পারে সে ট্রের ওপর নামিয়ে রাখতে আর না পারে খেতে। শূন্যে মদের গ্লাসটা শুধু সে ধরেই রইলো। জীবনে অনেক অস্বস্তি, অনেক মারাত্মক বিপদের মধ্যে সে পড়েছে কিন্তু আজকের এই মর্মান্তিক মর্মপীড়ার তুলনায় সেগুলি একান্ত তুচ্ছ, ম্লান।

—খেয়ে ফ্যাল।

মনিব তার হাতে মদের গ্লাস তুলে দিয়ে বলছে, খেয়ে ফ্যাল! গৌতমের শিরা, উপশিরার ভিতর জাগলো বৈদ্যুতিক শিহরণ। কিসের শিহরণ—। আনন্দ—ভয়—দুঃখ—কিছুই বুঝলে না গৌতম। মনিবের হুকুমে সে মদের গ্লাস গলায় ঢেলে দিলে।

মাত্র মাস কয়েক হলো গৌতম দেশ থেকে এসেছে। মহুয়ার মদ সে দেশে থাকতে মাঝে-মিশোলে খেতো কিন্তু বিলাতি মদ—তার জীবনে এই প্রথম। এক চুমুকেই সে গ্লাস খালি করলে, খাবার সময় বিশেষ কিছু বুঝলে না কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার ক্রিয়া শুরু হলো।

মেহগ্নি কাঠের পালঙ্, তিনপুরু বিছানার ওপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে জমিয়ে বসলো গৌতম। মাথার ওপর ঘুরছে পাখা ফুল স্পীডে। দু'পাশে দুটো বাতি ঘরখানা দিনের আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে। চারদিকে ভুরভুর করছে আতরের গন্ধ। ফুলদানির আধ ফুটন্ত ফুলগুলি পাখার হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। আয়নায় ফুটে উঠেছে একই সঙ্গে তাদের উভয়ের প্রতিমূর্তি—মনিব আর চাকরের।

মনিব নিজের হাতে মদ ঢেলে গ্লাস ধরেছে চাকরের মুখের গোড়ায়।

গৌতম কি পাগল হয়ে যাবে! একি অকল্পিত ভাগ্য বিপর্য্যয়! রাতের আবুহোসেনী কি দিনের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মত মুছে যাবে মন থেকে চিরদিনের জন্য।

আর এক গ্লাস খেলে গৌতম।

গভীর নিথর প্রস্তরীভূত নীরবতা। রাতের প্রহরী দেয়াল ঘড়িটা শুধু করে চলেছে টিক্-টিক্-টিক্। নীরবতা ভঙ্গ করতে বোধ হয় লজ্জায় বাধছে মত্তা নন্দর আর সাহসে কুলোচ্ছে না গৌতমের।

মদ খাইয়ে গৌতমকে চুরচুরে মাতাল ক'রে তুললে নন্দ কোন গোপন বাসনা পরিতৃপ্তিব অফুরন্ত প্রেরণায়।

অদম্য বিপুল উচ্ছ্বাসে জড়িত কণ্ঠে গৌতম চেঁচিয়ে উঠলো, দিদিমণি!

নন্দ তার বুকেব ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটা চেপে ধরলে। গৌতম ঢলে পড়লো পালঙের ওপর। নন্দ পালঙেব ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দিলে, ঘবখানা ভবে গেল অমাবস্যার নিবিড় আঁধারে।

কেষ্টো কোথায়?

কেষ্টো মথুরায়।

কেষ্টো কি করে?

কেষ্টো পাতকী তরায়।

রাত তখন ক'টা কে জানে, নীচ থেকে বাড়ীউলি মোক্ষদার পাখী পড়ানোর শব্দ ভেসে আসায় চট্ ক'রে ঘুমটা ভেঙে গেল নন্দর। দু'খানা পাষাণের মত শক্ত বাহুর বন্ধনে দম যেন তার বন্ধ হ'য়ে আসছে। বৈদ্যুতিক কষাঘাতে এক মুহূর্তে সচেতন হয়ে

উঠলো নন্দ। হাত দুখানা গায়ের জোরে সরিয়ে সে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে ঈষৎ ঘৃণাভরে। অন্তরের পর্দ্দায় গত রাতের ঘটনা ছবির মত ফুটে উঠলো নিখুঁত ভাবে। নন্দ উঠে বসে তার পরনের কাপড় ঠিক করে নিয়ে আলোটা জ্বাললে। ধাক্কা দিতে দিতে চাপাগলায় ডাকলে, গৌতম! গৌতম! ও গৌতম।

একে অপর্য্যাপ্ত নেশা তায় অবসাদগ্রস্ত শরীর, ঘুম আর কিছুতেই ভাঙতে চায় না গৌতমের। নন্দ জলের ঝাপটা দিলে গৌতমের চোখে মুখে। গৌতম চোখ মেলে চাইলে, পরমুহূর্তে ধড় মড় করে উঠে বসলো। নন্দর মুখের দিকে চাইতেই এক লহমায় সব কথা তার মনে পড়ে গেল, সে খাট থেকে নীচে নামলো নীরবে ঘাড় হেঁট করে। মাথা তুলে সে নন্দর মুখেব দিকে তাকাতে পারছিল না।

অন্য দিকে চেয়ে নন্দ বললে, বারান্দায় গিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়।

গৌতম বেরিয়ে যেতে নন্দ ঘবে খিল দিয়ে খালি মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো। পালঙের ওপর উঠতে তার ইচ্ছা হলো না।

ভালবাসা পরীক্ষার দিন সেই-যে ডাক্তার ডাকতে গেল—সেই যাওয়া হলো তাব শেষ যাওয়া। বাড়ীব লোক ঠাট্টা করে বলে—"তোর হরিশ ডাক্তার ডাকতে গেছে। এতখানি পথ যাবে আসবে—সময় একটু লাগবে বইকি। কিছু ভাবিস নি—ডাক্তারের দেখা বোধ হয় সে আজও পায় নি।"

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঈষৎ ঘোরাল এবং রসালো। হরিশের গাড়ীতে আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় তার অফিসের টাইপিষ্ট বাঙালী মেম সাহেবকে। খবরটা দিলে এসে ওদেরই বাড়ীওলা মহাদেব। টাইপিষ্ট মিসিবাবাকে নিয়ে আজকাল উড়ছে হরিশ।

চেখে বেড়ানো হরিশের একটা অস্থি-মজ্জাগত অভ্যাস। একটা দু'টো মেয়েছেলে নিয়ে হরিশের অন্তরাত্মা ঠিক যেন তৃপ্তি পায় না। নিত্য নতুন মেয়েছেলে নইলে হরিশের কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। পয়সা তো আছেই তার উপর আছে রূপ। হরিশের সব চেয়ে বড় গুণ—মেয়েছেলে পটানোর অদ্ভুত ক্ষমতা। পয়সা বা রূপ থাকলেই মেয়েছেলেকে বশ করা যায় না, মেয়েছেলেকে বশ করার ন্যাক্ থাকা চাই। হরিশের ছিল সেই অদ্ভুত ন্যাক্।

হরিশকে আশা ভালবাসতো। তার অর্থের জন্য নয়—তার রূপের জন্যও নয়—ভালবাসতো তার ন্যাকের জন্য! ন্যাক্ অর্থাৎ মেয়েছেলেকে করায়ত্ব করার একটা অদ্ভুত কায়দা, হাব-ভাব কথনবচনে বুঝিয়ে দেওয়া যে—আমি তোমারি! তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

ক্রমে ক্রমে হরিশের মেয়েছেলে প্রীতির কথা কানে এলো আশার। কিন্তু তখন সে নিরুপায়, পরিপূর্ণভাবে দিল্ খুলে আশা ভালবেসে ফেলেছে হরিশকে। হরিশকে ছেড়ে থাকা সে কল্পনাও করতে পারে না।

কল্পনাই হল আজ সত্যে পরিণত। বেইমান হরিশ মাতলো মিশিবাবাকে নিয়ে। আশার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

হরিশ আর এলো না।

নিরঞ্জনের নেই আসা যাওয়ার কামাই। প্রেম-পরীক্ষায় জয়ী হ'য়েও আশার কাছে পাত্তা পেলে না নিরঞ্জন। যে যাকে চায়—সে তাকে পায় না, যে যাকে চায় না—সে চায় তাকে! চেষ্টা ক'রেও আশা ভালবাসতে পারলে না নিরঞ্জনকে। যা কিছু মেয়েছেলের কাম্য—সব কিছু নিয়েই এগিয়ে এলো নিরঞ্জন আকুল অন্তরে কিন্তু সাড়া পেলে না।

সাদাসিধা প্রকৃতির লোক নিরঞ্জন সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো

আশাকে। আশা যে তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে না, ভালবাসা যে তার মৌখিক তা বুঝতো না নিরঞ্জন। সে ভাবতো—আশা তাকে সত্যিই ভালবাসে।

আসার বুভূক্ষু প্রেম-পিয়াসী অন্তরাত্মা কেঁদে মরে নিশিদিন। বুকটা তার ক্ষণে ক্ষণে গুমরে ওঠে। আশাহত, হতাশ নয়নে কাজ সে ক'রে যায় মেসিনের মত। কাজে তার থাকে না প্রাণের স্পন্দন।

নতুন একখানা ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছে আশা। কর্ত্তৃপক্ষ অমায়িক—তার চেয়েও বেশী অমায়িক চিত্র পরিচালক বিমানবাবু।

বিমানবাবুকে বেশ লাগে—বেশ ভালই লাগে আশার। ভারী চমৎকার লোক। কত মিষ্টি কথা! ঠোঁটের কোণে হাসিটি যেন লেগেই আছে। বয়স একটু হ'য়েছে কিন্তু বয়সের তুলনায় চেহারাটা কচি। বেঁটে-খাটো গড়নটি—বেশ ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ! নিরঞ্জনের চেয়ে বয়সে বছর কয়েকের ছোটই হবে বিমান।

বিমানেরও হাবভাব কেমন যেন সন্দেহজনক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাতির করে বিমান, চোখের কোণে হাসে চোরা হাসি—সে হাসি মারাত্মক নয় বটে তবে মর্মান্তিক।

কিন্তু না—ও যাদুকরী মায়ায় ভুললে চলবে না আশার। থিয়েটার বায়স্কোপের লোক বড় সাঙ্ঘাতিক লোক, ওরা সব জনে জনে যাদু জানে। মায়ার কাজল ওদের সবার চোখে মাখানো। ও মায়ার ফাঁদে কিছুতেই পা দেবে না আশা। ওরা সব জনে জনে সয়তান!

দিন যায়। ছবির কাজ চলে এগিয়ে। ঘনিষ্ঠতা ওদের ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে। দোদুল দোলায় দোলে আশার নীড়হারা মন-বিহঙ্গ।

রিম-ঝিম ক'রে বাদল ঝরে। সারা দিনটাই মেঘলা। উদাসী মন সদাই উড়ু উড়ু। ঠিক সন্ধ্যার মুখে বাড়ী খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হলো বিমান। বাইরের ঘরে বিমানকে বসিয়ে বাহাদুর খবর দিলে আশাকে।

বিমানকে দেখে আনন্দ ও উদ্বেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো আশা। বিমান যে তার বাড়ী খুঁজে এহেন বাদল-সন্ধ্যায় এসে হাজির হবে তা কল্পনাও করতে পারেনি আশা। বিমানকে তার ভালোই লাগে—দেখে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। আজ আবার 'টাইমের দিন', এখুনি এসে পড়বে রাধেশ্যাম ঘরঘরিয়া। উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠলো আশার মুখে।

আশা ঠাকুর-আদরে খাতির ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে বিমানকে। না খাতির ক'রে উপায় কি! বিমান তো যে-সে তৃতীয় শ্রেণীর লোক নয়। বুকখানা ঘরঘরিয়ার ভয়ে যতই ঘর্ ঘর্ করুক বা দুর্ দুর্ করুক—বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রেরণার তাগিদে খাতির তাকে করতেই হয়।

বিমান সম্মোহন কণ্ঠে বললে, মদ আনাও।

—আনাবো। তার আগে একটু জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হোন।

—ও পাঠ আমি চুকিয়ে এসেছি। রাত বেশী হ'লে মদ হয়তো পাওয়া যাবে না! ব'লে মদ আনবার জন্য তাগাদার পর তাগাদা দিতে লাগলো বিমান।

আশা ভাবলে—'না জানি কত বড় মাতাল নবাগত প্রেমিক এই বিমানবিহারী।'

বিমান যত তাগাদা দেয়—আশা ততই ইতঃস্তত করে। মদের বোতল দেখলে ঘরঘরিয়ার সন্দেহ করতে আর কিছুই বাকি থাকবে না।

বিমান অধৈর্য্য হ'য়ে উঠলো।

টাইমের কথা উল্লেখ করে আশা বললে, মদের বোতল দেখলে সন্দেহ করবে। ঘরঘরিয়ার আসবার সময় হলো। একে মেড়ো তায় বুড়ো! একটু দেরী করাই ভালো।

—বেশ তো। মদের বোতল আনিয়ে রাখো। যদি আসে তা হলে বোতল খোলা হবে না, আশ পাশে লুকিয়ে ফেললেই চলবে।

আশা ভাবলে, হ্যাঁ মাতালাবটে! সাধে কি আর বলে বায়স্কোপের লোক!

বলতে বলতে ঘরঘরিয়া এসে হাজির।

কথা বলতে অবসর না দিয়ে আশা আস্ত-ব্যস্ত বললে ঘরঘরিয়ার উদ্দেশে, ইনিই সেই ফিল্ম-ডিরেকটর বিমানবাবু।

পরিচালক ঘর বয়ে এসেছে আর্টিষ্টের বাড়ী অর্থাৎ তাঁরই আড্ডায়।

—রাম রাম বাবুসাব! টুপি খুলতে খুলতে বললেন ঘরঘরিয়া।

প্রতি নমস্কার করে বিমান বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

খুসিতে উপচে পড়লেন রাধেশ্যাম।

—আপনার মত ড্যারিকেটর আদমির সাথে আলাপ হোবে—এতো হোনুমানজীর দোয়া। সাবকে জল-টল পানি-ওনি কুছু খাওয়ান হইয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন রাধেশ্যাম আশার দিকে চেয়ে।

—উনি খেয়ে এসেছেন। উত্তরে বললে আশা বিমানের দিকে একটি ক্ষুদ্র কটাক্ষ হেনে।

পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে ঘরঘরিয়া বললেন, ওকি একটা কোথা হ'লো বাবুজি! কুছু ফল-টল তো জরুর খেতে হোবে।

ঘরঘরিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়েযাওয়া বিমানের সাধ্যাতীত! কিছু ফলাহার তাকে করতেই হলো। তস্‌বীরওয়ালাদের বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখেই দেখে থাকেন ঘরঘরিয়া, তার মধ্যে ড্যারিকেটর অন্যতম। মাঝে মাঝে এসে একটু পায়ের ধূলো না হোক—জুতোর ধূলো দিয়ে যাবার অনুরোধ জানালেন। আশা তো তার শিষ্যা, শিষ্যার বাড়ী আসা মোটেই দোষবহ নয়। তার ওপর হোনুমানজীর দোয়ায় দস্তি যখন হয়েই গেল তখন তো আসতেই হবে ড্যারিকেটর সাহেবকে।

অমায়িক ব্যবহারে আপ্যায়িত ক'রে বিদায় দিলেন বিমানকে রাধেশ্যাম ঘরঘরিয়া।

বেশ কিছুদিন আর দেখা নেই বিমানের। আশা একদিন টেলিফোন করলে। বিমান টেলিফোন ধরলে—কথা বললে—শারীরিক কুশলতার কথা জিজ্ঞাসা করলে—ঘরঘরিয়াকে নমস্কার দিতে বললে, কিন্তু সব কিছুই যেন ভাসাভাসা—কথায় নেই তার আন্তরিকতার পরশ। এ বিমান যেন সেদিনের সেই বাদলঝরা দিনের বিমান নয়, এ যেন আর এক নতুন মানুষ!

মুষড়ে পড়লো আশা। বিমানের সঙ্গে তার প্রেম হয়নি, হয়েছিল চোখের নেশা। বিমানেব ঔদাসীন্যে তার চোখের নেশা যেন বেড়ে গেল। সে চঞ্চল, সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো বিমানকে করায়ত্ব করার জন্য। বায়স্কোপের লোক হিসাবে যাকে সে মনেব কোণেও স্থান দেবে না ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ছিল আজ তারই ঔদাসীন্যে তাকে পাবার জন্য বদ্ধপরিকর হলো আশা, মনে মনে জেদ ধবে বসলো।

সেদিন স্যুটিঙ ছিল কিন্তু কোন কাজ ছিল না আশার, বেড়াবার নাম ক'রে আশা ষ্টুডিওতে এসে হাজির হলো। বিমান তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালে, কুশল জিজ্ঞাসা করলে।

আশা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললে, তাড়াতাড়ি স্যুটিঙ শেষ ক'রে নিন, আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—তার মানে?

—অত মানে-টানে বুঝি না। আমার ওখানে আজ আপনার নিমন্ত্রণ।

—নিমন্ত্রণটা কচ্ছে কে—তুমি না রাধেশ্যামবাবু?

—যদি বলি আমি!

জ্বলন্ত সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে স্মিত হাস্যে বললে বিমান, তোমার বাবুরা যদি জানতে পারেন?

— সে দায়িত্ব আমার।

কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলে বিমান। বললে, আচ্ছা, তুমি এগোও। আর কয়েকটা শট্‌ বাকি, সুটিঙ শেষ করেই আমি যাচ্ছি।

—সত্যি বলছেন!

—হ্যাঁ গো—সত্যি—সত্যি—সত্যি! এই তিন সত্যি করলুম। বলে হেসে ফেললে বিমান।

—কি জানি—বায়স্কোপের লোকেদেব বিশ্বাস নেই! তুষ্টু হাসি হেসে আশা ট্যাকসিতে এসে উঠলো।

বেশ একটু রাত কবেই বিমান এসে হাজির হলো। বাহাতুরকে আগে থেকেই গড়ে-পিটে রেখেছিল আশা, বাহাতুর বিমানকে সাদর সম্ভাষণ জানালে।

যস্মিন দেশে যদাচর। বাহাতুর বাবুদের মাইনে করা চাকর, কাজ—বিবিকে পাহারা দেওয়া, মাইনে দেয় বাবুরা কিন্তু চলতে হয় বিবির কথা মত, নইলে চাকরি এদের কোনদিনই স্থায়িত্ব অর্জন করে না। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে— এরা বুঝবে—এ আর বিচিত্র কথা কি!

—এর নাম বুঝি তাড়াতাড়ি সুটিঙ শেষ ক'রে আসা! দেখুন দেখি—ঘড়ির দিকে চেয়ে! বলতে বলতে জানালার ধার থেকে এগিয়ে এলো প্রতীক্ষমানা আশা।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখবে কি—ঘরখানা দেখেই সে অবাক। সারা ঘরখানা ফুলে মোড়া। যে দিকে চোখ ফেরান যায় সে দিকেই ফুল। বিহ্বল বিমানের মুখে কথা ফুটলো না। আজ কি নতুন করে আশার ফুলশয্যা!

—বসুন!

পরিশ্রান্ত পা তু'খানা বসবার জন্য সত্যই উদ্‌গ্রীব কিন্তু বসতে দ্বিধা হচ্ছিল বিমানের। পরণে তার ঘর্ম-মলিন প্যান্ট, গায়ে চাইনিজ

বুস-সার্ট। প্রসাধনবিহীন মাথা ও মুখে সেটের এক পুরু ধূলো। অস্বস্তি বোধ করলে বিমান।

—কি ভাবছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

—ভাবছি—এহেন সুন্দর সেটে এমন সুন্দরী নায়িকার পাশে আমার মত একটি বেমানান জীবকে কি করে খাপ খাওয়াই! আর্টের উপাসক হ'য়ে আর্টকে ক্ষুন্ন করতে প্রাণে সত্যিই ব্যথা পাচ্ছি।

আশা হাত ধরে বিমানকে জোর ক'রে সোফার ওপর বসিয়ে নিজে বসলো হাতলটার ওপর—যেমন ভাবে সেটে সে বসে নায়কের পাশে।

আশার মুখের দিকে চেয়ে বাঁ হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরলে বিমান। ডান হাতে আশার একখানি হাত ধরে সম্মোহন কণ্ঠে বললে, কম্পোজিসনটা ভালই হয়েছে।

—ছবিখানা শেষ হবে কিসে? জিজ্ঞাসু নেত্রে আশা ওর মুখের দিকে চাইলে।

বিমান ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো নীরবে।

—বুঝতে পাচ্ছেন না। আমাদের এই চিত্রনাট্য মিলনান্ত না বিয়োগান্ত?

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো বিমান। বললে, অতদূর এখনো তলিয়ে দেখিনি।

—তা না দেখে ছবির কাজ সুরু করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়না, তাতে ছবির সাফল্য সম্বন্ধে গোড়াতেই মনে সন্দেহ জাগে।

—পাকা পরিচালকরা ভেবে কাজ সুরু-করে না—কাজ সুরু করে ভাবে।

—পরিণামে পস্তাতে হয়!

—পস্তায় প্রযোজক, পরিচালক বা হিরো হিরোইন নয়।

টেলিফোন বেজে উঠলো।

আশা তাড়াতাড়ি উঠে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে, Hallo—কে? ও—তুমি! কেন—হতাশ হবো কেন? কি বললে—তুমি না হয়ে অন্য লোক হ'লে খুসী হতাম! দেখো—তোমার মন বড় সন্দিগ্ধ! কি কচ্ছি—? এ-ই শরীরটা তেমন ভালো নয়। শুতে যাচ্ছি। এ্যাঁ—ঘরঘরিয়া বাবু? উনি আজ এত ভাঙ্ চাপিয়েছেন যে উত্থান শক্তি রহিত। বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে আছেন। ব'লে বিমানের দিকে বঙ্কিম নয়নে কটাক্ষ হানলে আশা—এ্যাঁ—হ্যাঁ কালকে অতি অবশ্য আসবে। কাল আমার স্যুটিঙ নেই। আর দ্যাখো—কাল একটু সকাল সকাল এসো। আমার নতুন ছবির পরিচালককে আমি টেলিফোনে আসতে নিমন্ত্রণ করবো। বুঝতে পাচ্ছো না—পরিচালকদের একটু হাতে রাখা ভালো! হঁ্যা, —কাজ গুছিয়ে নিতে হবে তো! এ্যাঁ—নাম? এরি মধ্যে ভুলে গেলে—নাম তাঁর বিমানবাবু। কি কচ্ছো—বউয়ের সঙ্গে আড্ডা মাচ্ছো নিশ্চয়। কাল কিন্তু আসা চা-ই চাই, নইলে—আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখুনি শুয়ে পড়বো! আচ্ছা—

—কে?

—ওঁরই নাম নিরঞ্জন।

—তা ঘরঘরিয়াবাবুর কথা কি বললে?

—আজ ঘরঘরিয়াবাবুর টাইমের দিন। তিনি গেছেন বাইরে।

—বাইরে কোথা! তিনি তো বিছানার ওপর ভাঙ্ খেয়ে উপুড় হ'য়ে পড়ে আছেন! রহস্যঘন কণ্ঠে বললে বিমান।

বিমানের গালটা টিপে দিয়ে আশা বললে, ওঃ এই নইলে বায়স্কোপ মার্কা লোক! বলে 'যার জন্যে চুরি করি—'

কথা সমাপ্ত করার আগেই আশাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে চুম্বন করলে বিমান নাটকীয় পোজে।

—ধ্যেৎ অসভ্য! নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললে আশা।

স্নান সেরে বাথরুম থেকে ফিরে আসতে প্রায় আধঘণ্টা সময়

লাগলো বিমানের। সোকেসের ভিতর থেকে একটা পাজামা বার করে দিলে আশা। পোষাক ও প্রসাধনের কাজ শেষ করে সুস্থ হ'য়ে বসলো বিমান। মদের সাজ-সরঞ্জাম একটা ট্রেতে সাজিয়ে চাকর দিয়ে গেল। তিনখানা বড় বড় ডিসে এলো ডালমুট ভাজা, আলুভাজা আর ন্যাঙড়া আমের কুচি।

মদে বসবার আগে এক শিশি দামী সেণ্ট বার করে ছাড়িয়ে দিলে বিমানের গায়ে আর বিছানায়। বিমান শিশিটা আশার হাত থেকে নিয়ে ছড়িয়ে দিলে তার সাড়ী, ব্লাউজ, রুমালে।

কথা নেই, শুধু এক লহমার জন্য উভয়ের মুখের উপব খেলে গেল হাসির ঝিলিক।

মদ খোলা হল। কয়েক পেগ খাবার পর আশার একটি হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বিমান বললে, এভাবে বাবুদের চোখে ধূলো দিয়ে ক'দিন চলবে ?

—শুধু বাবুদের নয়, বাড়ীর লোকের চোখেও।

—তবে তো সোনায় সোহাগা। তারপর— ?

—কেন, ভয় হচ্ছে ?

—ভয়! ন্যাঙ্‌টার নেই বাটপারের ভয়। ভয় নয় তবে কেমন যেন একটু চক্ষুলজ্জায় বাধছে। একটা সিগারেট ধরালে বিমান।

—বেশ, তাহলে আর কোন দিন আসবেন না। আমি ডাকতে গেলে আপনাদের ষ্টুডিওর বাহাদুরকে দিয়ে আমায় বার করে দেবেন বা একদম ঢুকতেই দেবেন না। ক্ষুন্ন এবং ক্ষুব্ধ মনে কথাক'টা ব'লে কড়া ক'রে এক পেগ মদ গলায় ঢেলে দিয়ে এক টুকরো আম মুখে ফেললে।

—রাগ করার মত আমি তো তোমায় তেমন কিছু বলিনি। আমি যা কিছু বলছি—সবই তোমার ভালোর জন্য। আমি চাই না যে আমি কারুর ক্ষতির উপলক্ষ হই। তুমি আমায় ভুল বুঝো না, আশা!

ক্ষণেক গুম খেয়ে বললে আশা, মানুষের সব চেয়ে বড় দোষ হচ্ছে সব চেয়ে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান ভেবে নেওয়া। আমার বাবুদের সঙ্গে ডেকে এবং যেচে কেন আপনার আলাপ করিয়ে দিলাম জানেন? আমার দ্বার হবে আপনার কাছে অবারিত অর্থাৎ বন্ধু হিসাবে আপনি যখন তখন ইচ্ছা করলেই আসতে পারবেন।

—কিন্তু বন্ধুরা কি রাত কাটায়?

—কোন বাবুর সঙ্গে আমার কোন বাবুর আলাপ নেই। টাইমের দিন ছাড়া আমার হাতে দিন খালি আছে। খালি দিনে আপনি আসবেন। সেদিন যদি ঘরঘরিয়াবাবু কোন কারণে এসে পড়েন তো বলবো—ঘরে আছে নিরঞ্জন আর নিরঞ্জনবাবু যদি আসেন তো বলবো ঘরে আছেন ঘরঘরিয়া।

—উঃ প্রেম কি সাঙ্ঘাতিক চীজ!

—হ্যাঁ, অবশ্য মেয়েছেলের। আর রাত করেনা, কালতো আবার সুটিও আছে। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন!

আশার নির্দ্দেশে ঠাকুর এঘরেই টিপয়ের ওপর উভয়ের খাবার গরম ক'রে দিয়ে গেল। খাওয়া ওদের সুরু হলো হাসি কথা গল্পের ভিতর দিয়ে।

এবার ফুলশয্যা। ফুলশয্যার রাতে ঘুমোবার মন করলেই কি ঘুমনো যায়। বেড-সুইচের স্তিমিত নীলাভ আলোয় প্রেমের মাতামাতি, লজ্জা মাখা অনুনয় বিনয়, কৃত্রিম ক্ষোভ মান অভিমানের মধ্যে রাত যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যায়—দেখা দেয় ভোরের আলো—তা গবেষণা সাপেক্ষ।

ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিমান তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিলে। বাড়ীর লোক জাগবার আগেই তাকে বাড়ীর চৌকাঠ পেরোতে হবে। জুতোর শব্দে লোকের ঘুম ভাঙার ভয়ে বিমান জুতোজোড়া হাতে নিয়ে নীচে নেমে এলো। পিছনে পিছনে টর্চ ধরে দরজা খুলে দিতে এলো আশা। খিল খোলা হলো অতি

সন্তর্পণে। শঙ্কটজনক বিদায় মুহূর্তে মধুর সম্ভাষণ জানিয়ে বিমান চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলো। আশা দরজা দিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে এলো নিজের ঘরে পা টিপে টিপে। বিমানের পরিত্যক্ত ম্লান মালাটি বুকে চেপে ধরে লুটিয়ে পড়লো বিছানায়।

সঙ্গে সঙ্গে নীচ থেকে মোক্ষদা বাড়ীউলির পাখী পড়ানোর বহু পরিচিত বুলি শোনা গেল :—

কেষ্টো কোথায়?

কেষ্টো মথুরায়।

কেষ্টো কি করে?

কেষ্টো পাতকী তরায়।

শিহরণ জাগলো আশার দেহ ও মনে। উঃ আর একটু হলে সর্বনাশ হয়ে যেতো। হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতো আশা বামাল সমেত! বড় জোর বেঁচে গেছে। ভাবতে ভাবতে আশা পাশ বালিশটা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

সেদিন দুপুরে নন্দর ঘরে বৈঠক বসেছিল। রাজু পান চিবুতে চিবুতে এসে বললে, এত দিন পরে লীলা ফিরে এলো তার বাবুর সঙ্গে।

লীলা তো গেসলো চঞ্চলার সঙ্গে বায়ু পরিবর্তনে। বাবুর সঙ্গে ফিরে এলো মানে—? ক্ষণেকের জন্য প্রায় সকলেই বিহ্বল নয়নে চাইলে রাজুর মুখের দিকে।

লীলার স্বাস্থ্য যে অনুপাতে ফিরেছে—চঞ্চলার স্বাস্থ্য সেই অনুপাতে পটকে গেছে।

—তাই ভালো। আমি মনে করেছি—

নন্দর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাজু বললে, লীলা কোন নতুন বাবু পুরী থেকে পাকড়ে আনলে, কেমন তাই নয়?

আশা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, বাবু বটে—তবে বেটাছেলে বাবু না হ'য়ে এ হচ্ছে মেয়েছেলে বাবু!

গৌরী বললে, লীলার মা যদি শোনে তো একবারে বৃন্দাবনে আগুন ধরিয়ে ছাড়বে!

—তবেই আর কি! আমরা সব ইঁদুরগর্ত খুঁজে তার ভেতর ঢুকে চুপটি করে হরিনাম জপ করি! হক্ কথা বলবো তা সে বাবাই কে জানে আর বাবুই কে জানে। বলে রাজু হাতের রূপালি ছোট্ট কৌটো থেকে এক চিমটি জরদা গালে ফেলে দিলে।

—সে কথা অবশ্য হচ্ছে না। তবে কি জানো—, এ রাস্তায় যখন পা দিয়েছি তখন আমরা সকলেই প্রায় সমান দোষে দোষী! বললে গৌরী।

নন্দ রুখে উঠলো। বললে, তার মানে তুমি কি বলতে চাও যে আমাদেব সকলের প্রবৃত্তি ঐ চঞ্চলারই মত?

—আহা-হা তা নয়। আমি বলছি—যে কাজ আমরা করে পয়সা উপায় করি তা মোটেই—

গৌরীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আশা বললে, তা মোটেই অসৎ কাজ নয়। এ আমাদের ব্যবস্থা। ব্যবস্থা করা পাপ নয়। মুড়িমুড়কীব ব্যবস্থা কবা যদি পাপ না হয় তাহলে আমাদের এই দেহেব ব্যবস্থাকে যে পাপ বলে সে একটি আহাম্মক।

—তাহলে কি বুঝবো যে সতীত্বের কোন দামই নেই।

ঝঙ্কার দিয়ে আশা বললে, সতী যারা তাদের তো আর দেহের বিনিময়ে পয়সা রোজগার করতে হয় না। তা যদি হতো তাহলে সতীর সতীত্ব বলে কিছু থাকতো না। কত মেয়েছেলে চাকরী ক'রে দিনগুজরান করে, কত মেয়ে কলে গতর খাটিয়ে পয়সা উপায় করে; তাদের যদি কোন পাপ না হয় তাহলে আমাদেরও পাপ ব'লে কিছু নেই। আমরাও গতর খাটাই—পয়সা উপায় করি, এ আমাদের

চাকরী—এ আমাদের ব্যবস্থা! পেটের দায়ে যে যে-কাজ করে তাকে পাপী আমরা কোন যুক্তি দিয়েই বলতে পারি না।

রাজু আশাকে সমর্থন করে বললে, নিশ্চয়! পুলিশ শুধু আমাদের ওপর খবরদারি করেই খালাস! দিক না আমাদের এক একজনকে এক একটা চাকরী—কেমন না আমরা এ লাইন ছাড়তে পারি দেখি!

হাসলে গৌরী অর্থপূর্ণ হাসি। বললে, যে যার বাবু ছাড়তে পারবে তো?

—ছাড়বো কেন? আমরা কি বিধবা! যাকে যার ভাল লাগবে তাকে নিয়ে সে স্বামী স্ত্রীর ঘরকন্না করবে। আমরা চির সধবা। এতে আপত্তি করার কি আছে? বললে নন্দ।

—আমাদের আপত্তি নেই বরং আছে অনুমোদন। কিন্তু সমাজ ও সরকার চায় তোমাদের উচ্ছেদ! বলতে বলতে ঘরে এসে সবার মাঝখানে বসলো ললিত।

আশা ঠাট্টা ক'রে বললে, নাও—চোদ্দশাকের মাঝখানে এসে বসলেন ওল-পরামাণিক।

নন্দ বললে, ঢের ঢের ব্যাটাছেলে দেখেছি বাবু কিন্তু এমন মেয়ে-ন্যাকড়া ব্যাটাছেলে কখনো দেখিনি।

—তোমাদের মত ব্যাটাছেলে ঘেঁসা মেয়েছেলে আমিও খুব কম দেখেছি।

—তার মানে? বললে গৌরী।

—মানে—তোমাদের এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল কাদের নিয়ে? ব্যাটাছেলেদের নিয়ে নয় কি?

ললিতের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মন্তব্যে সবাই হেসে উঠলো। মন্তব্য সে নেহাৎ মিথ্যা করেনি, পুরুষকে কেন্দ্র ক'রেই জমে উঠেছিল তাদের আলোচনা।

গৌরী একটু নরম প্রকৃতির মেয়ে—যাকে বলে ভয়-তরাসে।

ললিতের উদ্দেশে বললে গৌরী আহত কণ্ঠে, আচ্ছা দাদা! ঐ যে বললেন, আমাদের উচ্ছেদ করবে—না কি করবে, তাহলে আমরা কোথায় যাবো?

—কোথা যাবে তা কে জানে! দরকার হলে কর্পূরের মত উবে যাবে।

—বাঃ আপনি তো বেশ বললেন!

—বেশ না ব'লে উপায় কি? দেশে পতিতা ব'লে কেউ থাকবে না—এই হচ্ছে সরকারের অভিমত। ফাঁসি কাঠে না ঝুলিয়ে বিষ খাইয়ে না মেরে ছলে বলে কৌশলে পতিতাদের নির্মূল করাই হচ্ছে সরকারের গোপন উদ্দেশ্য। ললিতের বক্তব্যের মাঝখানে রতিপতি এসে আসরে ঢুকলো।

—আমি বাবা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমার দরকার কি! আমি যেমন চুপ ক'রে আছি তেমনি চুপ করেই থাকি, তোমরা কি বল? লোকে কথায় বলে বোবার শত্রু নেই! ব'লে রতিপতি পকেট থেকে একটা গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট বার করলে।

—গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট যখন পকেট থেকে বেরিয়েছে তখন আর তুমি বেকার নও বন্ধু!

ললিতের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরে রতিপতি বললে, বেকার আমি কোনদিন ছিলাম না এবং আজও আমি বেকার নই।

—তার মানে! আজকাল কি কোন চাকরী-বাকরী পেয়েছো নাকি?

মেয়েদের দিকে চেয়ে রতিপতি বললে, আমি তো এদেরি একজন। ব্যবসাদার লোক আমরা—স্বাধীন জীব, গোলামীব ধার ধারি না। যেদিন সওদা হয়—দু'চার পয়সা আসে, আর খরিদ্দার যেদিন ভোঁ-ভাঁ—সেদিন হরিমটর। হ্যাঁ—কিছুক্ষণ আগে কি যেন তুমি বলছিলে—আমাদের মানে পতিতাদের উচ্ছেদ! কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—সে সুদিন বা দুর্দিন কোনদিনই আসবে না। পতিতা

নির্মূলীকরণ প্রচেষ্টা কোন যুগে সাফল্যমণ্ডিত হয়নি আর ভবিষ্যতে হবেও না। প্রচেষ্টা যতবার কার্য্যকরী করার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই তার ফল হ'য়েছে ভয়াবহ, মারাত্মক! ইতিহাস এর প্রমাণ দেবে।

—ইতিহাস ঘেঁটে সে সব প্রমাণও তুমি সংগ্রহ করেছো?

—নিশ্চয়, নজির না থাকলে আন্দোলন চালাবো কিসের জোরে!

বিস্ফারিত নেত্রে ললিত বললে, আন্দোলন! কিসের বিরুদ্ধে?

—পতিতা উচ্ছেদ বা পতিতা দমন নীতির বিপক্ষে। এই আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে আমরা গড়বো এক সমিতি। পুরোদমে সেই সমিতি চালিয়ে যাবে আন্দোলন।

—তাতো চালাবে কিন্তু তোমাদের ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ অর্থ যোগাবে কে? সভা, সমিতিই বল আর যে কোন কাজই বল—অর্থ নইলে কোনটাই এ যুগে জমে না।

—ও সমস্যা সমাধান করবে এরা। যা কিছু খাটা খাটুনি সব তো এদেরি জন্যে। যার যেমন অবস্থা—মাথা পিছু চাঁদা তুলে একটা fund গড়তে হবে। ব'লে রতিপতি মেয়েদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

ক্ষণেক নীরবতার পর ললিত মাষ্টার বললে, কিন্তু যদি ব্যর্থ হও তাহলে এদের ওপর হবে দ্বিগুণ অত্যাচার আর এরা সমস্বরে করবে তোমার বাপ-দাদার উদ্ধার!

মেয়েরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

কোন বাদানুবাদ না করে রতিপতি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা ছোট ত্র'ভাঁজ ক'রে মোড়া exercise book বার করলে।

—ওটি কার ঠিকুজি?

—এদের! এটি নিয়ে কোন নামকরা উকিল, ব্যারিষ্টারের সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে হবে। এদের স্বপক্ষে কি কি নজীর আমি

সংগ্রহ করেছি, শোন। ব'লে রতিপতি খাতাখানি খুলে পড়তে স্নুরু করলে, ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজা নবম লুইস পতিতা বিতাড়ন স্নুরু করলেন। পতিতাদের অর্থ, অলঙ্কার, পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বের ক'রে দেওয়া হলো। ফলে কি দাঁড়াল? রাজা লুইসের নিজের ক্যাম্পে গোপন ব্যভিচার আগের চেয়ে বেশী মাত্রায় স্নুরু হলো। সে ব্যভিচারের গতি রোধ করার ক্ষমতা বাজাব আয়ত্বের বাইরে ছিল।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে, নবম চার্লস সমস্ত পতিতালয়গুলির উচ্ছেদ সাধন করলেন। ফলে—কমা দূরে থাক সংখ্যায় পতিতারা চতুর্গুণ হ'য়ে উঠলো। প্রকাশ্য পতিতালয়ের অস্তিত্ব লুপ্ত হলো বটে কিন্তু তার স্থানে গড়ে উঠলো নতুন ধরনেব গোপন পতিতালয়। এই গুপ্ত পতিতালয়গুলি প্রকাশ্য পতিতালয়গুলির তুলনায় অধিক বিপজ্জনক।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় জোসেপের রাজত্বের প্রথম ভাগে পতিতালয়গুলির পরিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ সাধন করা হয় কিন্তু ফল হয় ঠিক তার বিপবীত। রাজা জোসেপের এই প্রচেষ্টায় সমাজের বা দেশের উন্নতি হওয়া দূরে থাক—অবনতি চরম মাত্রায় দেখা দেয়। সমাজের মধ্যে ব্যভিচারের তীব্র বিষ প্রবিষ্ট হ'য়ে সমাজ জীবন বিষময় করে তোলে। সমাজ-দেহের কোনটি দুষ্ট ব্রণ আর কোনটি নয় তা অতি বড় বিশেষজ্ঞেরও বিশ্লেষণের বাইরে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় পিটস্‌বার্গ পেনিস্যালভ্যানিয়ায় ঘটলো অনুরূপ ঘটনা। সমস্ত বারবনিতাদের বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়ে তাদের দরজায় তালা পড়লো। রাস্তার কুকুরের মত এক টুকরো রুটি, থাকবার একটু আস্তানার জন্য লালায়িত হ'য়ে তারা পথে পথে ফিরতে লাগলো। হ'তে পারে তারা বার-ভোগ্য বরবনিতা কিন্তু তারাও মানুষ। মানুষের ওপর মানুষের এই বর্বরোচিত আচরণে মানব-সমাজে জাগলো এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। মনুষ্যত্বের

অপমান উদ্ভূত সেই আলোড়ন প্রশমিত করতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যুগে যুগে ঠিক একই ভাবে হ'য়ে আসছে মাষ্টার।

ললিত একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে বললে, তারপর?

—এই সব নজীরই আমার ব্রহ্মাস্ত্র! একজন ভাল আইন-জীবির সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা আন্দোলন স্থুরু করবো। কিন্তু আন্দোলনের মূলে চাই অর্থ! নাও—সব ঝট্‌পট্‌ সই কবে ফ্যালো। ব'লে পকেট থেকে আর একটি খাতা আর রসিদ বই বার ক'রে ওদের সামনে ধরে দিলে রতিপতি।

উপস্থিত যারা ছিল তারা সকলেই সই কবলে। টাকা দিলে। রতিপতি তাদের রসিদ কেটে দিয়ে বললে, এই ক'টা টাকাতেই প্রাথমিক কাজ স্থুরু হ'য়ে যাবে। এবার গডতে হবে একটা সমিতি। সমিতির সভ্যদের ওপর থাকবে চাঁদা আদায়েব ভার। বাইরে ঘোরাঘুরির ভার রইলো আমার ওপর। অন্তবালে থেকে কাজ কর্ম একরকম তোমাকেই চালাতে হবে মাষ্টাব, নইলে একা আমি সব দিক বজায় রাখতে পেরে উঠবো না!

ললিত বললে, তথাস্তু!

পুরী থেকে লীলা ফিরে এসেছে নব-যৌবন নিয়ে। লীলার ফিরে আসার খবর পেয়েই ফিরে এলো তার সেই গতদিনের ছেড়ে-দেওয়া মাড়োয়ারী বাবু। প্রথম দিন লীলা তাকে দরজা থেকেই পাঁচ কথা শুনিয়ে ফিরিয়ে দিলে। ও হারামীকে সে আর কিছুতেই ঘরে আসতে দেবে না! ঐ বাবুই একদিন তার মাকে দরজার ধার থেকে কুকুর বেড়ালের মত দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল! সে দিনটা চলে গেছে কিন্তু বাবুর ব্যবহার সে ভুলতে পারেনি।

মা কিন্তু লীলাকে সমর্থন করতে পারলে না। করলেই বা

অপমান! বাবুকে তো এখন আর ঘর ব'য়ে ডেকে আনতে যাওয়া হয়নি, সে যখন নিজেই এসেছে ধন্না দিতে তখন তার টাকাটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া কি বুদ্ধির কাজ! অর্থ দিয়ে নিরূপিত হয় মান আরঅপমানের মাপকাঠি। অর্থের জন্যই তো সেবার অপমান হ'তে হ'য়েছিল বাবুর তুয়ারে! নাঃ কাজটা লীলার ভাল হয়নি। অভাগী আজও অর্থ চিনতে পারলে না! মানের গোড়ায় ছাই দিয়ে যে অর্থকে আমল না দেয় তার উন্নতি সুদূরপরাহত।

মার জেদের কাছে হার মানতেই হলো লীলাকে। ফলে মাড়োয়ারী তুনিয়াবাম আবার এসে ভাঙা আসর জমালে। আগের মত আলাদা ফ্ল্যাটে অধিষ্ঠিতা হলো লীলা। ঝি এলো, চাকর রাঁধুনী এলো, বহাল হলো দ্বারোয়ান। লীলার ভাঙা কুঞ্জবনে আবার বাঁশী বাজলো।

বাঁশীর ঝঙ্কার কিন্তু ভাল লাগলো না একজনের। সে চঞ্চলা! এ তো সে চায়নি। সেচেয়েছিল চিরদিন লীলাকে নিজের তাঁবে রাখতে। বিরূপ হলো চঞ্চলা লীলার ওপর। লীলার অবস্থা বিপর্য্যয়ে দস্তুর-মত মুষড়ে পড়লো চঞ্চলা। প্রাণঢালা ভালবাসার একি নিষ্ঠুর প্রতিদান! প্রাণপাত ক'রে লীলাকে মরণের মুখ থেকে কে ফিরিয়ে আনলে? মেয়েছেলেও এত বেইমান হয়! অস্থি-চর্ম্ম সার হ'য়ে মরণের মুখে যখন লীলা এগিয়ে যাচ্ছিল তখন কোথায় ছিল তার বাবু, এক কান্না ছাড়া কি করতে পেরেছিল তার মা? আজ তারাই হলো তার সর্বস্ব, সে হ'য়ে গেল পর? হায়রে তুনিয়া!

আজও লীলা তার আয়ত্বের মধ্যে আছে—কিছু দিন গেলে—গায়ে তু'ভরি উঠলে—আর চঞ্চলাকে সে চিনতেই পারবে না। যত নষ্টের মূল ওর ঐ কালপেঁচী মা!

লীলাকে হাতছাড়া করা কিছুতেই চলবে না। কি নিয়ে বাঁচবে সে! যেমন ক'রে হোক লীলাকে তার আয়ত্বের মধ্যে চাই।

লীলাকে একান্তে ডেকে নিয়ে চঞ্চলা বললে, ঐ বুড়ো ছাড়া

আর কোন লোককে তুমি আসতে দিতে পারবে না কিন্তু! আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

লীলা ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে। বললে, এ সব তুমি কি বলছো?

ক্ষণেক গুম খেয়ে থেকে হু হু করে কেঁদে ফেললে চঞ্চলা। উচ্ছ্বসিত কম্পিত কণ্ঠে বললে, তুই বিশ্বাস কর লীলা, তোর ঘরে অন্য বাবু—সহ্য করা দূরে থাক, আমি কল্পনাও করতে পারি না। তুই যদি আমার কথা না রাখিস তাহলে বোধ হয় আমাকে আত্ম-হত্যাই করতে হবে।

—এ সব তোমার কি পাগলামি বলতো চঞ্চলাদি! আমি তো তোমারই। বাবু ঘরে আনা শুধু তো পয়সার জন্যে। পয়সা দিয়ে গতর দিয়ে এ যাবৎ তুমি যা করলে তা নিজের মা বোনেও করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছায় বেঁচেই যখন এ যাত্রা উঠলাম তখন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে উপায় তো কিছু করতে হবে। বুঝলাম—তোমার সব কিছু আমারই জন্যে কিন্তু তুমিই বল—কলসীর জল এক নাগাড়ে গড়িয়ে গেলে কতদিন চলবে! অপারক হ'লে নয় কথা ছিল, উপায় করে খাবার মত শরীর, শক্তি যখন ফিরে পেয়েছি তখন কি আর তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকাটা ভাল দেখায়!

চঞ্চলা কিন্তু থামতে চায় না, বোঝালেও চায় না বুঝতে। সে শুধু কাঁদে আর বলে, মাইরি তুই দেখে নিস লীলা—তোর ঘরে অন্য লোক দেখলে আমি নিশ্চয় রক্ত-গঙ্গা হবো। আমার সামনে তুই বাবু নিয়ে ফূর্তি করবি—আর আমি তাই দেখবো! পারবো না—পারবো না—পারবো না—আমি তা কিছুতেই পারবো না!

লীলার মুখে সব কথা শুনে মা তো তার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ছুটে গেল লীলার মা চঞ্চলার ফ্ল্যাটে। বললে কর্কশ কাংস কণ্ঠে, বলি হ্যাঁগা ভালমানুষের বেটী। বলি—এ তোমার কোনদেশী আদিখ্যেতা? তুমি কি

বাছা আমার সোমত্ত মেয়ের আখেরটা নষ্ট করতে চাও! জানি—তুমি আজ পর্য্যন্ত গতর দিয়ে পয়সা দিয়ে করেছো, কে তা অস্বীকার কচ্ছে! তা বলে তুমি আমার মেয়েকে অন্য বাবু ঘরে আনতে দেবে না! ডাকতো বাড়ীর আর পাঁচজনকে, কথাগুলো শুনে যাক তারা আমার মাথায় খ্যাংরা বসিয়ে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এ রকম অলুক্ষুণে কানভাঙানি তো বাছা ভাল নয়!

চঞ্চলা তুটি ঠোঁট এক করলে না। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে লীলার মায়ের তিরস্কার শুনে গেল। চোখের কোণ তুটো তার শুধু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। চঞ্চলা নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কোন জবাব না পেয়ে লীলার মা গজরাতে গজরাতে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকলো।

ক'দিন পরে।

লীলার মা সদাই চেষ্টা পায় লীলাকে চোখে চোখে রাখতে। চঞ্চলার পাল্লায় পড়ে পাছে মেয়েটা বেহাত না হয়ে যায়—এই তার ভাবনা। লীলাকে বারণ করে চঞ্চলার সঙ্গে মিশতে। বাড়ীর লোকের কাছে ফিস্ ফিস্ করে চঞ্চলার নামে কুৎসা রটাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। মেয়েটা যদি বেহেট হ'য়ে যায় তবে তার জন্য চঞ্চলাই দায়ী। নাঃ কি কুক্ষণেই না তারা চঞ্চলার দারস্থ হ'য়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় একটি ছোকরা, ফুটফুটে চেহারা—লীলার নতুন টাইমের বাবু এসে হাজির হলো। লীলার মা দালাল ধরে এই বাবুটি জুটিয়ে দিয়েছে লীলার। মাত্র ক'দিনের ব্যাপার। কাজেই ব্যাপারটা গোপনেই আছে। এক বাড়ীওলা মহাদেব ছাড়া বাড়ীর আর কেউ জানে না, বিশেষ করে জানে না চঞ্চলা।

বাবুর সঙ্গে সঙ্গে এলো তুজন বেয়ারা, একজনের হাতে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে আনা ফুলের বাস্কেট এবং অন্য জনের হাতে ফল, মাংস ও মিষ্টান্ন। লীলার নির্দ্দেশে তার নব নিযুক্ত চাকর ঝুলন নিয়ে এলো এক বোতল বিলাতী মদ। বাবু বাথরুম

থেকে মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এলো। টিপয়ের ওপর কাগজ জড়ান মদের বোতলটা তুলে ধরে বললে, এ মদ কোথা থেকে এলো ?

বালিকাসুলভ মন্দ-মধুর হাসি হেসে ঈষৎ নাকিসুরে বললে লীলা, বাঃ রে—ঝুলনকে দিয়ে যে দোকান থেকে কিনে আনালাম।

বাবু নীরবে ফুলভরা বাস্কেটের তলা থেকে একটি দামী বিলাতী মদের বোতল বার করে লীলার হাতে দিলে।

—আমাকে তো আগে বলতে হয়! আমি মনে করলাম—

—ঠিক আছে!

—বাবা পরেশ! জলখাবারের জন্যে কি খানকয়েক লুচি ভেজে দিতে বলবো ? কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে দরজার পর্দার ফাঁক থেকে জিজ্ঞাসা করলে লীলার মা।

—কোন কষ্ট করতে হবে না মা! অফিস থেকে বেরিয়ে আমি খাবার খেয়েই এসেছি। বললে লীলার বাবু পরেশ।

—তা কি হয় বাবা! কখন অফিস থেকে বেরিয়েছো—সোমত্ত বয়সে না খেলে শরীর টিকবে কেন! এই তো আপনাদের খাবার বয়স।

—ছেলেকে কেউ কি মা 'আপনি' বলে। ব'লে হেসে ফেললে পরেশ।

—উঃ কি দুষ্টু ছেলে! আচ্ছা বাবা, এবার থেকে "তুমিই" বলবো। না বললে শুনবো না বাবা—আমি নিজের হাতে তোমার জন্যে লুচি ভাজতে চললুম। ব'লে অতি বড় দরদীর ক্ষিপ্র গতিতে চলে গেল লীলার মা।

—মা কি সত্যি-সত্যি খাবার করতে গেলেন ?

—সত্যি মিথ্যে মিনিট কয়েক পরেই বুঝতে পারবেন! বাস্কেট থেকে ফুলগুলি তুলতে তুলতে স্মিতহাস্যে বললে লীলা।

—তোমার একাব সাজাতে দেরী হবে। আমিও হাত

লাগাই। বলে পরেশ লীলার সঙ্গে ফুল দিয়ে ঘর সাজাতে লেগে গেল।

ঘর সাজানো শেষ করে পরেশ বললে রহস্যঘন কণ্ঠে, তুমি বড় পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছো, এবার বোতলটা খোলা হোক—কি বল?

—আমি কিন্তু খাবো না।

—কেন, তুমি খাওনা?

—আগে খেতাম—খুব খেতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি একেবারে।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়। অসুখে পড়া পর্য্যন্ত আর খাইনি। আমি যে মবে বেঁচেছি।

পরেশ বললে, সোডা মিশিয়ে অল্প একটু খাও, টনিকের কাজ হবে।

—মা ষদি বকে?

—মাকে বুঝতে দিও না। গোলাপা গোলাপী একটু নেশা হলেই খাওয়া বন্ধ কববে।

বাঃ বে তা বুঝি আবার হয়! মদের গন্ধ বুঝি লুকোনো যায়। মা ঠি—ক ধবে ফেলবে। বলে নিজেই দুটো পেগ গ্লাস টিপয়ের ওপব এনে বাখলে।

—আচ্ছা—সে ভাব আমাব! একান্তই যদি ধরে ফেলেন তবে মা যাতে তোমাকে না বকেন—সে ব্যবস্থা কববো আমি। নাও—ঢালো।

—বিছানার ওপর গিয়ে বসা হবে—না চেয়াবে? পবেশেব মুখেব দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কবলে লীলা।

—সত্যি কথা বলতে কি—ঢালা বিছানার চেয়ে এই চেয়াব টেবিলই আমাব লাগে ভাল। 'বা—' বসে খেয়ে এই অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তোমার বোধ হয় একটু অসুবিধা হ'ব?

—কিছু না, আমার সব অভ্যাসই আছে।

পেগ গ্লাসটি লীলার হাতে তুলে দিয়ে পরেশ বললে, হাজার হলেও বনেদী তো!

—কি বললেন?

—কিছু না। বলেই পরেশ নিজেব গ্লাসটি লীলার হস্তধৃত গ্লাসের সঙ্গে ঠেকিয়ে বললে, খেয়ে নাও!

প্রথম দিন থেকেই ঝগড়া সুরু করলেন!

—এর নাম ঝগড়া নয়, প্রেমের পূর্বরাগ! বলেই পরেশ বাঁ হাত দিয়ে লীলার গলাটি জড়িয়ে ধরে তার মুখে গ্লাস ধরলে।

এক সিপ্ খেয়ে মুখখানা বিকৃত করে লীলা বললে, বেশী করে সোডা দিন, বড্ড কড়া!

—আচ্ছা, মিঠে-কড়া ক'রে দিচ্ছি। ব'লে পরেশ লীলার গ্লাসে বেশ খানিকটা সোডা মিশিয়ে দিলে।

উপর্যুপরি কয়েক পেগ চলার পর লীলা বললে, এবার একটা রেডিও আমায় করতে হবে। আচ্ছা, কত দাম হবে বলুন তো?

—রেডিও হিসাবে দাম। আধুনিক মডেল—সাড়ে তিনশো থেকে হাজার পর্য্যন্ত। যেমন্ন সেট নেবে—দর সেই অনুপাতে হবে হঠাৎ রেডিওর কথা মনে হলো কেন?

—রেডিওতে কেমন সুন্দর হাসির গান হচ্ছে—শুনুন না একবার কান পেতে!

পাশের ফ্ল্যাটে রেডিওতে গান হচ্ছিল:

আমি কেমন ক'রে বলি
তুমি কে আমার।
ভবনদীর তরী আমার
তুমি সর্বসার॥
তুমি আমার সার্ট কোট
কোঁচানো ধুতি।
তুমি আমার আঁধার ঘরের

ইলেকট্রিক বাতি ॥

ফ্যানের হাওয়া তোমার মায়া

সবই দেখি একাকার।

তুমি আমার এ্যালবার্ট ফ্যাসান

ঘাড়ে ছাঁটা চুল।

তুমি আমার হাতের ঘড়ি

বুকে ফোটা ফুল ॥

তুমি আমার ফুলের মালা

বসন্তের বাহার।

তুমি আমার বরষা কালের

ভূণি খিচুরী।

পাটি-সাপ্টা খিরের মালপো

খাস্তার কচুরী ॥

তুমি মনের মত মনহরা

তোমার তুল্য কেবা আর।

গান শেষ হতে লীলা হেসে লুটিয়ে পড়লো। বললে, চমৎকার! ছেলেটির গলায় মোটে আঁশ নেই, একেবারে চাঁচা-ছোলা। ঘরে রেডিও থাকলে মনটা সদাই বেশ প্রফুল্ল থাকে!

—O.K! তোমার মনকে প্রফুল্ল রাখার ভারটা আমিই নিলাম। আগামী শনিবারের মধ্যে তোমার ঘরে রেডিও আসবে। ব'লে পরেশ একটা সিগারেট ধরালে।

চাকর ঝুলন পর্দ্দার ওপাশ থেকে সতর্কীকরণ কাসি কেসে দুটি ডিস নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ডিস দুটি পাশের টেবিলে রেখে দু'গ্লাস জল দিয়ে গেল।

—দেরী করলে জুড়িয়ে যাবে। ব'লে লীলা একরকম জোর ক'রেই পরেশের হাত থেকে মদের গ্লাস নিয়ে টিপয়ের ওপর রাখলে।

—মদের মুখে লুচি!

লীলা নীরবে নিজের চেয়ারটা টেবিলের ধারে টেনে নিলে। পরেশ উঠলো না, যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইলো। লীলা বললে, উঠে আসুন!

—এখন খেলে আর রাত্রে খেতে পারা যাবে না!

—উঠবেন—কি না!

—যদি বলি—না।

লীলা উত্তরে কিছুই বললে না, লুচির টুকরো ছিঁড়ে জোব কবে পরেশের মুখে পুরে দিলে। চিবুতে চিবুতে পরেশ বললে, তুমি খাও!

কোন উত্তর না দিয়ে আর একটুকরো পুরে দিলে পরেশের মুখে। পরেশ এবার উঠতে বাধ্য হলো। বললে, উঃ আর একটু হলে বিষম খেতাম। কৈ—তুমি খাচ্ছো না!

—এখন খেলে আর রাত্রে খেতে পারবো না। ঠাট্টার ছলে ব'লে লীলা না খাবার ভানে সরে দাঁড়ালো টেবিলের ধাব থেকে।

—বেশ কথা—খেয়ো না! ব'লে নিজে খাবাব ভান ক'বে টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল পরেশ। লুচি ছিঁড়ে একটু মুখেও দিলে আড় চোখে লীলাব দিকে চেয়ে।

লীলা সরে গিয়ে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়েই বইলো। লীলার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে পরেশ ঝাঁপিয়ে পড়লো তাব ওপর। লুচির টুকরো তার মুখ চেপে মুখে পুরে দিতে দিতে বললে, তবে রে দুষ্টু মেয়ে! খাবে না!

পরেশের হাত থেকে একরকম জোর কবেই নিজেকে মুক্ত ক'বে নিয়ে লীলা এক ছুট্টে বিছানার ওপর গিয়ে উঠলো। পরেশ বললে, ওখানে গিয়ে ধরতে পারবো না বুঝি!

—কৈ ধরুন না দেখি! ব'লে পেগ-টেবিলের ওধারে গিয়ে দাঁড়ল লিলা!

—বটে! ব'লে পরেশ তাকে ধরবার জন্য পেগ-টেবিলের ওধারে ঘুরে গেল। লীলা ঘুরে এলো এধারে।

দস্তুরমত খেলা সুরু হ'য়ে গেল দুজনে। পেগ-টেবিল পড়তে পড়তে দু'বার রয়ে গেল। ধরবার জন্য ঘোরাঘুরি এদের বেশ জোরের সঙ্গেই সুরু হলো। শেষ পর্য্যন্ত যে যার জেদ বজায় রাখতে গিয়ে পেগ-ঢালা গ্লাস সমেত পেগ-টেবিল দিলে উলটে। এতক্ষণে খেলা এদের সাঙ্গ হলো।

—কি করলেন বলুন তো!

—কি করলে ছ্যাখো তো!

—বাঃ রে আমার দোষ!

—বটে! আমি দোষী!

ঝুলন এসে ভাঙা কাচের গ্লাসের টুকরো, ভাঙা মদের বোতলের টুকরো একটি একটি ক'রে তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এলো। ন্যাতা দিয়ে ম্যাটিনের ওপর ঢেউ খেলান মদ পরিষ্কার করে দিলে।

খবর পেয়ে লীলার মা এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দরদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কারো পায়ে ফোটেনি তো?

—না মা! শুধু মদের বোতল আর—

—ও যাক গে বাবা! কারো হাত পা কাটেনি—এই যথেষ্ট। ও আবার যা চঞ্চল মেয়ে বাবা—

পরেশ তাড়াতাড়ি বললে, যা বলেছেন মা। ভয়ানক চঞ্চল। মেয়েছেলে কি অত চঞ্চল হওয়া ভাল। টেবিল চেয়ার উলটে—একটা বিশ্রী, যাচ্ছেতাই ব্যাপার

লীলা বললে, তার মানে!

পরেশ স্মিত হাসির সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে কথা বলতে নিষেধ করলে।

—বটে আর কি, নিজের দোষটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আবার কথা বলতে নিষেধ করা হচ্ছে।

—তা যে যা-ই বলো বাছা। টেবিল-চেয়ার ওলটানো ও তোমার কাজ ছাড়া আর কারোর নয়। পরেশ আমার লক্ষ্মী ছেলে —মুখ দেখলেই বোঝা যায়! মা বললে বাইরে দাঁড়িয়ে।

—হুঁ-হুঁ মায়ের কাছে তোমার চালাকি আর খাটছে না। না হেসে স্বচ্ছ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে পরেশ নিতান্ত ভালমানুষের মত।

—তা আর জানিনি বাবা! আমার পেটেই তো হ'য়েছে। যাই হোক, কিছু মনে করো না। ও একটু ঐ রকম! ব'লে মা বোধ হয় রান্নাঘরে রান্নার তদ্বির করতে চলে গেল।

অবাক বিস্ময় নেত্রে পরেশের মুখের দিকে চেয়ে লীলা গালে হাত দিয়ে বললে, উঃ আপনি কি! জ্যান্ত মাছে পোকা পড়িয়ে ছাড়লেন! টেবিল ওলটানোর সমস্ত দোষটা বেমালুম আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে দিব্যি ভালমানুষ সেজে গেলেন! ওঃ বলিহারী আপনাকে! সাবাস!

উত্তরে পরেশ শুধু বললে, হুঁ!

—তার মানে? লীলা এগিয়ে এলো পরেশের পাশে।

পরেশ নীরবে একটা সিগারেট ধরালে।

পরেশের নীরবতায় অস্বস্তি বোধ করলে লীলা। কোন কিছু করতে না পেরে লীলা পরেশের মুখ থেকে ধরানো সিগারেটটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

—মাকে কিন্তু আমি ব'লে দেবো লীলা!

অঙ্গভঙ্গি সহকারে মুখখানা ঈষৎ বেঁকিয়ে লীলা বললে, উঁ—হুঁ —হুঁ ছোট্ট খোকাটি! কুলোয় শুয়ে টুলোয় ক'রে ডু-ডু খান। ডাকুন না—ডাকুন! মা এসে আমার হাতে মাথা কেটে নেবে। নিজের ছেলের তো গুণ জানেন না। উনি যে ভিজে বেড়াল।

—তুমি আমার সিগারেট ফেললে কেন? ব'লে পরেশ লীলার একটা হাত চেপে ধরলে, টেনে নিলে তাকে নিজের বুকের কাছে।

লীলার সে বন্ধন ভালই লাগলো. নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার

কোন চেষ্টাই সে করলে না, বরং নিজেকে সে ঢেলে দিলে পরেশের বুকের ওপর।

—কৈ—উত্তর দাও! ঝাঁকানি দিয়ে বললে পরেশ সোহাগের সুরে।

পরেশের মুখখানা নেড়ে দিয়ে লীলা বললে, বেশ করেছি, আমার খুসী

—খুসী! ব'লেই পরেশ লীলার ঠোঁটের ওপর নিজের তপ্ত ঠোঁট চেপে ধরলে।

—উঃ ছাড়ুন!

পরেশ আবার মুখখানা এগিয়ে নিয়ে গেল ওর মুখের ওপর, স্পর্শ সুখানুভবের পূর্ব-মুহূর্তে পর্দার ধার থেকে চঞ্চলা ডাকলে, লীলা!

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় চমকে উঠলো লীলা। এক ঝটকায় সে সরিয়ে দিলে পরেশকে। মহা অপরাধীর মত স্খলিত চরণে সে দরজার ধারে এগিয়ে যেতে যেতে কম্পিত কণ্ঠে বললে, কে—চঞ্চলাদি! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন—ভেতরে এসো!

চঞ্চলা ভিতরে এলো। ঘরের চারদিক বেশ করে দেখে নিলে। লীলার দিকে ফিরেও চাইলে না। পরেশের আপাদমস্তক সে বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে।

অস্বস্তি বোধ করলে পরেশ। অবস্থাটা মানিয়ে নিতে সে কপালে হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে, বসুন!

—আমি বসতে আসিনি। শুষ্ক কণ্ঠে চাঁচা-ছোলা জবাব দিলে চঞ্চলা।

—ইনি আমার দিদি। আজও যে আমি বেঁচে আছি—সে শুধু এঁরই—

লীলাকে মুখ ঝামটা দিয়ে চঞ্চলা বললে, থাম্! গরু মেরে জুতো দান করতে হবে না। কিছু মনে করবেন না মশাই, নমস্কার। একবার বাইরে আয় লীলা!

লীলা মন্ত্রমুগ্ধার মত চঞ্চলার পিছু-পিছু বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

—এই নতুন নাগরটি তোর কবে থেকে জুটলো?

—নতুন জুটেছে।

—এ কথা আমায় বলিসনি কেন?

—এখুনি তোমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম।

দাঁতে দাঁত চেপে রোষরক্তিম নয়নে চঞ্চলা বললে, ডাকতে পাঠাচ্ছিলে! ডাকতে পাঠালেই আমি অমনি হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে আসবো তোমার নাগরের চাঁদ মুখখানি দেখতে। ধিক্ তোকে। তোর লজ্জা-সরম ব'লে কি কিছু নেই! নিমক-হাবাম, বেইমান কোথাকার! আমাকে তুই যা জ্বালা দিচ্ছিস তার শতেক জ্বালা তোকে বাবা বিশ্বনাথ দেবে। তোর বুক-শুল হবে, বুক-বুক ক'রে তুই মরবি—মরবি—মরবি।

—শোন চঞ্চলাদি—শোন। ব'লে রোষভরে গমনোদ্যতা চঞ্চলার একখানা হাত লীলা চেপে ধরলে।

চঞ্চলা এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষিপ্রপদে চলে গেল, লীলা রেলিঙ্‌টা ধরে ফেলে আসন্ন পতনের মুখ থেকে নিজেকে রক্ষা করলে।

নিশ্চল, পাষাণ মূর্ত্তির মত লীলা রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে বইলো। নিজেকে সামলে না নিয়ে সে ঘরে গিয়ে পরেশের সামনে দাঁড়ায় কেমন করে! আনমনা হ'য়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পবেশেব ডাক তার কানে এলো, লীলা! লীলা!

চমকে উঠে লীলা উত্তর দিলে, হ্যাঁ—যাই।

আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছে, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে লীলা ঠোঁটের কোলে কষ্ট-প্রসূত হাসি ঠেনে এনে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

—ব্যাপার কি?

—আমার অসুখের সময় অনেক টাকা ওর কাছে দেনা হ'য়ে গেছে। আজ দেবো—কাল দেবো ক'রে কিছুতেই আর টাকাটা

দেওয়া হ'য়ে উঠছে না। হাতীর মত সংসারে খরচ! সংসার খরচা ক'রে তবে তো দেনা দেবো। পাওনাদারের জুলুম না সয়ে উপায় কি। বলতে বলতে শেষের দিকে লীলার গলাটা যেন ঈষৎ ধরে এলো।

—তা পুলিশের মত অমন এধার ওধার, ঘরের চতুর্দ্দিক বড় বড় চোখ করে চাইছিল কেন। শুধু কি তাই, আমার দিকে এমন ভাবে চাইলে—মনে হলো—ভস্ম করে ফেলবে! বাপ, পাওনাদারনী তো নয় যেন আমার সতীন এলেন! ব'লে হেসে ফেললে পরেশ।

—অমন করে চাইবার মানে আছে। মানেটা হচ্ছে—ঘর এমন ফুল দিয়ে সাজানো হ'য়েছে আর আমার টাকার বেলায় যত অভাব —যত কাঁদুনী! আর আপনার দিকে চাইবার মানে হচ্ছে—মেয়েমানুষের দেনা শোধ না ক'রেই কাপ্তেনী হচ্ছে, অথবা আপনার চেহারা দেখে বুঝতে চেষ্টা করলে যে আপনি ফতো কাপ্তেন কি বনেদী। রেস্তো আপনাব কিছু আছে কি সব ভাঁওতা। মোট কথা—ভবিষ্যতে তার টাকা ফিবে পাবার আশা আছে কি না।

—উনি তাহলে একটি বড় গোয়েন্দা বল!

—বড় নয় বিখ্যাত, তবে গোয়েন্দা নয় নাচিয়ে। উনি হচ্ছেন নৃত্য সম্রাজ্ঞী মিস চঞ্চলা।

—তা—তা কত টাকা উনি তোমার কাছে পাবেন?

—সে অনেক। অন্য সময় বলবো। নাঃ গোলা নেশাটা—! লীলা দোকান থেকে ঝুলনকে দিয়ে আনানো মদের বোতলটা নিয়ে ঢালা বিছানার ওপর গিয়ে বসলো।

—ঝুলন! ঝুলন!!

নীরবে ঝুলন এসে দাঁড়ালো।

—ট্রের ওপর সব কিছু সাজিয়ে দে। এটা খুলে দে! বলে মদের বোতলটা তার হাতে দিলে।

পরেশ লীলার পাশে একটা তাকিয়া এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গদিয়ান হ'য়ে বসলো।

ঝুলন তার কাজ শেষ করে নীরবে ঘর থেকে চলে গেল।

মদ খেতে খেতে পরেশ বললে, আমার একটা অনুরোধ রাখবে লীলা?

লীলার নেশাটা তখন সবেমাত্র জমে উঠেছে। সে চোখ টেনে জিজ্ঞাসু নেত্রে পরেশের মুখের দিকে চাইলে।

—পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় সব কিছু যেন কেমন ঝিমিয়ে এলো। একখানা গান গাইবে! পরেশেব কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

—অনেকদিন গাইনি। গান জমবে না। তাছাড়া সঙ্গত তো চাই। এত রাতে তবলচী কোথা পাবো।

—তবে কি গান হবে না!

—নিশ্চয় হবে, তবলচী হাজির। নমস্কার মশাই! বলতে বলতে রতিপতি পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

—আরে রতিপতিদা যে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে লীলা।

জোড় হাত ক'রে বতিপতি পবেশকে বললে, আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য আমায় মাপ করবেন। এ পাড়ায় যে কোন ঘরে আমার এই ধরনেব অনধিকার প্রবেশকে নবাগত বন্ধুরা ক্ষমার চোখেই দেখে থাকেন।

—নমস্কার। নমস্কার!! বসুন।

সোফাটার ওপর বসতে বসতে বতিপতি বললে, ঘরেব বাবান্দায় দাঁড়িয়ে বাড়ীওলা মহাদেববাবুব সঙ্গে কথা বলছিলাম, হঠাৎ লীলার কথা কানে গেল—এত রাতে তবলচী কোথা পাবো। এ কথা শুনে কোন অভাবগ্রস্ত পেশাদার তবলচী কি ঠিক থাকতে পারে মশাই! বাড়ীওলাদাকে বিদায় দিয়ে চট্ কবে ঢুকে পড়লাম। কেমন, আমার নাটকীয় প্রবেশে নিশ্চয় আপনাবা—

—ভারী আনন্দ হলো। এক মুহূর্তে আপনি যেন ঘরের থমথমে আবহাওয়া হাসি-কথায় ভরিয়ে দিলেন। সাগ্রহে বললে পরেশ।

—শোন লীলা—শোন! তবু এখনো বাজাইনি আর তবলার

বোল ফুটিয়ে গানও ধরিনি। ‟ব'লে রতিপতি নিজেই হোঃ হোঃ করে দিলখোলা হাসি হাসতে লাগলো।

—একি তোমার ছিরি হ'য়েছে! ছেঁড়া ময়লা জামা .কাপড়, এক গাল দাড়ি, চুলগুলো রুখু, উসকো-খুসকো, মুখখানা শুকিয়ে ·গেছে, বেশ খানিকটা রোগাও হয়ে গেছ! এ ক'দিন তোমার পাত্তা নেই, ছিলে কোথা? বললে লীলা।

স্মিত হাস্যে রতিপতি বললে, জেলে।

—জেলে!

—হ্যাঁ, জেলে। চেহারা আর পোষাক দেখে বুঝতে পাচ্ছো না। সত্যি জেল থেকে খালাস পেয়েই তোমাদের বাড়ী আসছি।

পরেশ নীরবে বিস্ফারিত নেত্রে রতিপতির মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—জেল হলো কেন? কি কবেছিলে? লীলা যেন কিছুতেই তার আগ্রহ দমন করতে পাবছিল না। সে একদমে সব কিছু শুনে নিতে চায়।

মদ ভর্তি বোতলটার দিকে চেয়ে রতিপতি বললে, বোতলটা দেখছি ভর্তিই আছে।

—মুখ দেখে বোধ হচ্ছে—তোমার কিছুই খাওয়া হয়নি!

—ওরে দিদি! মদ খালি পেটেই খেতে হয়, তবে নেশা জমে। স্বাস্থ্য আর নেশা—একটার সঙ্গে আর একটার ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। নিমকহারামী করবো না, সরকারের অতিথিশালায় আজ সকালে লপসী খেয়েছি।

—তারপর?

—তারপর—গলা কাট হয়ে শুকিয়ে গেছে। সরস না হলে আর বাক্যি বেরুবে না। আহা-হা থাক্ থাক্—আপনি কষ্ট করবেন না, আমি নিজেই সব ক'রে কম্মে নিচ্ছি। আর একটা গ্লাস দাও তো দিদি!

সবাইকে মদ পরিবেশন করে নিজে পুরো একটি পেগ গলায় ঢেলে দিয়ে রতিপতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আঃ!

মদের গ্লাসটি হাতে নিয়ে লীলা বললে, তোমায় ধরলে কেন ?

একটা সিগারেট ধরিয়ে রতিপতি বললে, বরাতের ভোগ আর বলে কাকে। রাত তখন সবে মাত্র ন'টা। 'পতিতা-তারণ' সমিতির খাতাপত্র বগলে নিয়ে আমি তোমাদের গলির মুখে ঢুকতে যাচ্ছি, ভাত্তু পানওলা চুপি চুপি বললে, বাবু ভেতরে যাবেন না হাল্লা বেরিয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরছে। আজ বড় গোলমাল, সরে যান।

—আমি শ্রীরতিপতি—ভূতপূর্ব প্রফেসর, এম-এ, পি, আর, এস্, এ পাড়ার নামকরা তবলা বাজিয়ে—, তার কথা কানে না তুলে বীরদর্পে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গলির মাঝামাঝি আসতে না আসতেই catch-caught-caught, তুপাশ থেকে তু'ব্যাটা পুলিশ তু'খানা হাত জোরসে চেপে ধরলে। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব পিছন থেকে সার্টের কলার এমনি ভাবে টেনে ধরলে যে ঘামে ভেজা জামা পড়-পড় ক'রে বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। চোখের পুলকে আমাকে ঘিরে একটি ব্যূহ রচনা ক'রে ফেললে। ডাকু মনসুরকে গ্রেপ্তার করতে নবাবজাদার সৈন্য সমাবেশের এ আর এক দ্বিতীয় সংস্করণ।

—তারপর ?

—তারপর সুরু হলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন। যথা—আমি কি করি, কোথা থাকি, এ পাড়ায় ঘোরাঘুরির উদ্দেশ্য কি, ক'টা মেয়েমানুষ আছে আমার—ইত্যাদি !!

—তুমি কি বললে ? জিজ্ঞাসা করলে লীলা সাগ্রহে।

—বললাম—গুণ্ডা বদমায়েস সায়েস্তা না ক'রে আমার মত নিরীহ ভদ্রলোকের ওপর আপনার এ অযথা উৎপীড়ন মানেই ক্ষমতার অপব্যবহার! পুলিশের কাজ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তারাই যদি নিরীহ লোকদের ওপর উপদ্রব ক'রে অশান্তি সৃষ্টি করে তাহলে

সেটা কি পুলিশের বদনাম নয়। আমি দাগী আসামী নই, শুধু শুধু আমার ওপর আপনাদের এ জুলুম কেন! এ রাস্তায় চলাও নিষিদ্ধ নয়, কাজেই অপরাধের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। ধরে নিন—যে কোন বাড়ীতে আমি যাচ্ছি, যাওয়াটা অপরাধ নয়!

—এত লেকচার দিতে গেলে কেন!

—যা বলেছো—লেকচারই হলো আমার কাল! হেড কনেষ্টবল থেকে সাব-ইন্সপেক্টর হয়েছে, সে আমার প্রফেসরী লেকচার শুনে বোঝা দূরে থাক—চটে উঠলো। ব্যাচারাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, মগজে না ঢুকলে মানুষ কি করতে পারে! আদেশ জারী হ'য়ে গেল—'দুষমণ লোককো লরীপর উঠাও।'

—ব্যস আর যায় কোথা! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। বলিদানের পাঁঠা-টানার মত টানতে টানতে তারা আমায় নিয়ে গিয়ে প্রায় ছুঁড়ে লরীর ওপর ফেলে দিলে। 'খোদা তেরি ভ্যালা করে' ব'লে বাঁশের গাড়ীতে চেপে থানায় চলে গেলাম।

—এই গরমে প্রায় পঞ্চাশজন লোককে থানার মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে। ঘরের দরজায় সঙ্গে সঙ্গে তালা পড়লো। কড়িকাঠের কাছে মাত্র দেড়হাতি একটা ছোট্ট জানলা। অবস্থাটা বোঝ। মনে পড়লো ইতিহাসে ... অন্ধকূপ হত্যার কথা!

—সারা রাতভোর জামিন দিয়ে খালাস করার হিড়িক চললো। জামিনদার যাদের জুটলো না তারাই রইলো ফাটকে আটকে। ঘরের এক কোণে ছোট্ট নর্দামা প্রস্রাবের জন্য নির্দিষ্ট। প্রস্রাব ক'রে ক'রে ঘরের আধখানা মেঝে পর্যন্ত তারা ভাসিয়ে ফেললে।

—দুপুরে হাজির করা হলো আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে। সবার নামে একটা করে চার্জ। কালীপূজো'র রাত্রে কালীঘাটে পাঁঠা কোপানোর মত এক একজন আসামীর ডাক পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে রায় দেওয়া হ'য়ে যাচ্ছে—বিশ, পঁচিশ, তিরিশ টাকা জরিমানা।

'দোষী জানিল না কিবা অপরাধ—বিচার হইয়া গেল!' এর আর যুক্তি তর্ক নেই, মুখ খুললেই জরিমানার হার দ্বিগুণ, তিনগুণ হ'য়ে যাবে।

—আমার মত পকেট যাদের গড়ের মাঠ, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের বালাই যাদের নেই—জরিমানার বদলে হলো তাদের জেল। গাড়ি ভর্ত্তি হ'য়ে চ'লে গেলাম জেলে। বরাতের ভোগ যে ক'দিন ছিল সে ক'দিন সরকারের ব্যাগার দিয়ে আবার ফিরে এলাম স্বস্থানে। ব'লে রতিপতি পেগ গ্লাসগুলি পূর্ণ করলে।

—তুমি তো আমাদের বাড়ী খবর দিতে পারতে রতিপতিদা!

—শুধু শুধু তোমাদের সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত করে লাভ কি বল। জেলের অভিজ্ঞতা তো কোনদিন ছিল না, এ একরকম নিঃখরচায় সব কিছু দেখে শুনে এলাম। ব'লে রতিপতি মদের গ্লাস গলায় ঢেলে দিলে।

গল্প করতে করতে আরো কয়েক পেগ সবার পেটে পড়লো।

পরেশ বললে, এবার গান হোক।

লীলা বললে, রতিপতিদা আগে একখানা গেয়ে আসর জমিয়ে দিক!

—তা কি হয়! Ladies first. ব'লে রতিপতি ডুগি আর তবলা দুটো বাঁধতে লেগে গেল।

—ধর—কি ধরবে ধর! ব'লে উড়ো সঙ্গত করতে সুরু করলে রতিপতি।

লীলা হারমোনিয়ম বাজিয়ে গুনগুন ক'রে সুর ভাঁজছে, হঠাৎ দরজার পর্দা সরিয়ে গীত কণ্ঠে স্খলিত চরণে টলতে টলতে ঘরে ঢুকলো বাড়ীওলা মহাদেব ঃ—রাঙা চরণ যেও নারে বেঁকে।

ঠিক আছি—তাই বলছি আমি, যাচ্ছি এঁকে বেঁকে॥

রাস্তায় পড়বো মজার মুখে
কুকুর এসে মুতবে মুখে

পাহারাওলা বেটা আসছে ছুটে
আমার ওপর ঝেঁকে ঝুঁকে।
বড় মজা রাস্তায় পড়া—
চৌকিদারের ঝোলায় চড়া—
রাজবাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়া
এমন সুখ আর বলবো কাকে।

মহাদেবের গান শেষ হওয়া মাত্র রতিপতি লীলার হাত থেকে হারমোনিয়ম নিয়ে গাইতে সুরু করলে ঃ—

পা টোলে পা টোলে—
খানায় পড়ে পা এতো বড় মজা।
দু'বোতল মদ খেয়েছি
চাঁট কবেছি গজা॥
ডুবেছি গড়েব মাঠে
উঠেছি কালীঘাটে
চড়েছি ষ্টিম বোটে
খাচ্ছি পাঁপব ভাজা।
মা কালীর এই করুণা—
মাতাল যেনমদ ছাড়েনা
গলি থেকে বেরিয়ে দেখি
ছোলা মটর ভাজা॥

পরেশ আর লীলার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার অবস্থা। হাসির দমক সামলে নিয়ে লীলা বললে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এসব খোলার বস্তির গান কোথা থেকে সব শিখলেন। যেমনি মহাদেবদা তেমনি হয়েছে আমাদের রতিপতিদা! গান আর ভূভারতে সব খুঁজে পেলে না!

—কেন, এর মধ্যে তো একটা কথাও অশ্লীল নয়!

—নিশ্চয়! মদের আসরে মদের গান গাইবো নাতো কি

গাইবো শিবের গীত! কি বলেন পরেশবাবু! ব'লে মহাদেব পরেশের পাশে গিয়ে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলো।

—পরেশবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি? জিজ্ঞেস করলে লীলা।

—তোমার এই পরেশবাবুকে মদ তো আমিই ধরাই! সে কি আজকের কথারে ভাই! বছর কয়েক হ'য়ে গেল ওঁদের জমিদারী বিড়শিবপুরে মাছ ধরতে গিয়ে আমাদের প্রথম আলাপ। কেমন—তাই নয় পরেশবাবু? দেখুন—ভরপুর মদ খেয়েছি, নেশা হয়েছে দস্তুরমত, কিন্তু জ্ঞান বাবা চার পো টনটনে আছে। অত দিনের কথা—একটুও ভুলিনি!

নীচ থেকে মহাদেবের উদ্দেশে বাড়ীউলি মোক্ষদার কাংস কণ্ঠ ভেসে এলো। খেতে যাবার তাগিদ।

মহাদেব ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বললে, ঐ আস্থি কালের বস্থি বুড়ীকে মাইরি এবার তালাক দেবো। দিতে পারো হে রতিপতি—একটা ভালো কাঁচা বয়সী মেয়েমানুষ জোগাড় করে! যত বুড়ো হ'চ্ছে তত ও বেটী হচ্ছে হারামজাদের একশেষ। আরে তুই নয় বুড়ী হয়েছিস কিন্তু আমি তো হইনি, আমার সাধ আহ্লাদ গেছে কোথা। আমাকে একটু স্ফূর্ত্তি করতে দেখলেই ও বেটীর বুকটা চড়চড়িয়ে ওঠে। হতচ্ছাড়ী মরেও না যে একটু হাত পা ছড়িয়ে বাঁচি।

—ছিঃ মহাদেবদা! বুড়ো হ'য়েছে বলে বাড়ীওলাদিকে এমনি ভাবে গালাগাল করবেন! নাঃ এ আপনার ভারি অন্যায়। ঈষৎ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললে লীলা।

আবার নীচ থেকে বাড়ীউলি মোক্ষদার কাংস কণ্ঠের ডাক এলো মহাদেবের উদ্দেশে।

—এ্যাই! খবরদার অমন ছোটলোক বস্তির মেয়েমানুষের মত চেঁচাবিনা বলছি! ফের চেঁচালে—নীচে নেমে তোর যদি টুঁটি না

চেপে ধরি তো আমার নাম মহাদেবই নয়। বলতে বলতে মহাদেব টলটলায়মান অবস্থায় ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

নীচ থেকে বাড়ীউলি বললে, খাইয়ে দাইয়ে গায়ে গত্তি লাগাচ্ছি —আমারি তো টুঁটি চেপে মারবার জন্যে! হারে নিমুখারাম (নিমকহারাম) বেইমান জাত! মরগে যা—, না খেলি তো আমার বড় বয়েই গেল। আমি আপনার খেয়ে দেয়ে হাঁড়ি-কুড়ি তুলে দিই।

—সত্যি যদি হাঁড়ি-কুড়ি আজ তুই না তুলে দিস তবে তুই তোর মরা বাপের হাড় খাস! বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বললে মহাদেব।

—রাতদুপুরে একি মেয়েলি ঝগড়া সুরু করলে মহাদেবদা! বললে রতিপতি।

—তুমি শুদ্ধো আমার পিছনে লাগলে, রতিপতি! উঃ মেয়েছেলের পক্ষ হ'য়ে সবাই কথা কয়বে বাবা! কি আর বলবো, যেন আসছে জন্মে মেয়েছেলে হ'য়ে জন্মাই!

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল মহাদেব, লীলা তার হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।—বাপ্—মেয়েদের মত এত ঝগড়াও করতে পারেন!

আবার মদ এলো। আবার নতুন ক'রে রাত দুপুরে জমলো নাচ, গান আর মদের আসর!

"প্রিয়ে তোমারই তরে একটা বিড়ালছানা ধরেছি।
একে অতি যত্নে অতি কষ্টে ড্রেন থেকে তুলেছি॥
তোমার ঘরে বড় ইঁদুর—
এবার তা হবেরে দূর,
বাড়ীময় যেয়ে করবে মিউ মিউ মিউ।

আমি গেলে বিদেশে
পোড়া প্রাণ বাঁচবে লো কিসে,
একলা কেন থাকবে তুমি
দোকলা ঘরে এনেছি।”

রাতদুপুরে রাস্তার রকে ব'সে একটা বেড়ালছানা কোলে নিয়ে গাইছিল বিন্দু পাগলি।

পাশের বাড়ীর বারান্দা থেকে একটি মেয়ে বললে ঈষৎ বিরক্তি ভরা কণ্ঠে, রাত দুপুরে কি চেঁচামেচি সুরু করেছিস বিন্দু, মানুষকে ঘুমুতে দিবি না!

—বাঃ রে বা—! আমায় এখন গানে পেয়েছে—গাইবো না! তোমাদের ঘুম না আসে গান গাও, বাবুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দাও, রেগে গিয়ে ঘরের সো-কেস আলমারি ভাঙো! আর তা যদি না পারো তাহলে দু'পাঁট মদ খেয়ে যার ওপর গায়ের ঝাল আছে তার বাপ-চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার কর!

—উঃ মুখ বটে তোর! কাঠের হলে ফেটে যেত্তো। কি আর এমন অন্যায় কথা তোকে বলেছি যে তিনকুড়ি কথা শুনিয়ে দিলি!

বিন্দু বললে, আমি নয় রাস্তায় বসে গান কচ্ছি কিন্তু পাশের ঘরে যখন তিনপোর রাতে হল্লা হয় তখন তো কেউ রা-কাড়েনি! কেন—তারা সব সোনাদানা পরে আর আমার বুঝি শুধু নোয়া-গাছটি সার ব'লে। তাদের সব বাবু-ভেইয়া আছে আর আমার নেই কেউ তিন কুলে সলতে উস্‌কোতে!

অপর পক্ষ নীরব।

—ছ্যালো গো ছ্যালো! আমারও একদিন ছ্যালো! গাড়ী ছ্যালো—বাড়ী ছ্যালো—বাবু ভেইয়া ছ্যালো! আজ আমি পিরীতের জ্বালায় তিনকুল খেয়ে বেহ্মচারী!

মেয়েটির উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্য ভরে ব'লে বিন্দু আবার গান ধরলে,

হাট বাজারে মেলে না প্রেম

মর কেন মাথা খুড়ে।

ছেড়ে রহিম বলতো রাম

তাহলে যত পাতি নেড়ে॥

সেযে প্রাণের বাঁধন—

হয়না ছেদন.

সমন দমন করে সে—নয় মরতের নয় সরিফের।

ও তার ত্যাগেই ধর্ম, ত্যগই কর্ম—

বাঁচে ত্যাগের তরে।”

—হুঁ, বেটীরা আমাব গানকে ব'লে কিনা চেঁচামেচি! ব'লে কিম্-ভূত-কিম্-আকার অঙ্গভঙ্গি ক'রে বিন্দু বললে, আহা-হা বেটীরা কি আমার সব কোকিল-কণ্ঠী-শিরোমণিরে! বিদ্যেধরিদের যেমন রূপ—তেমন গলা! গলার আওয়াজ—সা বে গা মা পা ধা নি সা—, মা মা গা ধা শুনলে ধোপার গাধা ছুটে আসে।

—এ্যাই পাগলি! রাস্তায় ব'সে একা একা চেঁচাচ্ছিস কেন? বললে পথ-চলিত পাহারাওলা।

পাহারাওলাকে দেখে হেসে কুটি-কুটি হলো বিন্দু। সে সুর ক'রে গাইলে, “বাবা লাট সাহেব যে তোমার নীচে

তুমি ওপরওলা।”

—এ্যাই পাগলি। ধমক দিলে পাহারাওলা।

—বলি বাপ্ লাল পাগড়ি! নিশুত রাতে আমার মত সোমত্ত মেয়েছেলের কাছে ঘুর ঘুর কচ্ছো কেন মাণিক! তোমার মতলব তো বড় ভাল মনে হচ্ছে না! জানতো—এ লাইনের মেয়েছেলের সঙ্গে নিঃখরচায় কথা ব'লে মসকরা করা যায় না, টাকাটা সিকেটা কি আছে ঝাড়ো।

হেসে ফেললে পাহারাওলা। বললে, এতো রাতে তুই রকে বসে কেন?

—বলিহারী বাবা মাণিকপীর! রক ছাড়া পাগলি কোথা যাবে বল! রাখো না তুমি আমায় বাঁধা, দাও তিনতলায় ঘর ভাড়া করে! তোমাকেও তাহলে আর রোদ দিয়ে লাঠি ঠক্ ঠকিয়ে ঘুরে মরতে হবে না আর আমাকেও আর একা একা বেড়ালছানা বুকে নিয়ে রাত কাটাতে হবে না!

—কে ব'লে তোর মাথা খারাপ, দিব্যি তো কথা বলতে পারিস!

—এঃ আবার হাসি হচ্ছে। বলে—ভাত কাপড়ের ভাতার নয়
নাক কাটবার গোঁসাই!

পাহারাওলা পাগলি বোঝাতে চেষ্টা পায়, ওরে পাগলি! আমরা হচ্ছি পুলিশ! আমাদেব কখনো কি তোদের কাছে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে আছে।

মুচকি হেসে পাগলি ছড়া কাটলে—

কত্ত এলো রথারথী
আব শ্যাওড়া তলায় চক্রবর্তী।

—তুমি তো তুমি! তোমার ওপরওলাবাই এর তার ঘরে যাবার জন্যে ঘুর ঘুর ক'রে মচ্ছে আর তুমি তো কা কথা!

—কি বলছিসরে পাগলি!

—পাগলি সব ঠিকই বলে। যার চেহারাটা একটু লচপচে দেখলে পুলিশের বড়বাবু থেকে সুরু ক'রে চুনোপুটিবাবুর নোলাটা পর্য্যন্ত লক্‌পক্ করে উঠলো। ভাল কথায় হোক, ভয় দেখিয়ে হোক— নিঃখরচায় কার্য্য উদ্ধার তারা করবেই করবে। রক্ষক তো নও —তোমরা হচ্ছো সব এক একটি ভক্ষক! উঃ এরি নাম স্বাধীন রাজত্ব!

—তুই বড্ড বাজে কথা বলছিস পাগলি। তোকে ঠিক একদিন থানায় ধরে নিয়ে যাবো। রহস্যঘন কণ্ঠে বললে পাহারাওলা।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো পাগলি। অট্টহাসি হেসে বললে, এত

বোকা তোমরা নও! আমাকে ধরে নিয়ে গেলে তোমাদের বাঁশের লরী ভাড়াও উঠবে না। জরিমানা করবে—? টাকা দেবে কে—? জেল দেবে! খোরাকী বেঁচে যাবে। যখন বেরিয়ে আসবো তখন তোমাদের জেল শুদ্ধো সবাইকে পাগল ক'রে দিয়ে আসবো। রাঁচি, বহরমপুর আর হাঁটাহাঁটি করতে হবে না—ওটাই হবে পাগলা গারদ। যাও—সরে পড়! ঘুষিয়ে ঘুষিয়ে এসে জমাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এখন আমার মাথা ভাল আছে—বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না!

—তোকে একদিন নিশ্চয় ধরে নিয়ে যাবো! ব'লে স্মিত হাস্যে পাহারাওলা চলে গেল।

পাহারাওলার শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পাগলি উচ্চকণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় মন্তব্য জাহির করলে তার গমন পথের দিকে চেয়ে!

নন্দর চাকর গৌতম মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে রকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে একটা ইটে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে পাশের দেয়ালটা ধরে সামলে নিলে।

—মুয়ে আগুন সব! মদ খেয়ে নিজেকে যদি ঠিক রাখতে না পারিস তো অমন ঘোড়ার ইয়ে খেয়ে মরিস কেন! ভাগ্যিস দেয়ালটা ছিল নইলে মুখপোড়া আমার ঘাড়েই পড়ে যেতো। আঁটকুড়ির বেটাদের পুলিশে ধরে নিয়ে ঠিক করে!

—খবরদার! মু সামালসে বাত্ করো। নইলে একটি— বলতে বলতে গৌতম ঘুষি পাকিয়ে বিন্দুর সামনে এসে দাঁড়াল।

—ও মুখপোড়া যমদূত! দিনের বেলা তুমি ন্যাকা বোকাটি সেজে থাকো আর রাতের বেলা তোমার এই কীর্তি! ডাকবো একবার নন্দকে?

তাচ্ছিল্য ভরে গৌতম বললে, আরে যা—! আমি তো নন্দর বাপের ঠাকুর আছি! হামি করবো নন্দকে ভয়! হাঃ হাঃ হাঃ —হোঃ হোঃ হোঃ—হিঃ হিঃ হিঃ—!

—আ—মর ড্যাকরা ভূত! নন্দ তোর মনিব নয়—! মনিবকে অমন উঁচু-নীচু কথা বলতে আছে!

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে নন্দর কথা সে উড়িয়ে দিলে। বললে একঠো সাচ বাৎ বল্ পাগলি—নন্দর ঐ শালা মাড়োয়ারী বাবু চলিয়ে গেছে?

অবাক হ'য়ে বিন্দু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আজ পর্য্যন্ত কোন চাকরকে তার মনিবের নাম ধরে ডাকতে সে শোনেনি। যে বাবু তাকে প্রতি মাসে মাহিনা দেয়, খোরাক দেয়, দেয় বখশিস—সে বাবুকে হীন গালাগাল দিতে জীবনে কোনদিন কোন চাকরকে শোনেনি বিন্দু। মদ খেয়ে গৌতমটার মাথা কি খারাপ হ'য়ে গেল!

মনিবের কাছে ছুটি নিয়ে কোন কোন চাকর কচিৎ কদাচিৎ মদ ভাঙ খেয়ে নেশা করে—, তাও করে লুকিয়ে! এমন ডাকাবুকো ভাবে মদ খেয়ে নিজেকে জাহির বোধ হয় গৌতমই প্রথম করছে।

হোঃ হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলো পাগলি আপন মনে। গৌতমের বেল্লিকপনা একবার যদি নন্দর কানে যায় তবে কি আর মুখপোড়ার চাকরী থাকবে! মারবে আ-ধোয়া খ্যাংরা—দেবে লাথি মেরে দূর করে। হতচ্ছাড়ার মরণ চিট-পিটিনি ধরেছে।

বিন্দুকে নিরুত্তর দেখে গৌতমের রাগ হ'য়ে গেল। সে খপ ক'রে বিন্দুর কোল থেকে বেড়ালছানাটা তুলে নিলে। বললে, সাচ্ বাত্ না'বলবি তো মারবো তোর বিল্লীকে এক আছাড়!

—ওরে ও হুম্ব ভূত! রাখ্—রাখ্ বলছি আমার বেড়ালছানা! ওগো অ নন্দবিবি—, তোমার এই উলোর ভূতের কাণ্ডটা একবার গ্যাখো এসে। ব'লে পরিত্রাহী চীৎকার সুরু ক'রে দিলে বিন্দু।

বিন্দুর হাজার ডাকেও সাড়া দিলে না নন্দ। সাড়া না দেবার কারণ থাকলেও শুনতে না পাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। নন্দদের বাড়ীর নীচেই রক, এই রকই হচ্ছে পাগলি বিন্দুর আস্তানা। হয়

নন্দ নেশা ক'রে নিঝুম হ'য়ে পড়ে আছে অথবা ইচ্ছা ক'রে সে সাড়া দিচ্ছে না।

ডাকাডাকি ছেড়ে বিন্দু এবার অশ্রা গালাগালি সুরু করলে নন্দর উদ্দেশে। চাকরের নষ্টামির জন্যে দায়ী তো তার মনিব। যে মনিব চাকর শাসন করতে না পারে—তার উচিত নয় চাকর রাখা।

আশপাশের বাড়ীর লোক জাগলো—জাগলো না শুধু নন্দ। গৌতম হোঃ হোঃ করে হেসে বিড়ালছানা ছুঁড়ে বিন্দুর গায়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে তাদের সদর দরজার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দরজার খিল খুলে গেল।

এত রাত্রে এত সহজে কেউ যে তাকে খিল খুলে দেবে তা সে মোটে আশাই করেনি। ভিতরে ঢুকে গৌতম দেখলে—তার মনিব নন্দ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

—বাবু শালা গেছে!

—চুপ—জানোয়ার! ব'লে নন্দ অতি সন্তর্পণে দরজায় খিলটা দিয়ে চোরের মত পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এলো।

যে যার নিজের ফ্লাটে কথা বলছে, ফাঁকা সিঁড়ি, রাতও হ'য়েছে গভীর, কারোর সঙ্গেই দেখা হলো না নন্দর। সে নিজের ফ্লাটে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

ঘরে ঢুকে পাখাটায় ফুল স্পীড দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলো নন্দ। গৌতমের সব কথাই ভিতর থেকে তার কানে এসেছে। লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে, দুঃখে—মরমে ম'রে গেছে নন্দ। রাত পোহালে সে লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে! চাকরের সঙ্গে তার গোপন পিরীতের কথা যখন বাবুর কানে উঠবে তখন বাবুর সামনে গিয়ে সে দাঁড়াবে কেমন করে! উঃ এর চেয়ে তার মৃত্যু ভাল!

দিনের আলো ধরার বুকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও কুৎসা ছড়িয়ে পড়বে সারা পাড়ায়। সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, মেয়েছেলে জাতের কলঙ্ক হিসাবে করবে তার মৃত্যু কামনা ' ঘরে

ঘরে ঢি ঢি পড়ে যাবে। সবার মুখে ধ্বনিত হবে—নন্দ আর গৌতম—গৌতম আর নন্দ! নন্দ মনিব আর গৌতম চাকর—অপূর্ব মিলন! এর চেয়ে নন্দর মরাই ভালো। সে মরবে—! মরা আর এমন কঠিন কি! গলায় দড়ি দিয়ে পাখা থেকে ঝুলে পড়লেই হলো। এ পাড়ায় অমন কত ঘটনাই ঘটে গেছে, এই তো সেদিন—বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আন্না-কালী গলায় দড়ি দিয়ে মলো। পাখা থেকে শূন্যে ঝুলতে নন্দ নিজে তাকে দেখেছে।

হঠাৎ গৌতম টলতে টলতে ঘরে ঢুকে নন্দকে পাঁজা কোলা ক'রে ধরলো।

—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বলছি—শুয়ারকি বাচ্ছা। চোখ পাকিয়ে বললে নন্দ।

ছেড়ে দিলে গৌতম। মিনতিভরা কণ্ঠে বললে, আবে—এ কেমোন বাত্ বলছিস নন্দ!

—খবরদার নাম ধরবি না, তুই-তোকাবি করবি না বলছি।

—আরে বাপ্ আজ যে বড় লতুন কোথা বলছিস ভাই!

নন্দ ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিলে গৌতমের গালে। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললে, উল্লুককা বাচ্ছা, আমি নয় তোর মনিব!

গালে হাত বুলোতে বুলোতে গৌতম বললে, হুঁ—সাচ বাৎ! একদিন তুমি হামার মনিব ছিলে—আজ তুমি হামাব বিবি, আওরৎ!

নন্দ ছুটে গিয়ে একটা কাঁচের গ্লাস তুলে ধরলে গৌতমের মাথা লক্ষ্য ক'রে।—বেরো হারামজাদা আমার ঘর থেকে—বেরো বলছি।

পরের দিন মহাদেব জিজ্ঞাসা করলে গৌতমকে, হ্যাঁরে কাল রাত্রে তোর মনিব কাকে বলছিল—শুয়ারকি বাচ্ছা! বেরিয়ে যা—বেরো বলছি!

গৌতম বললে, বাবু ভাঙ্ খেয়ে দিললাগি কচ্ছিল কিনা তাই—

—তাই—কি?

—বাবুতে বিবিতে ঝোগড়া-ঝাঁটি হচ্ছিল বোধ হয়। মদ বহুৎ পিয়েছিল হামার মনিব। মদ খেলে হামার মঁনিবের আর—

—জ্ঞান থাকে না। তাতো বুঝলাম কিন্তু আমি যে তোর বাবুকে রাত এগারটার সময় বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

—ফিন আসিয়েছিল। আমি দরজা খুলিয়ে দিলাম। বললে গৌতম স্বচ্ছ স্বাভাবিক কণ্ঠে।

মহাদেব গুম খেয়ে গেল। মনে কেমন একটা খটকা লাগলো। ঠিক সে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলে না গৌতমকে। কৈ—নন্দর মাড়োয়ারী বাবুকে একটি দিনের জন্যও তো সে ঘুরে আসতে দেখেনি! এলোই বা কখন আর গেলই বা কখন! তবে কি—তবে কি—গৌতম ব্যাটাই আসামী। ঐ ব্যাটাই কি নিঝুম রাতে গিয়ে ওর মনিবের সঙ্গে কোনরকম অসৎ ব্যবহার করেছিল? তাই যদি হয় তাহলে নন্দর মুখে কোন উচ্চ-বাচ্চ টু শব্দটি নেই কেন! চাকর তাকে অপমান করলে আর সেটা সুস্থ মনে নির্বিকার ভাবে সয়ে গেল। ধোঁকা লাগলো মহাদেবের মনে। ব্যাপারটা তার কাছে কেমন রহস্যজনক ব'লে মনে হলো!

বিরাট খোলা মাঠ। নির্দিষ্ট সময়েব আগে থেকেই দলে দলে বিভিন্ন পাড়া থেকে পতিতারা এসে মাঠ ছেয়ে ফেললে। মাঠের শেষ প্রান্তে তক্তপোষের ওপর টেবিল দিয়ে বক্তৃতা-মঞ্চ তৈরী হ'য়েছে। রতিপতির তত্বাবধানে তার দলবল মেয়েদের বসবার তদ্‌বির ক'রে বেড়াচ্ছে। সমিতির পাণ্ডারা সকলেই মেয়েছেলে, তারা মঞ্চের ধার ঘেঁসে বসেছে। সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হ'য়েছেন পৌরাধিনায়ক পুলিন পাল। তিনি এখনও অনুপস্থিত। যথাসময়ে আসবেন নিশ্চয়।

সভা আরম্ভ হবার কয়েক মিনিট আগে প্রথম শ্রেণীর পতিতারা

—কেউবা মোটরে—কেউবা ফিটনে এসে হাজির হ'তে লাগলো।

বস্তির মেয়েরা এলো যেন এক একটি সঙ্। নানা ছাঁদে পরিপাটি করে যে যার রুচি অনুসারে চুল বেঁধেছে, অপরূপ তাদের সিঁথির বাহার, ডাইনে—বাঁয়ে—সামনে—। কারো খোঁপায় ফুল গোঁজা, পাতাকাটা চুলের ওপর কেউ বা বসিয়েছে জাপানী সেলুলয়েডের ডানা মেলা প্রজাপতি, কুমারীর অনুকরণে কেউ বা ঝুলিয়ে এসেছে দোহারা বেণী। খোঁপা কারোর বা জাল দিয়ে ঢাকা।

শরীরের রক্তের সঙ্গে খাপ্ না খাওয়া রঙীন শাড়ী যে কত ধাঁচে কত কায়দায় ঘুরিয়ে পরেছে তা চোখে না দেখলে তাদের রুচিবোধের পরিচয় অনুমান করা সাধ্যের অতীত।

এরা অতশত বোঝে না। আসতে বলেছে—এসেছে। তবে একেবারে যে উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে এসেছে সবাই তা নয়। এদের মধ্যে অনেকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে—বাবু ধরে নিয়ে যাওয়া।

এদের হৈ-চৈ চীৎকারে সভাস্থল হলো মেছো হাটা, বেহায়াপনায় স্থানটি হ'য়ে উঠলো ঐ মেছো হাটারই মত নক্কারজনক। ওদের ঢলাঢলি দেখে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক মেয়ের মাথা লজ্জায় আপনি নুয়ে এলো।

রতিপতি প্রভৃতি ওদের সংযত হবার জন্য জোড় হাতে বহু অনুনয় বিনয় করলে কিন্তু যতক্ষণকে ততক্ষণ তারপর যেইকে সেই! কে কার কথা শোনে, রতিপতির দল হার মানলে ওদের থামাতে।

কিন্তু একজন সভাস্থলে ওদের ঠাণ্ডা করলে—সে হচ্ছে মহাদেব। আকস্মিক ভাবে মত্ত অবস্থায় বাড়ীওলা মহাদেব এসে হাজির হ'য়ে গেল সভাস্থলে। রতিপতি ও তার দলের হয়রানি দেখে তড়াঙ্ ক'রে লাফ দিয়ে উঠলো মহাদেব বক্তৃতা মঞ্চের ওপর। আর যায় কোথা, একবার মুখ ছোটালে মহাদেবকে রোখে কার সাধ্য! ওদের

উদ্দেশ ক'রে অশ্রাব্য ভাষায় যা বললে মহাদেব তা ভাষায় রূপান্তরিত করা যে কোন দেশের যে কোন সাহিত্যিকের সাধ্যের অতীত।

মহাদেবের দেওয়া দাওয়াই স্থান ও কাল উপযোগী না হলেও পাত্রী উপযোগী যে হ'য়েছিল—এ কথা হলপ্ ক'রেই বলা যায়। কারণ মহাদেবের বক্তব্য শেষ হবার আগেই বহু মেয়ে স্থান ত্যাগ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করলে।

তবে দু' একজন 'বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী' গোছের মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে উঠে হাত পা নেড়ে হেঁড়ে গলায় প্রতিবাদ জানালে কিন্তু তাদের সে প্রতিবাদ মহাদেবের মুখের তোড়ে তলিয়ে গেল।

এ হেন দক্ষযজ্ঞ মুহূর্তে পৌরাধিনায়ক দূর থেকে মহাদেবকে বক্তৃতা মঞ্চে দেখে মোটর থেকে আর নামলেন না। রতিপতি গিয়ে তাঁর মোটরের ধারে পৌঁছবার আগে মোটর ছুটে বেরিয়ে গেল তার নাগালের বাইরে। মুহ্যমান রতিপতি ফিরে এলো মর্ম্মাহত হ'য়ে। সভাপতি সভাপতিত্ব করতে এসে যদি ফিরে যায় তাহলে সে সভা যে পণ্ড হতে বসবে—এ আর এমন বিচিত্র কথা কি !

ললিত বললে রতিপতিকে একান্তে ডেকে নিয়ে, এত কষ্ট ক'রে আয়োজন—এ সভার কাজ যদি ভেস্তে যায় তাহলে কারো কাছে আর মুখ দেখাতে পারা যাবে না। শুধু তাই নয়—আমাদে· উদ্দেশ্য আর কোন কালেও সিদ্ধ হবে না।

—সবই তো বুঝলাম কিন্তু মাষ্টার—আমার ত্রুটিটা কোথা বল ! কে জানতো যে এমন একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড ঘটে যাবে। আচ্ছা, তুমিই বল—ভাবতে পেরেছিলে ? গণ্ডগোল মেটাতে তুমিও তো কম করনি কিন্তু ঠেকিয়ে রাখতে পারলে !

—আমিও তো সব বুঝলাম কিন্তু এখন ঠেকাবে কেমন করে ?

উত্তেজনাভরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে রতিপতি, নাঃ এদের ভাল করতে যারা যায় তাদের বাপ আঁটকুড়ো। এদের জন্যে কিছু করতে যাওয়া

এক নম্বরের বোকামি। আরে ভগবান যাদের মেরেছে তাদের আমরা বাঁচাবো কেমন করে!

—বাজে ফিলজফি আউড়ে যাবার মত যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে নেই রতিপতি! মান, সম্মান আর উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে এখুনি কিছু একটা ভেবে স্থির করে ফেলতে হবে। বুঝতে পাচ্ছো না—কেমন সঙ্গীন অবস্থায় আমরা এসে ঠেকেছি। আমি বলি কি—তুমি সভাপতি হয়ে আজকের সভার কাজটা চালিয়ে দাও। বললে সাগ্রহে ললিত।

—তুমি কি ক্ষেপেছো মাষ্টার! আমায় সভাপতির আসনে দেখলে এরা সব ইট-পাটকেল মেরে সভার সপিণ্ডকরণ আর আমার গঙ্গাযাত্রা করিয়ে ছেড়ে দেবে। ওদের কোন দোষ দেওয়া যাবে না, চিরদিন যাকে ওরা তবলচী ব'লে জেনে এসেছে—দেখে এসেছে—মিশে এসেছে, আজ তাকে সভাপতির আসনে দেখলে ইট-পাটকেল ওরা মারবে বইকি! তা ছাড়া কোন্ যুগে ঘি খেয়েছি—আজো কি হাতে তার গন্ধ আছে! তবলায় চাঁটি দেওয়া হাতে আজ টেবিলে চাঁটি দিয়ে বক্তৃতা আমার আসবে কেন বল? কলেজ—? কলেজে পড়ানোর কথা ভুলে যাওনা বন্ধু! ও আমি পারবো না মাষ্টার—আমার দ্বারা হবে না।

—তবে কি আমি সভাপতিত্ব করবো!

দৃঢ়তার সঙ্গে রতিপতি বললে, নিশ্চয় করবে! তোমাদেরই তো এখন সভাপতিত্ব করার বয়স! সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছো বললেও অত্যুক্তি হয় না, গরম গরম কথা বলতে তো তোমারই পারা উচিত! যাও, আর দেরী করো না। মহাদেবদা প্রস্তাব করবে আর আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করবো! তার পরের কাজ তো আর তোমায় শিখিয়ে দিতে হবে না।

মহাদেব আর মাষ্টার মঞ্চের ওপর গিয়ে উঠলো। আবার মহাদেবের আবির্ভাবে সভা সন্ত্রস্ত ও সচঞ্চল হ'য়ে উঠলো। গণ্ডগোল

হৈ-চৈ উপেক্ষা করে মহাদেব মাষ্টারের নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব করলে—আর পিছন থেকে তাকে সমর্থন করলে রতিপতি।

—লোকটাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

—হয়তো তোর ঘরে কোন-না-কোনদিন গিয়ে থাকবে!

—সত্যি, লোকটাকে এ পাড়ায় হামেসাই দেখি।

—ওমা—ওকে চিনিস না! ওযে আমাদের রাজুবালার ইয়ে! ভারী লেখা-পড়া জানা লোক।

—ও করবে সভায় বক্তিতা! আর সেই বক্তিতা আমাদের বসে শুনতে হবে! গলায় দড়ি আমাদের! চ-লো চ, এর চেয়ে বাড়ী গিয়ে ঘুমোইগে চ!

ওদের মন্তব্য—ওদের অস্ফুট গুঞ্জরণ ডুবে গেল মহাদেবের প্রচণ্ড চীৎকারে, চুপটি ক'রে সব বসে শোন, নইলে বাড়ী গিয়ে যে যার বাবু নিয়ে ঘুমোওগে। যার ভাল না লাগবে—জোড় হাত করে বলছি—সে যেন গণ্ডগোল করে সভার কাজ পণ্ড না করে। এর পরও যদি কারো বেচাল দেখি তবে এই মহাদেব নিজমূর্ত্তি ধারণ করবে—বলে দিচ্ছি!

ললিত উঠে নমস্কার করে বললে, সমবেত বান্ধবী! আমি বক্তা নই, সভাপতিত্ব করাও আমার ধাতস্ত নয়, তবু বাধ্য হ'য়ে আমাকে আজ এই গুরু দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হলো। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—পতিতা-সমাজ। এই সমাজের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা চলেছে সরকারের দিক থেকে। ধরা গেল—সরকারের দমন নীতির ফলে পতিতা সমাজের মৃত্যু হলো। তার পরবর্ত্তী ফল কি দাঁড়াবে—? সমাজের সতী সাধ্বীরা কি সসম্মানে বসবাস করতে পারবেন? চরিত্রহীনের কামলোলুপ দৃষ্টি কি তাদের ওপর গিয়ে পড়বে না? সমাজ হলো একটি বিরাট অট্টালিকা আর এই পতিতা সমাজ হচ্ছে তার নর্দ্দমা। নর্দ্দমা না থাকলে বাসস্থানের স্বাস্থ্য যেমন ভাল থাকতে পারে না—সেই রকম পতিতা না থাকলে সমাজের

বনেদ সুস্থ ও দৃঢ় হ'তে পারে না। কাজেই পতিতা উচ্ছেদ করা মানেই সমাজের দৃঢ় বনিয়াদ শিথিল করা। সমাজসেবীদের দরবারে বা সরকারের দপ্তরখানায় কে এই তুচ্ছ অনুরোধটা আমাদের পৌঁছে দেবে!

পতিতা সমাজের উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কতকগুলি বিশেষ সংক্রামক ব্যাধির উচ্ছেদ সাধন আর সমাজের নৈতিক উন্নতি, অবশ্য সরকারী কর্তৃপক্ষ এই মতই পোষণ করেন। সরকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের পন্থাটা অতীব ভয়াবহ—অতীব মারাত্মক। রোগকে সারাতে গিয়ে রোগী যদি মারা যায় তবে সেটা কি চিকিৎসকের কলঙ্ক নয়?

পতিতাদের রুটি মারার ব্যবস্থা করা মানেই পরোক্ষ ভাবে তাদের আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করা। এ ব্যবস্থার—এ নীতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এই প্রাণঘাতী নীতির পরিবর্তে সরকারে কর্তব্য (অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত) নিয়মিত ভাবে নির্দ্ধারিত দিনে পতিতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং তার চিকিৎসা সাধন।

সমাজ-স্বাস্থ্য ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকলে—সহরতলীতে পতিতাদের বাসস্থান নির্মাণ। অথবা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য কোন-না-কোন কাজের ব্যবস্থা।

গ্রাসাচ্ছাদনের কোন পন্থা বাতলে না দিয়ে—কোন সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কি রায় দিতে পারেন—পতিতারা পতিতাবৃত্তি ছেড়ে দিক—! পতিতালয়ে পদার্পণ করা অপরাধ, যে যাবে তাকেই সহ্য করতে হবে অকথ্য অত্যাচার! পেটের অন্ন জোটাবার জন্য যে দেহ বিক্রয় করবে—তাকেই সইতে হবে জুলুম!

সভায় হর্ষধ্বনি উঠলো—পড়লো হাততালি।

পতিতারাও মানুষ! মানুষের বাঁচার অধিকার শাশ্বত।

বাঁচবার দাবী নিয়ে পতিতা-সমাজ আজ সাম্নুনয়ে সদাশয় সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে—সমাজের মঙ্গলের জন্য এমন কোন প্রকৃষ্ট পন্থা তাঁরা অবলম্বন করুন যাতে এই সর্বহারাদের অনাহারে তিলে তিলে মরণের মুখে এগিয়ে যেতে না হয়।

আবার উঠলো হর্ষধ্বনি—সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাতের তালি। সভাপতিকে যথাবিধি ধন্যবাদ দেবার আগেই হৈ-চৈ ক'রে সভা ভেঙে গেল।

রতিপতি পিছন থেকে এসে দু'হাত দিয়ে ললিত মাষ্টারকে জড়িয়ে ধরে বললে, তোমাকে ধন্যবাদ দেবার আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, মাষ্টার!

—তার জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি রতিপতি!' সহাস্যে রহস্যঘন কণ্ঠে বললে ললিত।

রাজুর বুকখানা দশহাত হ'য়ে গেল আনন্দ ও গর্বে। তার বাবু ললিত হলো সভাপতি। সভাপতিত্ব করা যে সে লোকের কাজ নয়! তার ওপর এমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা! এমন বক্তৃতা কি যে সে লোক দিতে পারে! হাজার হাজার মেয়ে তার বাবুর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। আর শতকণ্ঠে তাদের কি সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা! বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল—সে ছুটে যায় ঐ বক্তৃতা মঞ্চের ওপর, মাষ্টারকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—একে জানো তোমরা? এ আমার—আমার মাষ্টার! আমারই বুড়ো—! (আদর করে রাজু মাষ্টারকে বুড়ো ব'লে ডেকে থাকে)

সেদিন সন্ধ্যায় মাষ্টারকে কি ভাল লাগলো রাজুর! সে যেন নতুন করে চিনলো ললিতকে। ললিতের এত গুণ, এত বিদ্যাবুদ্ধি তার,—মাষ্টারের একান্ত সন্নিধানে থেকে রাজু এত দিন যেন তা বুঝে

উঠতে পারেনি। একান্ত সন্নিধানে থেকে কাচও ভুলে যায় হীরার মর্য্যাদা,—মনে করে—ঐ হীরাও তারই মত একজন, প্রায় সমগোত্র তাদের—প্রায় সমগোষ্ঠী।

সেদিন রাত্রে রাজু গদ-গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে মাষ্টারকে, আচ্ছা বুড়ো, তুমি লেখোই বা কেমন ক'রে আর কথার মালা গেঁথে অমন সুন্দর বক্তৃতাই বা দাও কি করে? তোমার কথা যতই আমি ভাবছি ততই আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি।

—তোমার ও প্রশ্নের উত্তর মাষ্টার দিতে পারবে না—, পারবো আমি। নাটকীয় ভঙ্গীতে বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলো রতিপতি।

রাজু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, যে লেখে—যে বক্তৃতা দেয়—সে বলতে পারবে না,—পারবে তুমি!

ললিত বললে, নিশ্চয়! ওতো শুধু তবলাওলা নয়—, ও যে লোকশিক্ষক—অধ্যাপক! এক কথায় বলা যায়—ও বেচারী আমাবি মত একটি শাপভ্রষ্ট!

—কথায় কথায় কিন্তু আসল কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে!

—আসল কথা চাপা দেবার জন্যই তো—

রতিপতির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাজু বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বললে, তার মানে?

—কোনকিছুর যথাযথ মানে বলা সত্যিই শক্ত বাজু! মোটকথা—ভগবানদত্ত ক্ষমতার অধিকারী না হলে কেউ সহজে লিখতে বা বলতে পারে না। তবে হ্যাঁ—চেষ্টা করেও লেখক বা বক্তা হ'তে দেখা গেছে কিন্তু তা পদ্মপত্রে নীর—স্থায়িত্ব অর্জ্জন করে না। ভবিষ্যৎ না দেখে মন্তব্য করা শক্ত যে তোমার মাষ্টার কোন দলের, এ ভগবানদত্ত ক্ষমতার অধিকারী, কি চেষ্টাপ্রসূত—

—মোট কথা আমি একটা যে সে কেউকেটা লোক নই, কেমন তাই নয়, রতিপতি?

ললিতের কথা বলার ধরণে সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে ফেললে।

—কি গো—তোমাদের এত হাসি কিসের? বলতে বলতে নৃত্য ছন্দে আশা এসে ঘরে ঢুকলো।

রতিপতি বললে, আমাদের হাসির কিছু কি মানে হয় ভাই! আমাদের হাসি, কান্না, গান—সবই সমান! তারপর—রাজ্যের খবর কি চিত্র-সম্রাজ্ঞী?

হতাশার কণ্ঠে বললে আশা, আমার মেজাজটা আজ ভাল নেই রতিপতি। আমার বান্ধবী কাল উঠে যাচ্ছে এ বাড়ী থেকে।

—কে—লীলা? লীলা উঠে যাচ্ছে এ বাড়ী থেকে?

রাজুর কথা শেষ হ'তে না হ'তে ঘরে এসে ঢুকলো মহাদেব। বললে ঈষৎ ক্রোধদীপ্ত কণ্ঠে, উঠে যাচ্ছে না—উঠিয়ে দিচ্ছি! বাড়ীটাকে একবারে ছুটো-বাড়ী করে তুলেছে। পুলিশ একবার টের পেলে বাড়ীর ইজ্জৎ কোথা থাকবে! সাপের পাঁচপা দেখেছে বেটী। সেরে উঠতে না উঠতেই—সকাল নেই, তুপুর নেই—মেড়ো, খোট্টা, ভোজপুরী—শালার যাকে পাচ্ছে তাকেই এনে ঘরে ঢোকাচ্ছে! একটা ইজ্জৎ নেই বেটীর! বাঁধাবাবুর ভাত—সহ্য হবে কেন!

—ওর তো কোন দোষ নেই মহাদেবদা! পাজীর পা-ঝাড়া হচ্ছে ওর মা-বেটী!

—লাক্ কথার এক কথা বলেছো! যত নষ্টের মূল ওর ঐ মা হারামজাদী। বেটী যেন হরিদাসীর মা!

—হরিদাসীর মা—কে, মহাদেবদা? জিজ্ঞাসা করলে সাগ্রহে আশা।

মহাদেব গল্প স্বুরু করলে হরিদাসীর মায়ের।

হরিদাসী ছুটো বেশ্যা।

সন্ধ্যার পর ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে হরিদাসী রাস্তায় বেরুলো চেষ্টা করতে। মা তার বসলো ঘরের বাইরে দরজার ধারে—ঘরের

খবরদারী করতে, ঘর আগলাতে। মায়ের পরণে থান—ঘোমটায় মুখখানি ঢাকা, হাতে ঝুলির মধ্যে মালা—জপের মালা। মুখে—হরি বোল—হরি বোল!

রাস্তা থেকে একটি বাবু সঙ্গে নিয়ে হরিদাসী এসে ঘরে ঢুকলো।

মালা ঘুরোতে ঘুরোতে হরিদাসীর মা ঘোমটার ভিতর থেকে বললে টেনে টেনে, মা—হরিদাসী! কে এলো মা! হরি—হরি—কেষ্টো—কেষ্টো—

—বাবু!

—কত দেবে মা? গুরু রক্ষে করো—গুরুপদ ভরসা।

—আট আনা।

—নীচে মাদুরের ওপর বসে গল্প-সল্প করো মা! ভরসন্ধ্যে বেলা—লোক ফিরিও না! হরিবোল—গুরু রক্ষে করো। গুরু—তুমিই ভরসা!

ঘণ্টা খানেক পরে আবার একজন আগন্তুক সঙ্গে নিয়ে হরিদাসী এসে ঘরে ঢুকলো।

—কে এলো মা—হরিদাসী?

—বাবু।

—গুরু রক্ষে করো! কত দেবে মা—?

—দু'টাকা!

—নীচে বিছানার ওপর বসে গল্প-সল্প করো মা! গুরু—তুমিই ভরসা! যাক্—প্রথম বৌনিটা দেখে হতাশ হ'য়ে পড়েছিলাম। এবার যাহোক—গুরু, তুমিই ভরসা। গোপালী আজ সন্ধ্যেবেলা ঘর থেকে বেরিয়েই পাঁচ-পাঁচটাকার বাবু জুটিয়ে নিয়ে এলো। আমার হরিদাসীর কি আর সে বরাত হবে! হরি বোল—হরি বোল—গুরু, তুমিই ভরসা।

ঘণ্টাখানেক কাটলো।

—নাঃ আজকের দিনটা গুরুর ইচ্ছেয় বিশেষ সুবিধা করতে

পারলে না হরিদাসী। সেই কখন রাস্তায় গেছে—এখনো কাউকে নিয়ে ফিরলো না। হরি বোল—হরি বোল—গুরু রক্ষে করো। কে —আমার হরিদাসী! এলি মা—? বাঃ তোমার সঙ্গের বাবুটি বেশ ভব্য-সব্য। কত হলো মা— ?

—পাঁচ টাকা! সোল্লাসে ন্যাকা-ন্যাকা কণ্ঠে উত্তর দিলে হরিদাসী।

—আহা—গুরু, তুমিই ভরসা। বাবুকে খাটের ওপর বসিয়ে গল্প-সল্প করো মা। হরি বোল—হরি বোল—হরি বোল! গুরু—তুমিই মুখ রাখলে। আট আনা, দু'টাকা আর পাঁচ টাকা—আট আনা কম দু'গণ্ডা টাকা। গুরু—তুমিই ভরসা। টাকাগুলি গুণে হরিনামের ঝুলির মধ্যে রাখলে হরিদাসীর মা।

—কে এলো মা হরিদাসী ?

—বাবু— !

—হুঁ, গুরুর ইচ্ছেয় এবার আর তোকে বেশীক্ষণ গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি মা। তা যাক্—কত হলো মা ?

—ইনি হচ্ছেন রাতের অতিথি। নগদ দক্ষিণা দশটাকা।

—দুপুর রাতের অতিথি—ফেরাতে নেই মা! আহা—গুরু, তুমিই ভরসা, মোট তাহলে কত হলো মা হরিদাসী— ? সাড়ে সাত আর দশ—তোমার গিয়ে আড়াই টাকা কম এক কুড়ি! গুরু, রক্ষে করো।

—গুরু তো তোমায় রক্ষে করলে কিন্তু পান্নার হাত থেকে আমায় রক্ষে করবে কে ? ঈষৎ চাপাগলায় বললে হরিদাসী।

পান্না হচ্ছে হরিদাসীর রাত বারোটার বাবু অর্থাৎ ভালবাসার বাবু। পান্নালালের আসার সময় হলো। হরিদাসী পড়েছে চিড়ের বাইশ ফেরে। একদিকে তার মায়ের টাকার লোভ, অন্যদিকে পান্নালাল। ভালবাসার কাছে টাকা! নাঃ তার মায়ের যদি কিছুমাত্র দরদ আছে মেয়ের জন্য।

তুতিয়ে বাতিয়ে হরিদাসীর মা বললে, কিছু ভাবিসনি মা—একটা রাত বইতো নয়। পান্নুকে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক গড়ে-পিটে নেবোখন!

—তা হয় না মা, সে তাহলে রেগে অন্য মেয়েছেলের কাছে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসবে।

—কি—কি বললি! বাঁধা বাবু গিয়ে অন্য মেয়েছেলের ঘরে রাত কাটাবে! হরি বোল—হরি বোল—এতখানি তার বুকের পাটা! গুরু রক্ষে করো—, মুড়ো খ্যাংরা নেই ঘরে! খেংরে বিষ ঝেড়ে দিবি অমন বাবুর। গুরু তুমিই ভরসা।

—ঝ্যাঁটা মারলে আর কি হবে! মেয়েছেলের কাছে ছাড়া তার যে ঘুমই হয় না।

—গুরু—বক্ষে করো। মেয়েছেলের কাছে ছাড়া তার ঘুম হয় না—না তুই পান্নাকে ছাড়া ঘুমুতে পারিস না!

—সবই যদি বোঝ তবে আর

—হাতেব লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই হবিদাসী—বিধাতা বিরূপ হন! হরি বোল হবি বোল—, ভদ্দোব নোক কি ভাববে। চট্ করে ঘরে নিয়ে যা—খাতির যত্ন কব!

—রাত আমি ওকে কিছুতেই বাখতে পারবো না!

—গুরু রক্ষে করো—আচ্ছা, যাতে না রাত বাখতে হয় তার ব্যবস্থা আমি কচ্ছি। টাকা ক'টা এনে আপাততঃ আমার হাতে দে!

—টাকা নেবো অথচ লোকটাকে রাতে রাখবো না—এটা আবার কি রকম? না—ওসব জাল জোচ্চুবি আমি পারবো না। বেঁকে দাঁড়ালো হরিদাসী।

—আঃ কোন চিন্তা নেই মা হরিদাসী! গুরুর ইচ্ছেয় সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে—গুরু রক্ষে করবেন। হরি বোল—হরি বোল—

—এত দেরী! হরিদাসী কাছে গিয়ে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন রাতের অতিথি।

—মায়ের জপ না ভাঙ্গলে তো আর কথা হয় না। জপ্ যদিও বা ভাঙ্গলো তো এত কম টাকায় মায়ের মন ওঠে না! তাই তো আপনাকে—

—মা কি গররাজী?

খদ্দের ছুটে না যায় তাই হাতে রেখে হরিদাসী বললে, ঠিক গররাজী নয়—নিমরাজী। তবে আপনি যদি কিছু—

—গলদ কোথায় বুঝেছি। আচ্ছা—আর দু'টাকা ধরে দিলাম। টাকাটা বোধ হয় আগেই গচ্ছিত দেওয়া রীতি? এই নাও!

টাকা ক'টি গুণে নিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে এলো হরিদাসী।

—আহা, বাবাকে এখনো বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস, হরিদাসী! নাঃ মানী লোকের মান রাখতে তুই আজও শিখলিনি বাছা! প্রকাশ্যে ব'লে ঈষৎ চাপাগলায় বললে হরিদাসীর মা,—নোটখানা চলবে তো—কেমন যেন একটু ময়লা-ময়লা!

চোখের ইসারায় হরিদাসীকে চলে যেতে বলে হরিদাসীর মা ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে বললে, হরি বোল—হরি বোল, গুরু—রক্ষে করো। এ সংসারে তুমিই ভরসা। মা হরিদাসী—রাত হলো মা। বাবুর পান, সোডা-টোডা কি কি দরকার সব রামচরণকে দিয়ে আনিয়ে নাও। গুরু তুমিই ভরসা।

—রামচরণ কোথা মা?

—ছাতে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বোধ হয়! তার আবার খেতে যাবার সময় হলো। হরি বোল—হরি বোল—গুরু রক্ষে করো। ব'লে হরিদাসীর মা হরিনামের ঝুলিটা বার কয়েক কপালে ঠেকিয়ে ডাক দিলে, রামচরণ—রামচরণ! এসো তো বাছা—তোমার দিদিমণির কি কি দরকার সব এনে টেনে দাও!

রামচরণ কিন্তু সত্যিকার চাকর নয়, আসল নাম তার রামবাবু। ইনি হচ্ছেন হরিদাসীর মায়ের ভাল সার বাবু, বয়সে হরিদাসীর মায়ের চেয়ে দু'পাঁচ বছরের ছোটই হবে'।

গামছা পরে রামচরণ এসে হাজির হলো। বাবুর নির্দেশ অনুসারে এনে দিলে পান, সোডা, মদ, চপ কাটলেট, সিগারেট প্রভৃতি।

হরিদাসীর মা ঘোমটার ভিতর থেকে বললে, রামচরণের বখশিসটা দিয়ে দাও মা হরিদাসী—ও আবার খেতেটেতে যাবে।

বাবুর দেওয়া টাকাটি নিয়ে যথারীতি সেলাম জানিয়ে রামচরণ ছাতে গিয়ে শুয়ে পড়লো হরিদাসীর রান্নাঘরে। এটাই তার থাকবার ঘর।

—মা এখনো কেন কষ্ট করে দরজার বাইরে বসে আছেন। ওঁকে ঘরে ডাকো না! বললে বাবুটি ভদ্রতার খাতিরে।

জিব কেটে হরিদাসী বললে, আজ পর্যন্ত আমার কোন বাবু মায়ের পা ছাড়া মুখ দেখতে পান না। আজ শুধু যা আপনার সামনে ঘোমটার ভিতর থেকে কথা বললেন। হ্যাঁ—মা, রামুচরণকে দিয়ে তোমার রাবড়ী, দৈ আর ক্ষীরমোহন আনিয়ে নিয়েছো?

—জপের সময় আমার ও সব মনে থাকে না বাছা! খাবার জন্যে কি হ'য়েছে—গুরুর কৃপায় রোজ তো খাচ্ছি মা! হরি বোল—হরি বোল—

—ওমা—ছিঃ ছিঃ—তাও বুঝি আবার হয়। রাত উপোসী কি থাকতে আছে! আমার কাছে যে আবার খুচরো টাকা নেই—

হরিদাসীর মুখে কথা শেষ হ'তে না হ'তে দুটো টাকা বার ক'রে দিলে।—মাকে খাবার আনিয়ে নিতে বল!

টাকা দুটি হরিনামের ঝুলিতে রেখে হরিদাসীর মা বললে, গুরু, তুমিই ভরসা। হরি বোল—হরি বোল—

বাবু ভেবেছিলো, খাবার টাকা পাবার পর হরিদাসীর মা উঠে যথাস্থানে চলে যাবে কিন্তু তার ওঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বাবুটি প্রমাদ গণলেন।

বাবুকে নীরবে সিগারেট ফুঁকতে দেখে হরিদাসী বললে, আসুন—চপ-কাটলেটগুলো যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

দরজার ধার থেকে চাপাগলার আওয়াজ এলো, হরি বোল—হরি বোল—গুরু, রক্ষে করো!

—মা এসব খান-টান না? চপ্ কাটলেটগুলো দেখিয়ে বললেবাবু।

জিব কেটে হরিদাসী বললে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি বলছেন! গঙ্গাস্নান না ক'রে মা আমার জল গ্রহণ করেন না।

—বেশ তো—এতে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও না!

—হ্যাঁ মা! বাবু বলছেন—গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে হু'একখানা চপ্ কাটলেট যদি—

—কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি—বাবা আমার জ্ঞানী লোক। তা—তা—গঙ্গাজলে অবশ্য কোন দোষ নেই। বলতে বলতে হরিদাসীর মা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। বলি গঙ্গাজল দিয়েছিস তো? আর তুই যা তা হাতে ছুঁস-টুসনিতো?

—এই তো বাবুর সামনে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলাম!

—না—তাই বলছি। ছোয়া-টোয়াগুলো খাওয়ালে তোরই মহাপাপ। বলতে বলতে হু'খানা চপ আর হু'খানা কাটলেট রেখে সব ক'খানি একটা থালায় ঢেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হরিদাসীর মা।

বাবু নীরবে গ্লাসে মদ ঢাললেন। এক চুমুক খেতে না খেতেই দরজার বাইরে থেকে ভেসে এলো, গুরু—রক্ষে করো! হরি বোল—হরি বোল—

গ্লাসটি মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বললেন, মার কি এসব চলে?

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি বলছেন আপনি। মা শুনে ফেললে রাগ করবেন!

—তাতে কি। গঙ্গাজলে সব শুদ্ধ। আমার নাম করে মাকে বল দেখি!

—আমার কিন্তু দোষ নেই—হ্যাঁ—তা কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি! ও মা—মা! বাবু কি বলছেন—শোন! বাবু বলছেন—গঙ্গা জলের ছিঁটে দিয়ে মদ নাকি খাওয়া চলে। খাবে মা একটু? আমার কিন্তু কোন দোষ নেই—হুঁ—বাবু বলছেন।

—হরি বোল—হরি বোল—, গুরু রক্ষে করো। দেখেই বুঝেছি—বাবা আমার জ্ঞানী লোক। গঙ্গামাহাত্ম্য এক উনিই বুঝেছেন। তা দাও মা—বাবুর কথা তো আর এড়াতে পারি না—তা অল্প ক'রে একটু দাও। হ্যাঁ—গঙ্গাজলের ছিঁটে যেন আবার বেশী দিয়ে ফেলো না বাছা, পানসে হ'লে খেতে পারবো না। না—না—না—না—ও সব কাচের গ্লাসে আমায় দিও না। রামচরণ—রামচরণ! গঙ্গামাটি দিয়ে মাজা আমার তামার গ্লাসটা নিয়ে এসো তো!

একটা এক সেরি গ্লাস হাতে নিয়ে এক লহমায় হাজির হলো রামচরণ।

হরিদাসীর মা গ্লাস পাতলে।

বাবু বললে, নিন্ না—মা!

—না বাবা। ও সব বোতল-টোতলে আমি হাত দিই না!

বাবু নিজের হাতে ঢালতে থাকে, হরিদাসীর মা 'না' আর বলে না। বোতল অর্দ্ধেক খালি হলো—হরিদাসীর মা নীরব। তিন ভাগ খালি হ'তে বললে, আর থাক বাবা, আমি আবার বেশী খেতে পারি না।

—তাতে কি, আমি আবার আনিয়ে নিচ্ছি। বলে বাবু বোতল খালি ক'রে ঢেলে দিলে, হরিদাসীর মায়ের রাক্ষুসে গ্লাস তবু ভরলো না।

—আর থাক বাবা—আর থাক্। রামচরণ, বাবুকে এক বোতল মদ এনে দাও। রাতটা একটু বেশী-ই হলো—সাবধানে খেয়ো। দেখো যেন পুলিশের হাতে পড়ো না। আহা—'কিন্তু' হবার কিছু নেই বাপু, বাবু তোমায় খুশী করবেন। আমি তবে

ওপরে যাচ্ছি মা! এক হাতে জপের মালা আর অন্য হাতে মদের গ্লাস নিয়ে হরিদাসীর মা চলে গেল।

নতুন বোতল এলো। রামচরণ আবার নতুন করে বখশিস নিয়ে খুসী মনে চলে গেল। বোতল খোলার কিছুক্ষণ পরে ছাতের ওপর থেকে হরিদাসীর মায়ের ডাক শোনা গেল, মা হবিদাসী—দুধটুকু খেয়ে যাও মা!

মায়ের ডাকের সঙ্কেত হরিদাসী বুঝলে। বুঝলে তার রাত বারোটার বাবু পান্নালালের উপস্থিতি। আস্ত-ব্যস্ত হ'য়ে বললে, এক চুমুকে আমি দুধটুকু খেয়ে আসি—আপনি একটু একা বসুন কষ্ট করে। দেরী করলে মা আবার বকাবকি কববে। বকাবকিকে আমাব বড্ড ভয়। লক্ষ্মী বাবুটি—কিছু মনে করো না, আমি দৌড়ে যাবো আর ছুটে আসবো।

—তবে মাঝপথে একটু জিরিয়ে নিতে ভুল না যেন!

পাগলকরা সম্মোহন হাসি হেসে দেহলতা ছন্দে লীলায়িত করে হবিদাসী ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছাতেব মুখে দেখা পান্নালালের সঙ্গে। পান্নালালেব হাতদুটো ধরে হবিদাসীর মা বলছে মিনতি ভরা কণ্ঠে, দোহাই বাবা—আমার মাথার দিব্যি রইলো—যেওনা। তুমি চলে গেলে হরিদাসী আমার বাপ-দাদাকে উদ্ধাব ক'রে ছাড়বে। আমাব বেইজ্জতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। তুমি কিছু ভেবো না বা —ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করো, আমি ছল-চাতুরী ক'রে ও ব্যাটাকে হটাচ্ছি। কি করবো বাবা—তিন তিন গণ্ডা টাকা, লোভ সামলাতে পারলাম না। আচ্ছা, ও থেকে তোমায় দু'টাকা মদ খেতে দেবো। তুমি বেঁকে দাঁড়ালে ও বেটীকে আমার সামলানো দায় হবে। এই যে—হরিদাসী এসে গেছে! কোন চিন্তা নেই মা, আমি পানুর কাছ থেকে এক ঘণ্টার ছুটি চেয়ে নিয়েছি। আঃ সাত-তাড়াতাড়ি

যুদ্ধের ঘোড়ার মত লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ্ ফেলে যাচ্ছিস কোথা! পান্তা ভাত ক'টা যে এলিয়ে যাবে বেশী রাত করলে। যা—ফুলুরী আনিয়ে রেখেছি তোর জামাইকে (মায়ের বাবুকে এ সমাজের প্রথা অনুসারে হরিদাসী 'জামাই' বলে ডেকে থাকে) দিয়ে, পানুতে আর তোতে ভাতক'টা খেয়েনে।

—ওকে চপ্ কাটলেট দাওনি?

—দিয়েছিলো—দিয়েছি। ব'লে—মায়ের চেয়ে যার দরদ বেশী

সে হলো যে ডান,

আর ভাতারের চেয়ে যে ভালবাসে

সে পিরীতের নাঙ্।

পান্নালাল কিছুতেই খেতে বসলো না, ফলে হরিদাসীরও খাওয়া হলো না। পান্নালালের মানভঞ্জনের বৃথা চেষ্টা করে হরিদাসী অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে গেল তার ঘরে।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। একঘণ্টা ধৈর্য্য ধরা পান্না-লালের কুষ্ঠিতে লেখেনি। সে হরিদাসীর ঘরের সামনে দিয়ে অধৈর্য্যভাবে পায়চারি সুরু করলে।

বাবু দরজার দিকে পিছন ক'রে বসেছিল—অবশ্য হরিদাসীই ছল করে তাকে বসিয়েছিল। কিন্তু আয়নার ভিতর দিয়ে যে পান্না-লালের ছায়া বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে তা জানা ছিল না হরিদাসীর।

—ও কে আনাগোনা কচ্ছে হরিদাসী? ভীত, সন্ত্রস্ত, সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে বাবু।

উত্তর দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো হরিদাসীর মা, কোন ভয় নেই বাবা! আহা—গুরু, তুমিই ভরসা! ওঁর কৃপাতেই সারা বাড়ী শুদ্ধো ক'রে খাচ্ছে। শনি, মঙ্গলবারে উনি দেখা দেন। কারো কোন অনিষ্ট করেন না। ভয় পাবার কিছু নেই বাবা! গুরু রক্ষে করো! বলে ভক্তিভরে গলায় আঁচল দিয়ে নাক কান মুলে প্রণাম করলে।

—আচ্ছা, আমি তাহলে আজ উঠি। ভয়ে বাবু তখন ঘেমে উঠেছে।

—সে কি কথা বাবা! এত রাত্রে কোথা যাবে! আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। ভয় পেলে উনি আবার রাগ করেন। আহা—বাবার আমার অসীম করুণা। অজ্ঞানের অপরাধ নিও না বাবা!

—না মা—আমি কিছু মনে করি নি। আমার গাটা কেমন যেন ছম্ ছম্ কচ্ছে। শনি, মঙ্গলবার বাদ দিয়ে আমি আসবো। আচ্ছা হরিদাসী—আমি চল্লাম। তুমি আমায় তোমাদের দরজাটা পার ক'রে দিয়ে আসবে চল।

বাবুকে বিদায় করে হাসিমুখে হরিদাসী এসে দাঁড়াল। অপরূপ মুখভঙ্গি করে মা বললে, কেমন—আমাব কথা ফললো তো! গুরু, রক্ষে করো! বাবা পানু—পান্না—পান্নালাল—এসো বাবা।

গল্প শেষ করে মহাদেব বললে, লীলার মা হচ্ছে হরিদাসীর মায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ।

—আচ্ছা, এসব কি কাণ্ড-কারখানা বলুন তো, মহাদেবদা? আমরা বাঁধা বাবুর ভাত খাই—রোজ রোজ এত চাঁদা জোগাই কোথা থেকে! ঘরে ঢুকে বললে গৌরী।

—গৌরী আমাদের সব তাতেই কাল্‌কে পাতাড়ী। বলি হলো কি—কিসের চাঁদা—কে চাইছে? ঠোঁটের কোণে চোরা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলে মহাদেব।

—আহা—কিছু যেন জানেন না। নিজে লেলিয়ে দিয়ে নিজেই আবার সাধু সাজা হচ্ছে।

—রাগ করো না গৌরী। পাড়ার ছেলেদের আদর-আবদার একটু হবে বইকি সহ্য করতে! বাবুই বল আর ভেইয়াই বল—আপদে বিপদে ওরাই তোমাদের আপনার লোক। পাল-পার্বনে টাকাটা-সিকেটা নেবে বইকি ওরা! বললে মহাদেব।

—বলি ওরে অ কানখেকো মহাদেব! বলি—তোর জন্যে কি আমি চৌপর রাত ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকবো। পিণ্ডী গিলতে হবে কি-না। নীচ থেকে বাড়ীওয়ালী মোক্ষদার কাংস কণ্ঠ ভেসে এলো।

—ওই—ওই সুরু করেছে খ্যাচ্-খ্যাচানি! হারামজাদি মরেও না যে আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ক্ষোভের সঙ্গে মোক্ষদার মৃত্যু কামনা করে মহাদেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

—আহা -ষাট্ ষাট্—বালাই। ওসব কি কথা দাদা। মানুষের মরণ কামনা কি করতে আছে! যান্—খেয়ে নিন্ গে! কণ্ঠে নিবীড় অন্তরঙ্গতার সুর মিশিয়ে বললে গৌরী।

সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও আমার পিছনে ফেউ লাগলে তো! ওঃ মেয়েছেলে [illegible]ছেলের দরদ বোঝে, টেনে কথা কয় অথচ আমার দরদ বোঝবার মত কি একজনও নেইরে ভগবান! হাত্তোর জাত-কি-জগন্নাথ! আক্ষেপের সুরে বললে মহাদেব।

মহাদেবের কথা তখনও শেষ হয়নি—নীচ থেকে মোক্ষদার চীৎকার কানে এলো, বলি ওরে ও কান-খেকো মহাদেব! কানের কি মাথা খেয়েছিস!

—আজ তোর মাথাটা কড়-মড় করে চিবিয়ে খাবো—দাঁড়া হারামজাদী! বলতে বলতে মহাদেব লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আশা চাপা গলায় বললে, নারদ—নারদ! নারদ -নারদ!

—না ভাই—ও ঝগড়াটে ঋষির নাম করিসনি, শেষকালে বাড়াতে কলশ এসে ঢুকুক আর কি! বললে গৌরী।

—নাঃ আজকের আসরের আবহাওয়া বড্ড এলোমেলো। রস কিছুতে দানা বেঁধে উঠছে না। প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল মাষ্টার, তার পর এলো হরিদাসীর মা, তৃতীয়টি হলো চাঁদার দৌরাত্ম্য, চতুর্থ হলো বাড়ীউলির বাহাদুরী, পঞ্চম—মহাদেবের স্থান ত্যাগ।

বাইরে থেকে বাহাদুর বললে, আশা মাজী! ড্যারিকেটর সাব।

—খাস ইউরোপীয়ান বুঝি? জিজ্ঞেস করলে রতিপতি আশাকে উদ্দেশ্য করে।

—আরে না না—বাঙালী। ডিরেকটরকে আমার মাড়োয়ারী বাবু আর বাহাদুর ড্যারিকেটর বলে। উনি হচ্ছেন ফিল্ম ডিরেক্টর বিমানবাবু।

—এখানেই ডাকো না। আলাপটা করে রাখি। ভবিষ্যতে বই একখানা যদি গছানো যায়—, আলাপ করতে দোষ কি? বললে ললিত আশার দিকে চেয়ে।

—উনি বড্ড লাজুক! লোক দেখলে ঘাবড়ে যান. ঘেমে, নেয়ে, কেশে অস্থির। হাসতে হাসতে আশা স্থানটাকে সর-গরম করে তুললে।

-হাজার হলেও ডিরেক্টর লোক তো, লোককে ঘাবড়ে দেওয়াই ওঁর কাজ কিনা। সেটের মাঝে ফেলে লোককে ঘামিয়ে, নাইয়ে কাশিয়ে তোলাই যাঁদের কাজ--তাঁরাই বাইরে এসে ঘেমে, কেশে মরে। বললে রতিপতি।

—আসুন Sir—আসুন। পর্দার বাইরে গিয়ে সসব্যস্তে খাতির ক'রে ডাকলে ললিত।

ললিতের সঙ্গে সঙ্গে আশাও বাইরে গেল। এটা হচ্ছে ভদ্রতা। প্রেয়সীর বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ এ লাইনের অমার্জ্জনীয় অপরাধ, অতএব নিষিদ্ধ। আশার অনুমোদন না থাকলে বিমানের সাধ্য কি রাজুর ঘরে গিয়ে বসে। ডিরেক্টরের যত কিছু জাবিজুরি খাটতে পাবে তার ফ্লোরে. এখানে সে তার আর্টি আশারই তাঁবেদার।

বিমান অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজুর ঘরে আসতে বাধ্য হলো। সকলেই তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে খাতির করে বসালে। চিত্র পরিচালক,

লেখক, গায়ক, শিল্পী প্রভৃতি ভগবানদত্ত ক্ষমতার অধিকারী বলেই সাধারণ মানুষ মনে করে। বিমান ঐ দলেরই একজন, কাজেই খাতিরটা তার ঐ ধরণেরই হলো।

শুধু মুখের আপ্যায়নে খাতির জমে না, তার জন্য দরকার অনুপান। রাজুই খরচ করলে ললিতের আগ্রহ আতিশয্যে, এলো মদ—এলো মাংস—এলো ইত্যাদি।

মদের গন্ধে গন্ধে মহাদেবও এসে হাজির হলো। আসর জমাতে হলে চাই গান—অধিকন্তু নঃ দোষায় হিসাবে নাচ। কিন্তু নিরুপায়। রাত বারোটার পর নাচ, গান একেবারে নিষিদ্ধ! পুলিশ যে কখন এসে হাজির হবে—কে বলতে পারে! প্রাণে যত সখই থাক—বাঁশের লরী চেপে থানায় যেতে সবাই গররাজী।

হাসি, কথা, গল্প দিয়ে আসর জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা চললো। রাত বাড়লো—মদের বোতল হলো খালি, অল্প বিস্তর সবার চোখে নামলো ঝিমুনি। হাই তুলে দু'একজন সরেও পড়লো। বিমানের ভাবটা উঠি উঠি, আশারও তদ্রূপ। শুধু ললিতই যেন কতকটা চনমনে। গল্প গছানোর কথাটা তার বলি-বলি করেও বলা হ'য়ে উঠছে না।

—রাত অনেক হলো। বাকি আলাপটা কাল সকালে হবে। আশার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিমান উঠে দাঁড়াল।

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল ললিত—, বিমান তাদের নমস্কার জানিয়ে আশার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—নাঃ মদের আসরে কাজের কথা মোটেই জমে না। দাও আর একটা পেগ! রাজুর উদ্দেশে ব'লে ললিত ঢালা বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়লো।

—পেগ দেবে না আরো কিছু! ঝুট্-মুট্ দিলে তো আমার এতগুলো টাকা খরচ করিয়ে। নাঃ তোমাকে নিয়ে হয়েছে আমার মহা জ্বালা। ঝঙ্কৃত কণ্ঠে গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললে রাজু।

ললিত উঠে বসলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেনে টেনে বললে, দুঃখ করো না ডারলিঙ্। টাকা তোমার কে খাবে ?

—খাবে তুমি আর খাবে আমার যম।

—আরো টাকা তুমি চাও ?

—কেন, দেবে নাকি ?

গ্লাসটি নিঃশেষ ক'রে ললিত বললে, দেবার মালিক কি আমি ! ঐ ওপরওলা। আজ তোমার টাকা খরচ করা ব্যর্থ হয়তো নাও হতে পারে। বিমানবাবুর চোখে যদি লেগে গিয়ে থাকো তো Heroine তোমার ছাড়ায় কে। তারপর দিনকে দিন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহের জৌলুস যে মাত্রায় বাড়ছে তাতে আমার কপালে ছাই দিয়ে বেহাতও তুমি হয়ে যেতে পারো। ড্যারিকেটরদের দ্বারা সবই সম্ভব !

—তিনপোর রাতে মাতলামি সুরু করলে !

—মাতাল কোন শা-- ! আমি এখন লিখবো। আমার খাতা, পেন, চশমা, সিগারেট--

—লেখাচ্ছি তোমায়। বলে টলতে টলতে গিয়ে রাজু আলো নিভিয়ে দিলে।

— আমার এখন লেখার mood এসেছে। এসময় ঠাট্টা, ইয়ারকি আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আলো জ্বালো। খাতা লেয়াও, পেন লেয়াও, চশমা লেয়াও—ওঃ বড্ড নেশা হ'য়ে গেছে।

ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই—
ছোট এ তরী।
আমারি সোনার ধানে
গিয়েছে ভরি।

—আওড়াও তুমি রবি ঠাকুরের কবিতা। আমি ঘর ছেড়ে চল্লুম !

ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে—
বারেক ভিড়াও তরী কুলেতে এসে।

যেও যেথা যেতে চাও
যারে খুসী তারে লও,
আমারে লহগো শুধু করুণা করে।
বলতে বলতে ললিত আঁচলটা টেনে ধরলে রাজুর !

নতুন প্রেম ! নতুন প্রেমে মানব মানবী হয় উন্মাদ, হয় দিশেহারা। মাতোয়ারা নর-নারীর অন্তর-মন নৃত্য করে বাঁধনহারা ছন্দে। পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে পায় অপার্থিব আনন্দ, অমিয় সৌরভে মেতে ওঠে দুজনার মন প্রাণ।

ঘরে গিয়ে আশা নতুন করে আসর পাতলে। দেরাজ খুলে বার করলে বিলাতী মদের বোতল।

কত কথা আছে বলবার ; কত কথা আছে শোনবার। কিন্তু সামনা সামনি একে অন্যকে পেয়ে সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। হাসি, কথা, গল্পে সময় যেন এরোপ্লেনের গতিতে ছুটে চলেছে। টিক্ টিক্ ক'রে ঘড়িটা শেষ রাতের সঠিক খবর জানিয়ে দিলে। যত বিরক্তি গিয়ে পড়লো ঐ ঘড়িটার ওপর, আশা স্খলিতচরণে উঠে গিয়ে ঘড়িটার চলা দিলে বন্ধ ক'রে।

ঘড়ির চলা বন্ধ হলো বটে কিন্তু সময়ের চলার গতি বন্ধ করবে কে ! আকাশের বুকে জাগলো শুকতারা।

শুধু মিলনের গান গেয়ে মিলনানন্দ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না। মিলন-বাসরে তাই প্রাণে জাগে বিরহের করুণ তান।

আশা বলে যে, বিমান কিছুতেই এ প্রেমের মর্য্যাদা রাখতে পারবে না। মেয়েছেলে নিয়ে তার কাজ। তার ওপর পুরুষ জাতটা বড় বেইমান। বিমান আবার কখন কার সঙ্গে কি ক'রে বসে—এই তো তার ভাবনা। ডিরেক্টরী যতদিন তার থাকবে ততদিন মেয়েছেলের অভাব তার হবে না। নাঃ কাজটা সে ভাল করলে

না। বিমানের সঙ্গে প্রেম ক'রে একদিন তাকে পস্তাতে হবেই হবে।

উলটো চাপান দিতেই বা ছাড়বে কেন বিমান, তারও নেশার মুখ।

আশা হলো জাত-আর্টিষ্ট। আর্টিষ্টের চোখে কখন কাকে ভাল লাগে তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে! ডিরেক্টর হ'তে তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মার দরকার হয় না, ধনী ফাঁসাতে পারলেই রাতারাতি ডিরেক্টর বনা যায়। কখনো কোন ডিরেক্টরের খপ্পরে পড়ে আবার নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। তার ওপর আশা একটু পিরীত-খোর মেয়ে। ভালবাসার লোক ধরতে আর ছাড়তে, ছাড়তে আর ধরতে তার বেশীক্ষণ লাগে না।

নতুন ভাব ভালবাসার ধারাই আলাদা। নতুন প্রেমে পড়া প্রেমিক প্রেমিকার হাসি-কথা-গানের কোথায় যে সুরু আর কোথায় যে শেষ তা মুণি ঋষির বোধের অগম্য—মানুষ তো কা কথা! -

প্রেমাত্মক কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে কখন যে ওরা ঢলে পড়লো একজন আর একজনের বুকে—আর কখন যে রাতের আঁধার সরে গিয়ে চারদিক ফরসা হ'য়ে গেল তা ওরা মোটেই বুঝলে না।

গত দিনটা ছিল নিরঞ্জনের টাইমের দিন। সে খেয়াল অবশ্য আশার ছিল কিন্তু গভীর রাত পর্য্যন্ত নিরঞ্জন না আসায় সে মনে করেছিল যে কোন কাজের তাড়ায় নিরঞ্জন হাজিরা দিতে পারলে না। রাজুর ঘরে বিমানকে নিয়ে গভীর রাত পর্য্যন্ত থাকার গূঢ় অর্থই হচ্ছে নিরঞ্জনের জন্য প্রতীক্ষা করা আর তার চোখে ধূলো দিয়ে বিমানের সঙ্গে গোপন প্রেমের মধু আলাপন।

কোনদিন নিরঞ্জন সকালে এ বাড়ীতে আসে না, এই ভরসায় আশা বিমানকে ঘরে এনেছিল। কে জানতো যে নিরঞ্জন সাত সকালে এসে হাজির হবে।

নেশার ঝোঁকে দরজায় অর্গল বন্ধ করা হয়নি। অল্প ধাক্কা দেওয়া

মাত্র দরজা খুলে গেল। ঘরে তখনও আলোর বন্যা বইছে। নিরঞ্জন যে দৃশ্য দেখলে তাতে তার মাথায় খুন চেপে যাওয়া অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক মোটেই নয়, কিন্তু সামলে নিলে নিরঞ্জন নিজেকে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নীচে নেমে এলো।

অসময়ে ঘুম ভাঙানোর জন্য চীৎকার-রত কুকুরগুলোর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়ে অগ্নিশর্ম্মা মহাদেব তখন ভীষণভাবে গালাগাল দিচ্ছিল, নিরঞ্জন গিয়ে তার হাতে একটা সিগারেট দিলে। শুধু সিগারেট দিলে না—নিজের হাতে দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিলে। মহাদেব জল হ'য়ে গেল।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে মহাদেব বললে, দেখুন দেখি মশাই—শালার কুকুরগুলোর একবার আক্কেল! ভোর না হ'তে হ'তেই ব্যাটা-বেটিরা নিজেদের মধ্যে খেয়ো-খেয়ি সুরু করেছে। আরে শূয়ারকি বাচ্ছারা—রাস্তা দিয়ে অচেনা লোক গেল—তা তোদের বাবাদের কি! রাস্তাটা কি তোদের কেনা! কি ক'রে এদের সামলাই বলুন তো।

তুবড়ীর মুখে অফুরন্ত জ্বলন্ত বারুদের কণার মত কথার ফোয়ারা ছুটে বেরুতে লাগলো মহাদেবের মুখ থেকে। এমন অবস্থা যে—কথার মধ্যে তার কমা, দাড়ি নেই; যাকে বলে অফুরন্ত অনর্গল কথার প্রস্রবন।

একজায়গায় একটু ফাঁক পেয়ে নিরঞ্জন বললে, আগে ঘব সামলান তারপর বার সামলাবেন!

—তার—তার মানে।

আশার ঘরে ঐ নব্য বাবুটি কে—জানেন?

—এ্যা—হ্যা—হ্যা—ধরে ফেলেছেন তো! দেখুন—আমি কিন্তু বলিনি মশাই! আশা যে শেষকালে আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে সাতপাড়া মাথায় করবে—সেটি হবে না। আপনি নিজে হাতে নাতে ধরেছেন মশাই, কেউ কোন দোষে দোষী নয়। আরে মশাই, হাজার বার আমি ওদের বারণ করেছি—গোপন পিরীত ভাল

নয়। যে দিন পড়বে ধরা—সেদিন খাবে কচুপোড়া! তা আমার কথা কেউ কি গায়ে মাখে মশাই।

—আপনি তবে কিসের বাড়ীওলা যে, বাড়ীর বাসীন্দাদের শাসনে রাখতে পারেন না। আপনার ভরসাতেই তো—

—আরে মশাই, বলেন কেন—সাধে কি আর বাপ মা আমার নাম রেখেছিল মহাদেব। সে যুগের মহাদেবের মুখ বন্ধ হতো বিল্বপত্রে আর এ যুগের মহাদেবের মুখ বন্ধ হয় বিলিতি মদে! মদ খেতে পেলেই আমি কেমন ওদের কেনা গোলাম হ'য়ে যাই।

—হুঁ, বুঝেছি। তা গত রাতে আশার ঐ শয্যাসঙ্গীটি কে?

—আশার ঘরে কেউ ছিল নাকি! স্মিতহাস্যে বললে মহাদেব।

—ছিল নয়—এখনো আছে। আপনি নিশ্চয় জানেন—ঐ ভদ্রলোককে! বলুন—ও কে?

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে মহাদেব বললে, আপনি যখন জেনেই ফেলেছেন তখন আর লুকিয়ে কি করবো। উনিই হচ্ছেন—ডিরেক্টর বিমানবাবু।

নিরঞ্জন ফিরে এলো আশার ঘরে। তখনও ওরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নিরঞ্জন রেডিও খুলে দিলে। গানে মুখরিত হ'য়ে উঠলো ঘরখানা। হঠাৎ গানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আশার। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো বিছানার ওপর।

নিরঞ্জনকে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে দেখে আশার মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। সে শুধু নীরবে বিমানের কাছ থেকে অল্প দূরে সরে গিয়ে একটা বালিসের ওপর মুখ গুঁজে পড়লো।

বিমানেরও ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম চোখে ঘরের মেঝেয় এক অচেনা ভদ্রলোককে পায়চারি করতে দেখে সে হলো স্তম্ভিত।

নিরঞ্জন দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, সুপ্রভাত—good morning Mr director!

নিজের অজান্তে অভ্যাসবশতঃ দুহাত কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে বিমান স্তম্ভিত কণ্ঠে বললে, আপনি—আপনি আমায় বলছেন ?

—নাঃ, ঘরের ঐ কড়িকাঠটাকে। আচ্ছা, আপনি কি মানুষ ! আশা যেদিন প্রথম আপনার সঙ্গে আমার ফোনে আলাপ করিয়ে দেয়—সেদিন আপনি আমায় 'দাদা' বলে সম্বোধন করেছিলেন ! বলি—এই কি ছোট ভাইয়ের কাজ ! আপনি তো এ রাস্তার ছেলে নয় যে—

—Shut up মিষ্টার ! you are going to far. কোন ভদ্রসন্তান যদি অন্যকে জারজ ব'লে সম্বোধন করে—তবে বক্তা নিজে কি —সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ জাগা উচিত। ফোনে আপনাকে 'দাদা' ব'লে আপনার মান বাড়িয়েছিলাম—' আপনি মূর্খ তাই সে কথার অর্থ বুঝতে পারেননি। আর আপনাকে দাদা বলার আগেই আশার সঙ্গে আমার দৈহিক সম্বন্ধ ঘটে গেছে। ভুল করবেন না— আপনার বন্ধু হিসাবে আশার সঙ্গে আমার আলাপ নয়, আশার বন্ধু হিসাবেই বলুন আর যে কোন হিসাবেই বলুন—আপনার সঙ্গে আমার আলাপ—তাও ফোনে !

নিরঞ্জন নীরবে মাথা হেঁট ক'রে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো।

—তোমার কিছু বলবার আছে ? রাগ—দুঃখ ক্ষোভ-জড়িত কণ্ঠে বললে নিরঞ্জন আশার উদ্দেশে।

বালিশের উপর থেকে মুখ তুলে দীপ্ত কণ্ঠে বললে আশা, নিশ্চয় আছে। কি জানতে চাও ?

—কেন তুমি এ কাজ করলে ?

—নিশ্চয় আমার কিছু অভাব ছিল—যা পূর্ণ করতে তোমরা কেউ পারোনি !

—Cheer you, চললাম ! ভগবান তোমাদের সুখী করুন !

বলে ঘরের বাইরে পা বাড়ালো নিরঞ্জন, হঠাৎ তিন তলায় কান্নার রোল উঠলো।

গৌরী কিছুদিন যাবৎ বেরীবেরীতে ভুগছিল, হার্ট হ'য়েছিল খুবই দুর্বল। আজ সকালে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বললে, বুকটা কেমন করছে! ব্যস্—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ! মিনিট খানেকের মধ্যেই গৌরী তার সাধের সাজানো সংসার ফেলে কোথায় কোন অজানা দেশে চলে গেল! এই তো মানুষের জীবন!

গৌরী ছিল এ বাড়ীর লক্ষ্মী—এ বাড়ীর প্রাণ! বিনা নোটিশে গৌরী চলে গেল, না ভুগলো অসুখে—না নিলে বিছানা—না খেলে ক'শিশি ওষুধ! নিজেও ভুগলে না—অন্যকেও ভোগালে না, সারা বাড়ীখানা—[illegible] পাড়াটা দুঃখের আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে আকস্মিকভাবে চলে গেল গৌরী।

মাসখানেক কাটলো কিন্তু মনমরা ভাব কেটে গিয়ে ফিরে এলো না আগেকার সেই স্বচ্ছ, স্বাভাবিক, স্নিগ্ধ আবহাওয়া। দিন কাটে তো রাত কাটে না। আবার রাত কাটে তো দিন কাটতে চায় না। বাড়ীর লোকের প্রাণ হয়ে উঠলো অতিষ্ঠ, সবার মনেই কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব। বাড়ীটা হ'য়ে উঠলো পালানে বাড়ী।

এই করুণ, এই গুমোট আবহাওয়া কতকটা হালকা ক'রে নিতে রতিপতি মধ্যস্থ হ'য়ে স্থির করলে একটি বাগান-পার্টির। বাড়ীওলা মহাদেব তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করলে আর করলে বাড়ীর আর পাঁচজন। বাগান-পার্টিতে ঘুরে এলে হয়তো থম্‌থমে ভাবটা কেটে মনটা সবার কতকটা সজীব হ'য়ে উঠতে পারে!

বাগান জোগাড় হ'তে দেরী হলো না। নন্দর মাড়োয়ারী বাবু ঘরঘরিয়া দিলে বাগান। বেশ মোটা চাঁদাই উঠলো। লোকও

হলো নেহাত কম নয়—মেয়ে পুরুষে অনেকগুলি। যেমন ধরা যাক—রাজু আর মাষ্টার, আশা আর ডিরেক্টর বিমান, নন্দ আর ঘরঘরিয়া, লীলা আর পরেশ, মহাদেব, চঞ্চলা, নন্দর পিয়ারের চাকর গৌতম, রতিপতি। এ ছাড়া নিমন্ত্রণ করা হলো আরো ক'জন বন্ধু ও বান্ধবীকে।

নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা বাড়ীর সকলে মোটর যোগে রওনা হলো বাগানে। বন্ধু বান্ধবীরা আগে পিছে সবাই এসে হাজির হলো। বাগান দেখে সবাই হলো খুসী। সারা বাগান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, একধারে একটা বড় পুকুর, পুকুরে নামবার সিঁড়িটি ভাঙা হলেও পাকা—সানবাঁধানো। বাড়ীখানি ছোট হলেও বেশ মনোরম। সামনের হলঘরটি বেশ বড়, সুন্দর ক'রে আধুনিক কায়দায় সাজানো। আশপাশে আরো অনেকগুলি ঘর, প্রতি ঘরে, পালঙ, বিছানা, আয়না প্রভৃতি।

রতিপতি, মহাদেব প্রভৃতির চেষ্টা ও তদ্বিরের জোরে বাগান-পার্টি জমজমাট। গান, পান ভোজনের অপূর্ব আয়োজন। বিপুল সমাবেশ।

চা পর্ব্ব দিয়ে সুরু হলো বাগান-পার্টি। চা, মুরগীর ডিম, টোষ্ট, মামলেট, পোচ প্রভৃতির সদব্যবহার করে সবাই বেরুলো বাগান দেখতে। ফুল, ফলের গাছ, ঝোপ, খানিকটা জঙ্গল—বেশ লাগলো বেড়াতে। ওদের স্বচ্ছ, স্বাভাবিক প্রাণ খোলা হাসি-কথা-গানে বাগান হ'য়ে উঠলো মুখরিত।

ওদিকে রতিপতি, মহাদেবের ডাকাডাকি সুরু হ'য়ে গেছে। বেড়ানই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে না এসে দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড় মঠে গেলেই চলতো! হুঁ—যত সব!

সবাই ফিরে এলো হলঘরে। ঢালা ফরাসের ওপর পরিস্কার চাদর বিছান। মদের বোতল আছে খোলার প্রতীক্ষায়। তবলচী হাতুড়ি মেরে তবলা ঠিক করছে মুখে জ্বলন্ত বিড়ি নিয়ে। ট্রেতে

সাজানো পান, এলাচ, সিগারেট, চুরুট। ছুটি বড় প্লেটে ডালমুট, আদার কুঁচি। আর একটি প্লেটে স্যালাড।

এর আগে যত বাগান-পার্টি হ'য়েছে—প্রত্যেকটিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ ক'রে এসেছে গৌরী। তাই আজ তার কথাটাই সবচেয়ে বড় হ'য়ে জেগে উঠলো সবার মনে। ললিত মাষ্টারের প্রস্তাবে এবং রতিপতির সমর্থনে মিলিত নরনারী একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছ'মিনিট কাল অকাল মৃত গৌরীর আত্মার শান্তি কামনা ক'রে আসন গ্রহণ করলে।

গৌরীর অমর আত্মার কথা স্মরণ ক'রে সবাই একই সঙ্গে মদের গ্লাস ধরলে।

—একি নিরস বাগান-পার্টি! না আছে গান আর না আছে নাচ, একি কখনো জমে! গ্লাসটি শেষ ক'রে নামিয়ে রাখতে রাখতে মন্তব্য করলে রাজু।

"পান চিরি চিরি সুপারি কুঁচুই
শিয়রে রাখি যাঁতি,
পুষ্পের মত বিছানা পেতে
একলা পোয়াই রাতি।
পয়সায় কি করেরে মান—
আমি তাই সাজতে বসি পান,
কি সুখে এসেছো শ্যাম—
আমার সুখ-নদীতে এসেছে বান।"

গান শেষ হ'তে না হ'তে সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো। রতিপতি বললে, দাও—সব পেলা দাও!

নন্দ কৃত্রিম ঝঙ্কারে বললে, যা গান গেয়েছো—আবার প্যালা! মাগো—ছিঃ ছিঃ—কি লজ্জা!

মহাদেব গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললে, ঠিক বলেছে নন্দ! রতিপতির গান শুনে আমারি 'নজ্জা' কচ্ছে—নন্দ তো

মেয়েছেলে! দাও—নন্দকে বোরখা পরিয়ে ওর 'নজ্জা' ঢেকে দাও!

আর এক দফা উঠলো দমকা হাসির লহর।

রতিপতি তাড়াতাড়ি উঠে ললিত মাষ্টারের গলার চাদরখানা নিয়ে নন্দর মাথায় দিয়ে দিলে ঘোমটা দেওয়ার ধরণে।

ঘরঘরিয়া এ দৃশ্য দেখে বললেন, এ বড়া আচ্ছা কাম হ'য়েছে। নন্দর 'নজ্জা' বড়ি আচ্ছাসে ঢাকিয়ে দাও, রতিপতিবাবু!

এক সময়ে চঞ্চলা ছিল বাংলাদেশের একজন নামকরা নাচিয়ে। অত্যধিক মোটা হওয়ার ফলে নিজে সে আর নাচে না—নাচ শেখায়। আজকের এই বাগান-পার্টিতে সবাই তাকে ধরে বসলো নাচবার জন্য।

চঞ্চলা কিছুতেই রাজি হয় না, চেহারার দোহাই দিয়ে সবার অনুরোধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। বলে, ওগো—এ চেহারায় নাচলে সবার নেশা ছুটে যাবে।

রতিপতির সঙ্গে মহাদেব কি যেন একটা গোপন পরামর্শ ক'রে এলো। নাচের কথা ওরা ইচ্ছে করে চাপা দিয়ে গানে আসর জমিয়ে দিলে। আর গান জমাতে তাড়াতাড়ি খালি হ'তে লাগলো বোতলের পর বোতল। অবশ্য এ চক্রান্তে চক্রী হচ্ছে মহাদেব আর রতিপতি। সবাই যখন বেশ চুর হ'যে উঠেছে মদে—রতিপতি ধরে দিলে একটা লাগতাই নাচের গান। কাকেও কিছু বলতে হলো না—চঞ্চলা কোমরে কাপড় জড়িয়ে তার সেই বিপুল আকার স্থূল শরীর নিয়ে নাচতে সুরু করে দিলে অপরূপ ছন্দে।

ইতিমধ্যে এসে গেল একথালা মাছ ভাজা। চঞ্চলা নৃত্য-ছন্দে সেই মাছের থালা মাথায় নিয়ে নাচতে সুরু করলে—আপন ভোলা হ'য়ে। নাচ দেখে সবাই ভুলে গেল তার চেহারার কথা, ভুলে গেল তার বয়সের কথা—নাচের তালে তালে দুলে উঠলো সমবেত নর-নারীর অন্তর।

নাচের পর সুরু হলো আবার গান। কিন্তু সে গান জমলো না। চঞ্চলার নাচের পর গান দিয়ে আসর জমানো বড় শক্ত ব্যাপার। ব্যাপারটা যে সত্যিই শক্ত তা প্রমাণ হ'তে খুব বেশী দেরী হলো না। গান চলতে লাগলো—এদিকে এক একটি জোড় কপোত কপোতীর মত হাত ধরাধরি করে টুপ টুপ করে আসর থেকে খসে পড়লো। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে হলঘরে গায়ক আর তবলচী ছাড়া আর জনপ্রাণীও নেই।

দেখতে দেখতে সারা বাগানময় তারা ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমশঃ ঝোপ ঝাড় আর ফুলবাগানের আনাচে-কানাচে তাদের আশ্রয় অনুসন্ধানে ব্যস্ত দেখা গেল।

রান্নার তদ্বির সেরে রতিপতি আর মহাদেব বেরুলো কপোত-কপোতীদের সন্ধানে।

লজ্জার বালাই এখন আর কারুর নেই, লজ্জা তাদের লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেছে। কেউ উলঙ্গ,—কেউ অর্দ্ধ-উলঙ্গ, কারুর পরণে শুধু সায়া—-গায়ে বডিজ। আর কেউ বা গায়ের পাঞ্জাবী দিয়ে লজ্জা নিবারণ করছে, কাপড় তো দূরের কথা—আণ্ডারওয়ারটা পর্য্যন্ত খুলে পড়েছে।

সেই দিন-ত্নপুরে কড়া রোদে ব'সে—কেউ বা আধা-শুয়ে আবার কেউ বা শুয়ে যে যাকে কাছে পাচ্ছে তাকেই প্রেম নিবেদন করছে জড়িত কণ্ঠে।

প্রথমটা যার-যার প্রিয়া তার-তার কাছেই ছিল কিন্তু নেশায় দিশেহারা হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে ফেললে হারিয়ে। ললিত রাজুকে ছেড়ে লীলাকে বুকে নিয়ে শেক্সপীয়রের ভাষায় ইংরাজিতে প্রেম নিবেদন করে চলেছে। ডিরেক্টর বিমান আশা হারা হ'য়ে নন্দর কোলে মাথা দিয়ে সিনেমা টেকনিকে প্রেম জানাচ্ছে। আশা গিয়ে পড়েছে ঘরঘরিয়ার খপ্পরে, ঘরঘরিয়া তাকে তু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের জাতীয় ভাষায় প্রেমের গান শোনাচ্ছে। রাজু পরেশের গালে টোকা দিয়ে গাইছে—

'তোরে ভালবাসিরে—
ওরে ও আঁটকুড়ির ব্যাটা,
তোর তরে যে মেনেছিলুম
পঞ্চানন্দর পাঁঠা।
মারি তোর মুয়ে আধোয়া ঝাঁটা,
ওরে ও বুড়োটা।
তোরে ভালবাসিরে॥"

ওদিকে লীলাকে মাষ্টারের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে সানের ঘাটে বসে চঞ্চলা তাকে প্রেম নিবেদন করছে। লীলা তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বলছে, পুরাতন প্রেম কি ভোলা যায় চঞ্চলাদি! আজো তোমায় আমি আগের মতই ভালবাসি।

চঞ্চলা সে কথায় কান না দিয়ে জোর করে লীলাকে কোলে বসিয়ে চুমায় চুমায় তার মুখ, বুক, চোখ, কপাল, মাথা—সর্ব্বাঙ্গ প্রমত্তভরে ভরিয়ে দিচ্ছে আর মুখে সেই এক কথা, বল—বল তুই আমায় ভালবাসিস!

কাঁধ ধরাধরি ক'রে রতিপতির সঙ্গে মহাদেব এসে হাজির।

মত্ত চঞ্চলা বলছে, পরেশকে আমি কিছুতেই সহ্য করবো না! ও আমার সতীন। সতীনের কাঁটা আমি তুলে ফেলবো। তুই ওর সঙ্গে হাসিস—কথা বলিস—ইয়ারকি মারিস আর আমার বুকটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়। তুই জানিস না পোড়ারমুখি —আমি তোকে কি ভয়ঙ্কর ভালবাসি। বল—তুই পরেশকে ছাড়বি!

—হ্যাঁগো—হ্যাঁ, ছাড়বো। এখন তুমি আমায় ছাড়ো, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তোমার টিপুনি আর আমার সহ্য হচ্ছে না। কৈ —পরেশ তো আমায় এতো কষ্ট দেয় না। বললে লীলা ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে।

—সে কি তোকে সত্যিকার ভালবাসে যে কষ্ট দেবে। ও তোর

বাবু হ'লে কি হয়—ওর চাইতে আমি তোকে হাজারগুণ ভালবাসি। বল তুই ওকে চিরজীবনের মত ছাড়বি?

—আঃ কতবার বলবো। বলছি তো—ছাড়বো!

—এই সানের ঘাটে বসে তিনসত্যি কর আমাকে ছুঁয়ে!

—হ্যাঁ—ছাড়বো—ছাড়বো—ছাড়বো! কিন্তু ওকে ছাড়লে তুমি আমার সংসার চালাবে তো?

—নিশ্চয়! আমি তোকে চিরদিনের জন্যে বাঁধা রাখবো। আমার যা কিছু আছে—সব তোর নামে.লিখে দিয়ে যাবো। কিন্তু পরেশের ছায়া তুই মাড়াতে পারবি না। ওর সঙ্গে তোর চোখের দেখাও চলবে না! ওর সঙ্গে কোনদিন যদি তোকে মিশতে দেখি তাহলে আমি আত্মহত্যা করে তোকেও বাঁধাবো আর ওকেও বাঁধাবো।

চঞ্চলার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রতিপতি পাশ থেকে গেয়ে উঠলো,

"সই! কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন্ বাড়া যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।"

মহাদেব ব'লে উঠলো দোয়ারকির ঢঙে, তখন শ্রীরাধা কি বললেন? তিনি বললেন, আমি অভিশাপ দেবো।. কি সে অভিশাপ —না—

'আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে!'

গানের কলি শেষ ক'রে জোড় হাতে বললে মহাদেব, আগে পেট পরে প্রেম! গাত্র উৎপাটন করুন, খাবার সময় হলো।

অকস্মাৎ মহাদেবের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে হু হু ক'রে কেঁদে ফেললে চঞ্চলা। কাঁদতে কাঁদতে বললে, লীলাকে যদি না পাই

তবে আমি খাবার না খেয়ে বিষ খাবো মহাদেবদা! তুমি আমায় খানিকটা বিষ এনে দাও!

—কি যে বল তার ঠিক নেই। লীলা তো তোমারই!

—ঠিক বলছো—তুমি ঠিক বলছো, না আমায় ধাপ্পা দিচ্ছো!

—মোটেই ধাপ্পা নয়, আমি এই সিগারেট ছুঁয়ে শপথ কচ্ছি।

মহাদেবের আশ্বাসবাণীতে আশান্বীতা চঞ্চলা লীলাকে জড়িয়ে ধরে বললে, চ—দুজনে আজ এক পাতে ব'সে খাইগে চ। আমি আজ তোকে নিজের হাতে খাইয়ে দেবো!

—এত পিরীত থাকলে বাঁচি! এসো দোস্ত, আর কোথা কি ব্রজের লীলা হচ্ছে দেখে চক্ষু সার্থক করবে চল। মহাদেবকে টানতে টানতে রতিপতি আর এক দিকে চলে গেল।

যেতে যেতে মহাদেব বললে আক্ষেপেব স্বরে, আচ্ছা রতিপতিবাবু, বয়সটা কি আমার এতই বুড়িয়ে গেছে যে কোন শালি গায়ে ঢলে পড়া তো দূরের কথা—গায়ের পাশ দিয়েও যায় না। নাঃ মেয়ে-মানুষের ওপর সত্যিই ঘেন্না ধরে গেল।

রতিপতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললে, যা বলেছো দাদা! এদেব মধ্যে একজনও সতী নয়।

—এ্যাই শূয়োব! কেলেঙ্কারী করিসনে বলছি। ঝোপেব আড়ালে গৌতমের হাত ধরে টানতে টানতে বলছে নন্দ।

গৌতম জড়িত কণ্ঠে বলছে, নেহি—নেহি, ছাড়িয়ে, উশালা ড্যারিকেটরকে হামি আজ খুন করবে।

—জুতিয়ে মুখ তোর ছিঁড়ে দেবো হারামজাদা ব্যাটা! ফের—ফের বলছি। বলতে বলতে নন্দ হাত ছেড়ে গলা ধরলো গৌতমেব।

মরিয়া হ'য়ে উঠলো গৌতম। গলা থেকে নন্দর হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বললে, হামার চোখের সামনে তুমারে লিয়ে—মেরি জানকে লিয়ে—মেরি দিলকা পিয়ারীকে লিয়ে—মেরি কলিজাকে লিয়ে পিয়ার করবে আর হামি ছোড়িয়ে দিবে! হামি মরদকা বাচ্ছা—

গৌতমের গলা ধরে ঝুলে পড়লো নন্দ। সামলাতে না পেরে গৌতম বসে পড়লো মাটির ওপর। বসে বসেই গজরাতে লাগলো গৌতম।

—ফের তড়পানি! বলেই নন্দ মারলে তার বুকে সজোরে এক লাথি।

—ওরে বাপরে বাপ! মেরা জান নিকাল দিয়া শালি। তেরি— বলে গৌতম এমন সব অভিধান বিগর্হিত অশ্রাব্য ভাষায় নন্দর উদ্দেশে গালাগাল করতে লাগলো—যা সভ্য-সমাজে অচল, শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে পালাতে হয়।

ওদিকে তখন জলকেলি সুরু হ'য়ে গেছে। পৃথিবীর সেই আদিম অথবা অর্দ্ধসভ্যতার যুগে হঠাৎ যেন ফিরে গেছে যুগধর্মী নর ও নারী। আদম ও ইভের যুগ অকস্মাৎ যেন নব কলেবরে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো ধরণীর বুকে।

মানুষ যতই সভ্যতার গর্ব করুক, আজও তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে আদম ও ইভের আদি যুগের মনোবৃত্তি!

পুরুষের পরণে আণ্ডারওয়ার, নারীর পরণে সায়া—বক্ষ অনাবৃত; আবার কেউ বা দিগম্বর দিগম্বরী। মত্ত নরনারী টলতে টলতে পড়তে পড়তে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে সাঁতরে পুকুরকে তোলপাড় ক'রে তোলে।

ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেকে পিঠে নিয়ে সাঁতার কাটছে. এক বুক জলে দাঁড়িয়ে হচ্ছে প্রেম আলিঙ্গন, হাঁটু-ডুবন্ত জলে ধ'রে চলেছে কাঁধে হাত দিয়ে প্রেমের আলাপন।

সাঁতার না জানা কোন মেয়েছেলেকে গভীর জলে নিয়ে যাবার জন্য কেউ বা আশ্বাসবাণীর সঙ্গে টানাটানি সুরু করেছে—মেয়েটি করছে পরিত্রাহী চীৎকার, চীৎকারে সুবিধা করতে না পেরে প্রশ্রয় নিচ্ছে গালাগালির।

হাসি, কথা, চীৎকার, গালাগালিতে পুকুর এবং তার চারপাশ মুখরিত, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

এ হেন সময় কোথা থেকে উল্কার মত উন্মত্ত নন্দ ছুটে এসে বেনারসী শাড়ী, জামা, জুতো সমেত ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। ঘরঘরিয়া খালি গায়ে ভুঁড়ির নীচে কাপড় পরে মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ঘাটের সিঁড়ির ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে জাতীয় ভাষায় কি একটা অশ্লীল গানের কলি মাথা নেড়ে নেড়ে গাইছিল। নন্দকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ঘরঘরিয়া পরিত্রাহী চীৎকার ক'রে সারা বাগান কাঁপিয়ে তুললে। বিপুল ভুঁড়ি নিয়ে নিজেও জলে নামতে পারে না অথচ অপর কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না নন্দকে উদ্ধার করতে। সবাই হাসছে ঘরঘরিয়ার আকুলি-বিকুলি দেখে ; ঘরঘরিয়া কেঁদে ফেললে।

ঘাটের কাছ বরাবর এসে ভুস্ ক'রে ভেসে উঠলো নন্দ।

—এ কেয়া তাজ্জব ব্যাপার ! পিয়ারী ! নন্দর উদ্দেশে বললে ঘরঘরিয়া।

—ওরে ছাতুখোর মেড়ো ! এর নাম হচ্ছে ডুব সাঁতার ! বলতে বলতে জল থেকে উঠে এসে ঘরঘরিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে তার পাশে বসলো নন্দ। নন্দর তখন পরণে সায়া আর গায়ে বোতাম খোলা বডিজ, সাঁতারের ধমকে বেনারসী শাড়ী এবং ব্লাউজ তলিয়ে গেছে জলের তলায়।

নন্দ জেদ ধরে বসলো—ঘরঘরিয়াকে অন্ততঃ এক-কোমর জলে সে নামাবেই নামাবে। নাই বা জানলো সাঁতার, এক-কোমর জলে তো আর মানুষ ডুবে মরে না। ঘরঘরিয়া কাকুতি মিনতি ক'রে জানালো যে—সাঁতার সে এককালে সত্যিই জানতো কিন্তু বর্তমানে বিলকুল ভুলে গেছে। তা ছাড়া এই ভুঁড়ি নিয়ে জলে নামলে আর উঠতে হবে না, দেহটা একেই বিপুল ভারী—জলে ভিজে আরো বেশী ভারী হ'য়ে যেতে পারে !

শেষ পর্য্যন্ত কেঁদে ফেলে রেহাই পেলে ঘরঘরিয়া, নইলে নন্দর হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড় শক্ত।

বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। জলকেলি শেষ ক'রে পরিশ্রান্ত মত্ত নরনারী রতিপতির তাড়ায় জল থেকে উঠে এলো। অধিকাংশই দিগম্বর, দিগম্বরী—দু'একজনের পরণে না থাকার মত আচ্ছাদন। লজ্জার বালাই কারুর নেই, নেশা এদের এমনি মাতোয়ারা—এমনি বিহ্বল করে তুলেছে, অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় এরা কোন দিনও এতটা বেল্লিক এতটা বেহায়া নয়। এই শ্রেণীর মেয়েছেলেরা পর্দার দোহাই যতটা মেনে চলুক বা না চলুক—আব্রুর দোহাই এরা মেনে চলে।

সবাই তখন জল ছেড়ে ডাঙায় উঠেছে—ঘাটের ধারে দীর্ঘ দেবদারু গাছের মাথা থেকে কে বলে উঠলো, আমি কিন্তু হারিয়ে গেছি বাবা!

সবাই সচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে—মহাদেব গাছের শিরডগে উঠে চুপচাপ বসে আছে একান্ত ভালমানুষটির মত।

—ওখান থেকে পড়লে যে তোমার আর হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যাবে না, মহাদেবদা! বললে রতিপতি।

—পড়ে মরবার জন্যেই তো আজ গাছে উঠেছি।

—দোহাই দাদা, নেমে এসো! তুমি পড়ে তো সকল জ্বালার হাত থেকে এড়িয়ে যাবে কিন্তু আমাদের হাতে যে দড়ি পড়বে। নেমে এসো দাদা, পুরো একটি বোতল মদ তোমায় একাকে খেতে দেবো।

গাছের ওপর থেকে মহাদেব উপহাসের অট্টহাসি হাসলে। বললে, বিপদে পড়লে অমন সব শালা "দাদা" বলে, আবার মদের লোভও দেখায়। লাফ দিয়ে পড়ে আমি আজ এ শালার প্রাণ ত্যাগ করবোই করবো। মেয়েমানুষ যার দিকে সুনজরে চায় না তার বেঁচে থেকে লাভ?

রতিপতি বললে মেয়েদের দিকে মিনতিভরা চোখে চেয়ে, অমন হাঁ ক'রে সব চেয়ে দেখছো কি! বল—আমরা তোমাকে সবাই ভালবাসি!

নন্দ বললে জীব কেটে, ও মা—তা বুঝি আবার হয়। আমরা যে সবাই মহাদেব 'দা' বলি! দাদাকে বুঝি 'ভালবাসি' বলা যায়!

—আরে বাবা, আতুরে নিয়ম নাস্তি! বেশ—তুমি না বলতে পারো আর কেউ তোমাদের মধ্যে বলুক!

—আশা বল না। তুই তো দাদাও বলিস আবার ইয়ারকিও মারিস। বললে নন্দ।

—ওঃ কি আমার সতী, সাধ্বীরে! আমি ইয়ারকি মারি বাড়ী-ওলার সঙ্গে আর উনি ইয়ারকি মারেন বাড়ীর—' থপ ক'রে আশার মুখটা চেপে ধরে রাজু বললে, আঃ কি হচ্ছে!

—বাবা তারকনাথের শপথ ক'রে বলছি—আমি কিন্তু এবার পড়বো! গাছের ডগায় দোলা দিয়ে বিরাট আস্ফালন সহকারে চীৎকার ক'রে বললে মহাদেব।

—দ্যাখো, সবার হাতে দড়ি পড়বে। কেউ রেহাই পাবে না কিন্তু, একটা লোকের জীবন রক্ষা করতে সতীপনায় তোমরা ক্ষণেকের জন্যে জলাঞ্জলি দাও। মহাদেব এখন চুরচুরে মাতাল, ওর দ্বারা সবই সম্ভব। মেয়েদের উদ্দেশে বললে রতিপতি।

পুরুষের দল বললে, ওতে কি, বলে ফ্যালো—সব বলে ফ্যালো!

হাতে দড়ি পড়ার সম্ভাবনায় ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে সবাই তখন সমস্বরে বললে, ভালবাসি—আমরা তোমায় সব্বাই ভালবাসি।

—সত্যি বলছো?

চঞ্চলা বললে, পুকুরও যা আর গঙ্গাও তাই। আমরা এই গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে বলছি—তোমায় সত্যি সত্যি ভালবাসি।

—কিন্তু শপথ যখন করেছি বাবা তারকনাথের নামে তখন আমায় পড়তেই হবে। তবে ডাঙ্গায় না পড়ে জলেই পড়ি। বলে মহাদেব গাছের ওপর থেকে জলে ঝাঁপ দিলে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাই হাসলে প্রাণখোলা হাসি।

ভূঁরি ভোজনের পর সবাই হলঘরে সমবেত হ'য়ে বিশ্রাম-সুখ ভোগ করছে। নেশা তাদের তরল হ'য়ে এসেছে। চলছে আলাপ, আলোচনা, গল্প। হঠাৎ ঘরঘরিয়া ঘরে ঢুকে বললে, বড়ি তাজ্জব তামাসা হোতা হ্যায়। আইয়ে—সব কই আইয়ে।

ঘরঘরিয়া এমনিভাবে তার কথায় গুরুত্ব আরোপ ক'রে বললে যে, কেউ তার কথা উপেক্ষা করতে পারলে না। সবাই তার পিছনে পিছনে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। ঘরঘরিয়া ইসারায় তাদের নীরবে অনুসরণ করতে বললে।

বাড়ীর পিছনে একটি খোলা জানালার ধারে সবাই গিয়ে দাঁড়াল। ঘরঘরিয়া ইঙ্গিতে সবাইকে দেখালে ঘরের মধ্যে পালঙের ওপর গৌতম চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে আর নন্দ পালঙের ধারে দাঁড়িয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমায় মুখখানা তার ভরিয়ে দিচ্ছে। প্রেম-উন্মাদনায় এতই তারা বিহ্বল যে তাদের মন থেকে মুছে গেছে জগতের অস্তিত্ব। এদের আগমন ওরা টেরও পেলে না।

—বহুৎ আচ্ছা, বিবিজান—বহুৎ আচ্ছা! ঘরঘরিয়ার চীৎকারে কেটে গেল ওদের প্রেমের নেশা। বিদ্যুৎ স্পর্শে হঠাৎ সচকিত মানুষের মুখ যেমন ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়—সমাগত নরনারীকে জানালার ধারে দেখে ওদের মুখ তদ্রূপ বা তার চেয়েও বেশী ফ্যাকাসে দেখালো।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাত তাই ফেরবার তত তাড়া নেই। চাঁদিনী রাতটা বাগানে কাটানোর ইচ্ছা হয়তো অনেকেরই ছিল কিন্তু নন্দর কেলেঙ্কারীর পর সে ইচ্ছাটা চলে গেছে। এক কড়া দুধে নন্দ যেন এক ফোঁটা গোময় ছিটিয়ে দিলে। আনন্দের অবসন্নতার বিনিময়ে সবার মন যেন ঘৃণা ও তিক্ততায় ভরে উঠলো।

ঘরঘুরিয়া অনেক আগেই তার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঢিমে তালে জিনিষপত্তর বাঁধা-ছাদা হ'য়ে গাড়ী বোঝাই হচ্ছে। সকলেই বিশেষ ক'রে মেয়েরা যেন খড়্গাহস্ত হ'য়ে উঠেছে। মেয়ে-মানুষ জাতটার সে যে মুখ পুড়িয়ে দিলে—এই নিয়ে মুখে যার যা আসছে সে তাই বলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিজে নিজের সতীপনা জাহির করছে।

মহাদেব নিজের মনে জিনিষপত্তর বাঁধছে আর গুন গুন করে গাইছে ঃ—

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল—
এত্তা বড়া বাড়ী ইসমে
এত্তা জঞ্জাল।"

বিদায় বেলায় কোথা থেকে মদ সংগ্রহ করে আনলে তা রতিপতিই জানে। বললে, সবার মনটা বড্ড ঝিমিয়ে গেছে, বাড়ী ফেরার আগে একটু চাঙ্গা ক'রে নেওয়া দরকার। নইলে মনে হচ্ছে —বাগান-পার্টি করে তো ফিরছি না, যেন মড়া পুড়িয়ে গঙ্গা নেয়ে বাড়ী ফিরছি। কি বল, মহাদেবদা?

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল!" গাইতে গাইতে এগিয়ে এসে মহাদেব বললে, বেশ কড়া করে এক পেগ দাও তো, নন্দ।

সত্যি, ঠিক সময়ে ঠিক জিনিষ এসে গেছে। স্থান ও কালের কথা বাদ দিয়ে পাত্রপাত্রীর শুধু মানসিক অবস্থার বিচার করলে মনে হবে যে এদের এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মদের। সবাই অন্তরের সঙ্গে তারিফ করলে রতিপতির।

সন্ধ্যা তখন পেরিয়ে গেছে। সবাই গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। গাড়ী ছাড়বার আগে খোঁজ পড়লো নন্দর। কৈ, নন্দ তো কোন গাড়ীতে নেই। সবাই নন্দর ওপর চটে গেছে সত্য কিন্তু তাই বলে তাকে এই নিরালাপুরীতে ছেড়ে যাওয়া তো মানুষের কাজ নয়। নাঃ জ্বালালে নন্দটা!

গাড়ী থেকে অনেকেই নেমে এলো।

নানা জনে নানা মন্তব্য করলে। কেউ বললে, নন্দ গৌতমকে নিয়ে আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে হাওয়া হ'য়ে গেছে! কেউ বা বললে, হয়তো বা ঘরঘরিয়াই তাকে আগে থাকতে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আবার কেউ বা বললে, নেশার ঝোঁকে হয়তো কোথাও পড়ে ঘুমুচ্ছে। ধরা পড়ার পর আমিই তো তাকে একা ঐ থামের কোণে বসে মদ খেতে দেখেছি!

খোঁজা সুরু হ'য়ে গেল। প্রথমে বাড়ীখানা পাঁতি পাঁতি করে খোঁজা হলো। কেউ কোথাও নেই, শুধু রেলিঙের ধারে পড়ে আছে গৌতম—অঘোর, অচৈতন্য। বমি ক'রে নাগর চারিদিক ভাসিয়ে দিয়ে বমির ওপরই মুখ গুঁজে পড়ে। শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া এ ধারটায় বড় একটা কেউ আসে না। তার কাছে নন্দর সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হলো কিন্তু কোন উত্তরই এলো না, মড়ার মত সে যেমন পড়ে ছিল তেমনি পড়েই রইলো।

বাকি রইলো বাগান। টর্স জ্বেলে সারা বাগান তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হলো কিন্তু নন্দর সন্ধান মিললো না। তাইতো—জলজ্যান্ত মানুষটা তাহলে গেল কোথায়! মদের ঝোঁকে ঘৃণা ও লজ্জায় সে কি তবে একাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কোনদিকে চলে গেল! তাই বা কি ক'বে সম্ভব, গেট যে তালাবন্ধ! অত উঁচু প্রাচীর পেরিয়ে মেয়েছেলের পক্ষে বাইরে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত নরনারী মধ্যরাত্রে এসে হ'লঘরে সমবেত হলো। কেমন একটা অজানিত ভয়ে বিষণ্ণ ছায়া ফুটে উঠেছে ওদের চোখে, মুখে। মদের তুল্য প্রিয় জিনিষ ওদের কাছে খুব কমই আছে, সেই মদের ওপরই ওরা হ'য়ে উঠলো নিষ্প্রিহ। স্বাভাবিক কথা হলো গুঞ্জনে পর্য্যবসিত। পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে হাই তোলে আর মশা তাড়ায়, করণীয় কিছু খুঁজে পায় না, সবাই যেন বিহ্বল, বিভ্রান্ত।

ভোরের দিকে গোঁঙানি শোনা গেল গৌতমের। ওর কাছ থেকে নন্দর কোন হদিস পাবার আশায় রতিপতি আর মহাদেব সচেষ্ট হ'য়ে উঠলো। মদের নেশা ছুটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার যাবতীয় প্রকরণ যা তাদের জানা ছিল তা তারা সমস্তই প্রয়োগ করলে। গৌতমের জ্ঞান ফিরে আসতে জানা গেল যে, তাদের কীর্ত্তি ধরা পড়ার পর দুটো পিতলের কলসী নিয়ে নন্দকে পুকুরে নামতে সে দেখেছে।

ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। জেলে ডেকে এনে জাল ফেলা হলো পুকুরে কিন্তু নন্দর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তখন সাধারণ জাল ছেড়ে বেড়াজাল ফেলা হলো পুকুরে।

গৌতমের কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেল। গলায় দুটো কলসী বাঁধা অবস্থায় মৃতা নন্দকে বেড়াজালে পুকুর থেকে তোলা হলো।

বেলা তখন দুপুর। পুলিশে টেলিফোন করা হলো। পুলিশ এলো। সব কিছু লিখে নিয়ে নন্দর মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে দিলে।

এরা ফেললে স্বস্তির নিঃশ্বাস। কিন্তু পুলিশ তাদেব স্বস্তিতে বাদ সাধলে। সবাইকে বাঁশের গাড়ী (লবা) ভর্ত্তি ক'রে ধরে নিয়ে গেল থানায়। মাতাল অবস্থায় ওরাই যে নন্দর গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে দেয়নি—তার প্রমাণ কি! কাজেই বাগান-পার্টির পর সুরু হলো হাজত-পার্টি।

ঘরঘরিয়া খবর পেয়ে এসে ওদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল। পয়সায় কি না হয়! শুধু পয়সা নয়—ঘরঘরিয়ার লোকবলও ছিল অসামান্য। ঘরঘরিয়ার সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে ওদের ছাড়ান পাওয়া শক্ত হতো! লোকে কথায় বলে—'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।'

গৌরীর শোক ভুলতে ওরা গিয়েছিল বাগান-পার্টি করতে, নিয়তির চক্রান্তে ফিরতে হলো ওদের নতুন শোক আর অকল্পিত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে।

দিন যায়। বাড়ীটা হ'য়ে উঠলো যেন পালানে-বাড়ী। বাড়ীতে থাকতে কারুর আর মন বসে না। বাবুরাও আসা যাওয়া কমিয়ে দিলে। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে মেয়েরা এক একটা রিকসা বা ট্যাকসি ডেকে পালায় যে যার বান্ধবীর বাড়ী, ফেরে সন্ধ্যার আগে, তাড়াতাড়ি প্রসাধন সেরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রে বাবুদের। বাবুরা না এলে ঝগড়া করে, দেরী ক'রে এলে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে প্রতিবাদ জানায়। এক মহাদেব ছাড়া সব বাবুরই বাড়ী ঘর আছে, মহাদেব শুধু এই বাড়ীর স্থায়ী বাসীন্দা। রতিপতিকে তো আর এ বাড়ীর লোক ধরা যায় না, সে ভবঘুরে। তবে এ বাড়ীর ওপর তার পক্ষপাতিত্বটা একটু বেশী। আগে সন্ধ্যা হ'লেই যে বাড়ী নাচ, গান, হল্লায় মুখরিত হ'য়ে উঠতো—এখন সেই বাড়ী সন্ধ্যা হলেই হ'য়ে ওঠে নীরব, নীরস, প্রাণশূন্য। যে যার ঘরে দোর দিয়ে হয় নীরবে মদ খায় আর নয় ঘুমোয়, ঘরের বাইরে বেরুতে হলে কেমন যেন গা ছম ছম করে, অজানা ভয়ে বুকটা ছুর-ছুর ক'রে ওঠে। পারত পক্ষে অপঘাতে মৃতা নন্দর ঘরের ধার দিয়েও কেউ পথ চলে না রাত্রে।

বাড়ীর লোক আর পাড়ার লোক অনেকেই মহাদেবকে বললে, বাড়ীটার ওপর অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। পুজো-আর্চ্চা শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ করা একান্ত দরকার। বাড়ীতে না মলেও অপঘাতে মরেছে তো নন্দ! সে যে ভূত-প্রেত হ'য়ে ঐ বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে না—এ কথা কে বলতে পারে! যার ওপর তার রাগ আছে বা যাকে যাকে সে ভালবাসতো তাদের সবাইকে সে একে একে নেবে তবে ছাড়বে। গয়ায় পিণ্ডি? হুঁ, কে তার আছে যে গয়ায় যাবে পিণ্ডি দিতে। তার চেয়ে হোম-যাগ্ করে তিলতুলসী দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত!

সরস্বতী পূজা এসে পড়েছে। বাড়ীর লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সরস্বতী পূজা আর হোম-যাগ্ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলে মহাদেব। দোষটাও কাটানো হবে আর পূজার আনন্দে যে ক'টা দিন মেতে থাকা যায় ভেবে বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সবাই মহাদেবের মতেই মত দিলে।

বেশ মোটা টাকাই চাঁদা উঠলো। খুব ধূমধামের পূজা। দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকান যায়—এই অনুপাতে ঠাকুর বায়না দেবার প্রস্তাব উঠলো। মহাদেব বললে, না, কারিগর আনিয়ে বাড়ীতে বসে আরো বড় ঠাকুর তৈরী করাবো।

রতিপতি বললে, বুদ্ধিটা হলো তোমার কতকটা আমাদেব ঐ কবি কালিদাসের মত। বলি বাড়ীতে বসে নয় বড় ঠাকুর তৈরী করালে—দরজা দিয়ে বাইরে থেকে আর আনতে হলো না, কিন্তু ঠাকুর ভাসান দেওয়ার জন্য দরজা দিয়ে বার তো করতে হবে—না ঠাকুর বাড়ীতে পুষে রেখে নিত্য সেবা করবে!

কথাটা তো ঠিকই। এমন স্বচ্ছ, সহজ কথাটা তার মাথায় আসেনি! দূর ছাই, অত ঝামেলায় কাজ কি! কুমোরটুলিতে পছন্দসই ঠাকুর বায়না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

পূজার দু'দিন আগে থেকে বাড়ীর ছাদে ম্যারাপ বাঁধা সুরু হ'য়ে গেল। বড় বড় উনুন তৈরী ক'রে মিষ্টির ভেয়ান বসে গেল। সারা বাড়ীময় জাগলো সাড়া। গোটা পাড়ার প্রতিটি ঘরে নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি হলো। পত্রের শেষ ছত্র—বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ঠাকুর প্রণামীর পরিবর্তে ভক্তের ভক্তি অর্ঘই বাঞ্ছনীয়।

পূজার আগের দিন ঠাকুর আনা হলো। ঠাকুর সাজানোর সে কি ধূম! পাড়ার ছেলেরা অপরূপ ক'রে ঠাকুর সাজালো। রঙীন বিজলী বাতির কেরামতি দেখিয়ে দর্শকবৃন্দকে তাক লাগিয়ে দেবার সে কি অপূর্ব প্রয়াস! ভক্তবৃন্দ ঠাকুর দেখবে—কি দেখবে তার সাজ সজ্জার বহর, সেটাই হচ্ছে কথা। শুধু চোখকে ধাঁধা লাগানই

যথেষ্ট নয়, কানের খোরাকের সমাবেশ তো করতে হয়! পূজার আগের দিনই এলো ঢাক, ঢোল, কাঁসি আর সানাই। পাড়ার লোককে রাত্রে জাগিয়ে রাখার পক্ষে এ' ক'টি স্বদেশী বাদ্যযন্ত্রই যথেষ্ট!

পূজার দিন সকালে এলো একদল ব্যাক-পাইপ আর একদল বিলাতি বাজনা। একদল থামে তো আর একদল সুরু করে। পালা ক'রে বাজিয়ে যেতে হবে—কামাই না হয়, এটাই এদের ওপর হুকুম! পয়সা যখন নেবে তখন কানের পোকা বার করা বাজনা তাদের বাজিয়ে যেতেই হবে। গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে পরস্পর পরস্পরের কথা শুনতে যদি না পায়—নাই পেলে, তার জন্য বাজনা বাজানো বন্ধ যেতে পারে না। বাজনা বেজেই চলে।

মহানন্দে পূজো শেষ হ'তে বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়। রাত্রে ভোজনের ব্যবস্থা, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলেছে তারই তোড়জোড়।

অপরাহ্ণের সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। রান্না-শালাটিকে সুরক্ষিত করার তাগিদ এলো। কোথা থেকে হু হু শব্দে ছুটে এলো দমকা বাতাস, ছাতের প্যাণ্ডেল উঠলো কেঁপে। কে জানে শীতকালে এমন চোরা ঝড়-জলের আবির্ভাব হবে। অনেক সময় ঝড় মেঘ উড়িয়ে আকাশ পরিষ্কার ক'রে দেয়, আজ কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটলো। ঝড়ের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে এলো জল। আধ-ঘণ্টার মধ্যে জল-ঝড়ের প্রচণ্ড প্রলয় নাচন সুরু হ'য়ে গেল। জল-ঝড় সমানে চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এমন মহামুশকিলের ব্যাপার যে ঘটবে তা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

কথাতেই আছে—বিপদ একা আসে না! এ হেন সঙ্কটজনক মুহূর্তে মেন ফিউজ হ'য়ে সারা বাড়ীখানা নিবিড় আঁধারে ভরে গেল।

মেন ঠিক হলো, আলো জ্বললো অনেক চেষ্টা তদ্বিরের পর কিন্তু ঝড়-জল থামবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রান্না প্রস্তুত, রাশি রাশি খাবার-দাবার, কিন্তু নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজনেরও

দেখা নেই। এত ঝড়-জলে মানুষ ঘরের বাইরে আসে কেমন করে!

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বাড়ীউলি মোক্ষদার কলেরা হ'য়েছে। অপরাহ্ন থেকে সুরু হ'য়েছে তার পাইখানা, অবস্থা এখন সঙ্কটজনক। খাবার লোভে নিজের অসুস্থতার কথা এতক্ষণ সে কারুর কাছে ব্যক্ত করেনি। আর কাজের বাড়ী—কে কার খোঁজ রাখে!

সেই জল-ঝড় মাথায় ক'রে মহাদেব ছুটলো ফোনে এ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিতে। আশার ঘরের টেলিফোনটা আজ ক'দিন হলো খারাপ হ'য়ে গেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল তবু মহাদেব আর ফেরে না। সবাই প্রায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো, না ফিরে এলো মহাদেব আব না এলো এ্যাম্বুলেন্স।

জল একটু কমে আসতে পাড়ার একজন দালাল খবর দিয়ে গেল যে, মহাদেবকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

রতিপতি ছুটলো থানায় তাকে উদ্ধাব ক'বে আনতে। পথে এ্যাম্বুলেন্স পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই কাবণ সব ক'খানা গাড়ীই বেরিয়ে গেছে। তবে যত শীগগীর হয় তাঁবা এ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে চেষ্টা করবেন।

মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে রতিপতি যখন ফি'র এলো প্রায় তখনই এ্যাম্বুলেন্স এলো মোক্ষদাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। কিন্তু নিয়ে যাবে কাকে, মোক্ষদা তখন তার দেহ রেখেছে। মরার সময় ব্যাচারীব সঙ্গে মহাদেবের একবার চোখের দেখাটাও হলো না।

সূর্য্য উঠেছে। মড়া তখনও বেরোয়নি, আদালতের অনুমতি সমেত—বাড়ীওলার একখানি পরোয়ানা এসে হাজির। Immoral Trafic Act এর দোহাই দিয়ে জানান হ'য়েছে যে, আজ থেকে এক মাসের মধ্যে বাড়ীর বাসীন্দাদের এই বাড়ী বিনা অজুহাতে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবাড়ীর বাসীন্দারা সকলেই রূপোপজিবিনী!

গোধূলির আলো মিলিয়ে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যা। মহাদেবের বাড়ীর রকে ব'সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে একজন লোক কাশছিল। বাড়ীর সামনে এসে লোকটির দিকে একবার চেয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল রতিপতি, লোকটি মুখ তুলে বললে, বাড়ীতে কেউ নেই।

গলার স্বরটা ধরা হ'লেও কেমন যেন চেনা চেনা। লোকটির কাছে এগিয়ে এলো রতিপতি। লোকটি তখন আবার তার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাশতে সুরু করেছে।

—কে—গৌতম নয়!

—হাঁ জী। মাথা তুলে বললে গৌতম।

—এরি মধ্যে ওরা সব বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল! এখনো তো একমাস পেরোয়নি।

—আজ শেষ দিন আছে। কাল সবিরে জরুর ছোড়িয়ে যেতে হোত।

—তাতো হোত কিন্তু এত আগে থাকতে ওরা ছেড়ে গেল কেন? আর গেলই বা সব কোথায়?

—দিলমে বহুৎ দুখ্ লিয়ে সব চলিয়ে গেল। বলে কাশতে সুরু করলে গৌতম।

—তোর কি হ'য়েছে?

—বেমার। জ্বরভি আছে আউর খাসি ভি আছে। থোড়া মদ মিলনেসে—আরাম হো যায়। খানা পিনা ভি নেহি মিলতা—মদ কাঁহাসে মিলে! বলে গৌতম করুণ দৃষ্টিতে চাইলে রতিপতির দিকে।

আশ্বাস দিয়ে রতিপতি বললে, আচ্ছা, মদ না হয় তোকে আমি খাওয়াচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা কি বল দেখি?

মদের লোভে চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো গৌতম। বললে, সব বলবে

বাবুজি। লেকেন মদ খাওয়ার একটা খানা তো চাই। আইয়ে— অন্দরমে আইয়ে।

—ভাল, এক রাতের আস্তানা—এক রাতের আস্তানাই সই। মানুষ ভাবে এক আর ঘটে অন্য। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ভাবলাম—এদের বাড়ী এসে দিন কয়েকের জন্যে আস্তানা নেবো কিন্তু বিধাতা বিরূপ। ঘরে নিশ্চয়ই ডুম নেই! গোটা পাঁচেক বড় বাতিও কিনে নিও, রাতটা তো কাটাতে হবে। ব'লে রতিপতি একখানা দশটাকার নোট দিলে গৌতমের হাতে।

টাকা হাতে পেয়ে গৌতমের বেমারী অর্দ্ধেক সেরে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে সে খাবার, মদ, সিগারেট, বাতি প্রভৃতি নিয়ে ফিরে এলো। বললে হাসিমুখে, আঁনধারে বসে থাকতে বাবুজীর বহুৎ তগলিক হ'য়েছে।

—কিছুমাত্র নয়—কিছুমাত্র নয়। ঐ তাকের ওপর থেকে আমি একটা ছেঁড়া সতরঞ্জি জোগাড় করেছি। ওটা বিছিয়ে আসর সাজিয়ে ফেল। বললে রতিপতি।

সদরে খিল দিয়ে এসে বাতি জ্বাললে গৌতম। সতরঞ্জি বিছিয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা খবরের কাগজ ঝেড়ে-ঝুড়ে তার ওপর রাখলে পানের দোনা, সিগারেট, দেশলাই, ডালমুটের ঠোঙা। দেয়াল থেকে একটা পেরেক তুলে নিয়ে এলো। কর্কের কাজ সেই পেরেক দিয়েই সমাধা করলে অর্থাৎ মদের বোতলের ছিপি খুলে ফেললে।

রতিপতি একটা কোণ আশ্রয় ক'রে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট ধরালে।

মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বললে গৌতম, বহুৎ গলতি হো গিয়া বাবুজী! একঠো গিলাস—

—খুরি, বা নারকোল মালা—যাহোক একটা কিছু খুঁজে ছাখ না গোপাল! বাড়ীর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা না একটা কিছু পাত্তোর

মিলবে। সবে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি, বুকের ব্যথা এখনো ভালরকম সারেনি, বোতল ধরে চুমুক মারতে তো পারবো না চাঁদ! যাও—বাক্তিটা নিয়ে খুঁজে ছাখো।

মুখ কাটা দুটো গোয়ালিনী মার্কা বিলিতি দুধের কৌটো খুঁজে নিয়ে এলো গৌতম। রতিপতি বললে, স্মিতা রহ. ব্যাটা! এই জন্যেই অহল্যা—থুড়ি—থুড়ি নন্দ তোকে অতখানি ভালবেসেছিল।

দু কৌটোয় মদ ঢেলে রতিপতির সামনে রাখলে গৌতম।

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি সব খুলে এবার বলতো, বাবা! দাঁড়াও, একটু টেনে নিয়ে জমিটা আগে ক'রে নাও। ওকি, মদের পাত্র নিয়ে চললে কোথা? ওঃ—আমার সামনে খেতে তোমার সরম লাগতা হ্যা! গুলি মারো ওসব কেতা। আজ তুমিও যা আর আমিও তা। আমি আজ আবুহোসেন, তুমি আমার রাতের দোস্ত। বসো—! ব'লে গৌতমের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে রতিপতি।

মদ খেতে খেতে আধা বাংলা—আধা হিন্দীতে গৌতম ব্যাপারটা যা বললে তার সারাংশ হচ্ছে :—

ক। ললিতমাষ্টারের যক্ষ্মা হ'য়েছে। তাকে নিয়ে বাপ্পু গেছে কোন এক স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনে।

খ। আশাকে নিয়ে ডিরেক্টর বিমান গেছে বম্বে—নতুন ছবির Contract নিয়ে।

গ। রাঁধতে গিয়ে লীলার মা দিন দশেক আগে আগুনে পুড়ে মরেছে। তার বাবু পরেশ বিয়ে করে সংসারী হ'য়েছে। বাড়ীওলা মহাদেব চঞ্চলাবিবি আর লীলাকে নিয়ে কাশীবাসী হ'য়েছে।

ঘ। শুধু এই একমাত্র বাড়ীতেই তো আর নোটিশ পড়েনি, নোটিশ পড়েছে সারা পাড়ার প্রতিটি বাড়ীতে, প্রতিটি ঘরে। শুধু এ বাড়ী নয়—সারা পাড়াই প্রায় খালি। বারবনিতা উচ্ছেদ ক'রে এবার এ পাড়ায় সব ভদ্রলোক ভাড়াটে বসানো হবে।

ঙ। নন্দর সঙ্গে গৌতমের কীর্ত্তি পাড়ায় প্রকাশ হ'য়ে গেছে।

কেউ তাকে এতোদিন চাকরী দেয়নি। পাড়ার মান্না ছাড়তে না পেরে ক'টা দিন সে কোনগতিকে না খেয়েও টিকে ছিল কিন্তু কাল সকালে তাকে চিরদিনের মত এ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।

উভয়েই সমদুঃখে দুঃখী! একা গৌতমের নয়—রতিপতিরও বুক ঠেলে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ দরজার কড়া প্রচণ্ড জোরে নড়ে উঠলো। গৌতম গিয়ে দরজা খুলে দিলে। পুলিশ ইন্সপেক্টর কতিপয় পুলিশসহ ঘরের মধ্যে এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লো। সব কিছু দেখে ইন্সপেক্টর বললে, বাইরে থেকে কথার আওয়াজ পেয়েই বুঝেছি! হুঁ—খালি বাড়ীতে বসে মদ খেতে খেতে সব চুরির মতলব হচ্ছে। থানায় চল চল।

রতিপতি নীরবে উঠে দাড়াল। গৌতম কি যেন একটা প্রতিবাদ করতে গেল, জনৈক কনেষ্টবল তার গলায় একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, চল রে শালা।

ছোটবাবুর উদ্দেশে ইন্সপেক্টর বাবু বললেন, তাইতো হে মুখুজ্যে। বেটীরা সব গেল কোথা? পাড়াকে পাড়াই যে খালি!

—Excuse me sir! কোথা আর যাবে! মাথায় সব সিঁদুর দিয়ে ঘোমটা টেনে হয়তো—হয়তো কেন—নিশ্চয় ঢুকে পড়েছে সনাতন সমাজদেহে। সরকারের দূরদর্শিতায় সমাজদেহে দুষ্ট-ব্রণ ফুটে উঠতে আর দেরী নেই। উচলো বলে! চলুন sir! বললে রতিপতি

কড়ি কাঠের গা থেকে জোড়া টিকটিকি এক সঙ্গে ডেকে উঠলো, টিক্—টিক্—টিক্।

সমাপ্ত